# ফসলের পোকা মাকড় ও ইঁদুর দমন

CONTROL OF CROP INSECTS, MITES AND RATS

# BAE 4302

Mahbubul Alam

University of Rajshahi

স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট

SCHOOL OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

# ফসলের পোকা মাকড় ও ইঁদুর দমন

CONTROL OF CROP INSECTS, MITES AND RATS

BAE 4302

## স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট
## SCHOOL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
## বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

কোর্স ডেভেলপমেন্ট টিম


**লেখক**

মোঃ আবু তালেব
ড. মোহাম্মদ হোসেন
ড. মোঃ মহসিন আলী সরদার

**সম্পাদক**

**মোঃ বিলাল হোসেন**
স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

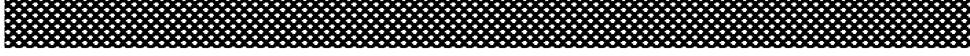
**রচনাশৈলী সম্পাদক**

**মোঃ আবু তালেব**
স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

**সমন্বয়কারী**

**ড. আবু হেনা মোঃ ফারুক**
স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

এ কোর্সবইটি রেফারি কর্তৃক নিরীক্ষণের পর বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট এর ছাত্রদের জন্য মুদ্রিত হয়েছে।



# ফসলের পোকা মাকড় ও ইঁদুর দমন

(FASHALER POKA MAKOR O EDOOR DAMON)
CONTROL OF CROP INSECTS, MITES AND RATS




সার্বিক তত্ত্বাবধানে
**ড. আবু হেনা মোঃ ফারুক**
ডীন, স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Fashaler Poka Makor O Edoor Damon (Control of Crop Insects, Mites and Rats), a Three Credit Coursebook for the Bachelor of Agricultural Education Programme. **Written by:** Md. Abu Taleb, Dr. Mohammad Husain and Dr. Md. Mohsin Ali Sardar. **Edited by:** Md. Bilal Hossain, **Style edited by:** Md. Abu Taleb, **Published by:** Publishing, Printing & Distribution Division, Bangladesh Open University, Gazipur-1704. © School of Agriculture and Rural Development, Bangladesh Open University. **First Edition:** May, 1998. **Computer Compose, D.T.P & Photoshop Processing:** Nikhil Chandra Halder. **Cover Design:** Md. Monirul Islam. **Cover Photographs Provided by:** Md. Abu Taleb, **Inside Photographs Provided by:** Dr. Md. Mohsin Ali Sardar, Dr. Mohammad Husain and Md. Abu Taleb, Printed by: Sumi Printing Press & Packaging, 9 Nilkhet, Babupura, Dhaka-1205.

**ISBN 984-34-5020-5**



# পাঠ নির্দেশনা

''ফসলের পোকা মাকড় ও ইঁদুর দমন কোর্সবইটি বিশেষভাবে স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট এর বিএজিএড প্রোগ্রামের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য লেখা হয়েছে। আপনি জানেন, দূর শিক্ষায় শিক্ষকের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নেই। তাই পাঠের কোনো কঠিন বিষয় যেন আপনার বুঝতে অসুবিধা না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখেই কোর্সবইটি লেখা হয়েছে। কোর্সবইটির আঙ্গিক ও উপস্থাপনা তাই প্রচলিত পাঠ্যবই থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের। যেহেতু সরাসরি শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই কোর্সবইটি আপনাকে নিজে পড়ে বুঝতে হবে, তাই এটি কীভাবে পড়বেন প্রথমেই তা জেনে নিন। এতে কোর্সবইটি পড়তে ও বুঝতে আপনার সুবিধা হবে।

## কোর্সবইটির রূপরেখা

''ফসলের পোকা মাকড় ও ইঁদুর দমনচ কোর্সবইটি ছয়টি ইউনিটে বিভক্ত। প্রতিটি ইউনিটে একাধিক পাঠ রয়েছে। পাঠ সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে ইউনিটের বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে। ইউনিটের পাঠগুলোকে আলাদা করে সাজানো হলেও এদের মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে। এ কোর্সবইটির ইউনিট ১ ও ২ এর পাভুলিপি রচনা করেছেন মোঃ আবু তালেব, প্রভাষক (কৃষি), স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৪, ইউনিট ৩ ও ৪ এর পাভুলিপি রচনা করেছেন ড. মোহাম্মদ হোসেন, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ-২২০২ এবং ইউনিট ৫ ও ৬ এর পাভুলিপি রচনা করেছেন ড. মোঃ মহসিন আলী সরদার, অধ্যাপক, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০২।

## ইউনিটের ভূমিকা

প্রতিটি ইউনিটের শুরুতেই রয়েছে একটি ভূমিকা। ভূমিকায় ইউনিটের বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। ইউনিটটিতে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সংক্ষেপে তারও উল্লেখ রয়েছে। এতে আপনি ইউনিটের শুরুতেই জেনে যাচ্ছেন পাঠের মূল আলোচ্যসূচি কী?

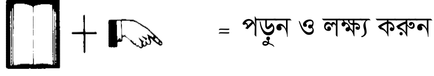
## পাঠের উদ্দেশ্য

লক্ষ্য করবেন প্রতিটি পাঠের শুর€তে এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য দেয়া আছে। প্রতিটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই পাঠের বিষয়বস্তু সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠ শেষে পাঠের উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করা সম্ভব হয়েছে কি–না তা নিজে নিজেই মূল্যায়ন করবেন। এজন্য পাঠ শেষে

স্বমূল্যায়ন প্রশ্ন অর্থ্যাৎ পাঠোত্তর মূল্যায়ন রয়েছে। এতে আপনি পাঠটি কতটুকু বুঝতে পারলেন তা নির্ধারণ করতে পারবেন।

### আইকনের (Icon) ব্যবহার

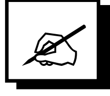
পাঠের বিষয়বস্তুগুলো একদৃষ্টিতে বুঝে নেয়ার জন্য প্রয়োজন অনুসারে কোর্সবইটির বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের প্রতীক বা আইকন ব্যবহার করা হয়েছে, যা দেখে আপনি সহজেই বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা এবং আপনার করণীয় কী তা বুঝতে পারবেন। নিম্নে এ কোর্সবইটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের আইকনের অর্থ নির্দেশ করা হলো–


= পড়ুন ও লক্ষ্য করুন

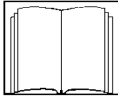

= আবশ্যিক পাঠ/সারমর্ম


= ছবি দেখুন

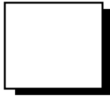

= অনুশীলন/চূড়ান্ত মূল্যায়ন


= পাঠোত্তর মূল্যায়ন


= উত্তরমালা


= তথ্যসূত্র

### বক্স লিখন



পাঠের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় অংশকে আরও আকর্ষণীয় করে প্রদর্শনের জন্য মাঝে মাঝেই বক্স লিখনেরচ মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি বক্স লিখনচ মনোযোগ দিয়ে পড়ূন এবং মনে রাখার চেষ্টা করুন।

### অনুশীলন

আপনি পাঠটি ভালোভাবে বুঝতে পারছেন কি–না তা যাচাই করার জন্য পাঠের মাঝে কোনো কোনো জায়গায় দেয়া রয়েছে অনুশীলন। অনুশীলনগুলো আপনাকে সমাধা করতে হবে। এসব অনুশীলন আপনার জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

### সারমর্ম

প্রতিটি পাঠেই সারমর্ম দেয়া আছে। সারমর্ম পড়ে আপনি নির্দিষ্ট পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অতি সহজেই ধারণা নিতে পারবেন।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

প্রতিটি পাঠের শেষে আপনি পাঠটি কতটুকু বুঝতে পেরেছেন তা যাচাইয়ের জন্য রয়েছে পাঠোত্তর মূল্যায়ন। পাঠটি ভালোভাবে বোঝার পর পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করুন। অতঃপর আপনার দেয়া উত্তর ইউনিট শেষে দেয়া উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন। সবগুলো উত্তর সঠিক হলে পরবর্তী পাঠ শুরু করুন অন্যথায় পাঠটি পুনরায় পড়ুন।

**চূড়ান্ত মূল্যায়ন**

প্রতি ইউনিটের শেষে রয়েছে চূড়ান্ত মূল্যায়ন। এতে সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন রয়েছে। এ প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করার চেষ্টা করুন, যা আপনাকে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে অন্যান্য তথ্যসূত্রের সাহায্য নিতে পারেন। এছাড়া প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সাথেও কথা বলতে পারেন। ইউনিটের সবগুলো পাঠ ভালোভাবে পড়লে চূড়ান্ত মূল্যায়নের প্রশ্নগুলো সমাধানে কোনো অসুবিধা হবে না।

## সূচিপত্র

**ইউনিট ১**
**ফসল সংরক্ষণ ও পোকার দেহের পরিচিতি**

# ইউনিট ১ ফসল সংরক্ষণ ও পোকার দেহের পরিচিতি

বাংলাদেশের আবহাওয়া ফসল উৎপাদনের জন্য যেমন উপযোগী তেমনি ফসলের ক্ষতিকর পোকা-মাকড়, ইঁদুর, রোগবালাই, আগাছা ইত্যাদির বংশবৃদ্ধির জন্যও সহায়ক। এসব ক্ষতিকর প্রাণী ও উদ্ভিদকে আপদ বলা হয়। এসব আপদ কর্তৃক ফসলের প্রভূত ক্ষতিসাধিত হয়ে থাকে। এক জরিপে দেখা গেছে যে, এদেশে প্রায় ৬০০ ধরনের পোকা মাকড় ফসলের ক্ষতিসাধন করে থাকে। এছাড়া পোকা মাকড় ও বিভিন্ন আপদ দ্বারা গোলাজাত শস্যও শতকরা প্রায় ৫-৮ ভাগ প্রতি বছর বিনষ্ট হচ্ছে। এক সূত্রে জানা গেছে যে, কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য আপদ দ্বারা ফসলের যে পরিমাণ ক্ষতিসাধিত হয় তা রোধ করতে পারলে বিদেশ থেকে আর খাদ্যশস্য আমদানি করতে হতো না। সুতরাং ফসল সংরক্ষণের জন্য পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে পোকার দেহের পরিচিতি জানা আবশ্যক। কারণ দমন পদ্ধতি সব পোকার জন্য একরকম নয়।

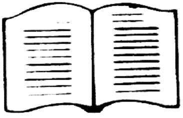
এই ইউনিট পাঠ করলে আপনি ফসল সংরক্ষণ সম্পর্কে ধারণা, কৃষিতে পোকা মাকড়ের গুরুত্ব, পোকার দেহের বিভিন্ন অংশের পরিচিতি, পোকার বিভিন্ন মুখাবয়ব ও তাদের বিবরণ, পোকার বিভিন্ন প্রকার পাখা, পা ও শুঙ্গ এবং তাদের বিবরণ দিতে পারবেন।

## পাঠ ১.১ ফসল সংরক্ষণ সম্পর্কে ধারণা



**এ পাঠ শেষে আপনি–**

- শস্য সংরক্ষণের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- ফসলের বিভিন্ন আপদের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।
- কোন্ আপদ দ্বারা ফসলের কী পরিমাণ ক্ষতি হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।



বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। শতকরা ৬৩ ভাগ লোক বিভিন্ন প্রকার ফসলের চাষাবাদ করে থাকে। এ দেশের বিরাজমান আবহাওয়া ফসল উৎপাদনের জন্য যেমন সহায়ক তেমনি বিভিন্ন প্রকার আপদের জন্যও অনুকূল প্রভাব ফেলে থাকে। এই ক্ষতিকর আপদ অর্থাৎ পোকা মাকড়, রোগবালাই, আগাছা, ইঁদুর, শিয়াল, পাখি প্রভৃতির আক্রমণজনিত ক্ষয়ক্ষতি থেকে ফসল রক্ষা করা এবং তাদের বংশবিস্তারে বাধা প্রদান করাকে শস্য সংরক্ষণ বলা হয়। ব্যাপক অর্থে ফসলকে ক্ষেত খামারে ও গুদামে উল্লেখিত আপদের হাত থেকে রক্ষা করাই হলো শস্য সংরক্ষণ।

ফসলকে ক্ষেত খামারে ও গুদামে আপদের হাত থেকে রক্ষা করাই হলো শস্য সংরক্ষণ।

কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ও অনেক কষ্টে উপার্জিত টাকা পয়সা খরচ করে তার জমিতে ফসল উৎপাদন করে। অথচ ক্ষতিকর পোকা মাকড় অল্প সময়ের মধ্যেই সে ফসল নষ্ট করে দিতে পারে। এমতাবস্থায় কৃষকের দুঃখের কোনো সীমা থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধানের শীষকাটা লেদা পোকার আক্রমণ ব্যাপক হলে শতকরা ৮০ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত ধানের শীষ নষ্ট হয়ে থাকে। জরিপে দেখা গেছে যে, পোকার আক্রমণে প্রতি বছর দেশে গড়ে শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ পর্যন্ত ফসল মাঠেই নষ্ট হয়।

কীটপতঙ্গের আক্রমণে যে শুধু মাঠ ফসলই নষ্ট হয় তা নয়। খাদ্য ও বীজ হিসেবে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত গোলজাত শস্যও কীটপতঙ্গ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। প্রতি বছর শতকরা প্রায় ৫ থেকে ৮ ভাগ পর্যন্ত গোলাজাত খাদ্যশস্য কীটপতঙ্গ দ্বারা নষ্ট হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, শুধু সরকারী গুদামেই প্রতি বছর পোকার আক্রমণে এক লক্ষ টন খাদ্যশস্য নষ্ট হয়। এতে যে বিরাট ধরনের একটা ক্ষতি হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পোকা-মাকড়ের মতো রোগ-বালাইও আমাদের দেশে শস্যের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। শস্যের রোগ সম্পর্কিত পর্যাপ্ত গবেষণা আমাদের দেশে হয়নি। দেশের বিরাজমান আবহাওয়ায় ফসলের রোগ জীবানু যেমন- ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, কৃমি, মাইকোপ্লাজমা প্রভৃতির বেঁচে থাকা ও বংশ বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত সহায়ক। ফলে এদেশে প্রায়

প্রত্যেক ফসলে রোগ বালাই এর প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত ব্যাপক। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ১৬২ প্রকারের আবাদি ফসলে (বনজ বৃক্ষসহ) ৬৮২ টি রোগের আক্রমণ হয় বলে জানা গেছে এবং এর মধ্যে ২৯১ টি রোগকে প্রধান ও শস্যহানির মারাত্বক কারণ হিসেবে মনে করা হয়। এসব রোগের আক্রমণে প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় ৭২০ কোটি টাকার ফসল (বনজ বৃক্ষসহ) নষ্ট হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এ হিসেব অত্যন্ত সংকীর্ণভাবে করা হয়েছে। প্রকৃত হিসেবে এর পরিমাণ আরও বেশি হবে।

পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই দ্বারা যেমন শস্যহানি ঘটে, আগাছাও তেমনি শস্যের ফলন ও গুনগতমান কমিয়ে দেয়। ফসলের ক্ষেতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সকল উপকরণ সরবরাহ করা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আগাছা ফসলের উৎপাদন শতকরা ৩০ ভাগ কমিয়ে দেয়। কারণ আগাছা মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান নেয়া ছাড়াও অন্যান্য কার্যাবলীতে ফসলের সাথে প্রতিযোগিতা করে থাকে। তাছাড়া আগাছা সেচের পানি ও রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা শতকরা ২০-৩০ ভাগ কমিয়ে দেয় এবং কীটপতঙ্গ দমনের ব্যয়েও শতকরা ১০-৩০ ভাগ বাড়িয়ে দেয়।

কীটপতঙ্গের চেয়ে আকারে বড় যে সমস্ত মেরুদন্ডী প্রাণী ফসল বা ফসল জাত এবং অন্যান্য জিনিষের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে থাকে তাদেরকে অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী বলে।

কীটপতঙ্গের চেয়ে আকারে বড় যে সমস্ত মেরুদন্ডী প্রাণী ফসল বা ফসল জাত এবং অন্যান্য জিনিষের প্রভূত ক্ষতিসাধন বা অনিষ্ট করে থাকে, তাদেরকে অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী বা মেরুদন্ডী আপদ বলে। যেমন - ইঁদুর, শিয়াল, সজারু, কাঠবিড়ালী, পাখি প্রভৃতি। ইঁদুর হলো ফসলের একটি বিশেষ শত্রু। প্রতি বছর ইঁদুর মাঠ ও গুদামজাত শস্যের প্রচুর ক্ষতি করে থাকে। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ইঁদুর মাঠের গমের শতকরা প্রায় ১২ ভাগ ক্ষতি করে থাকে যার পরিমাণ প্রায় ৭৭ হাজার টন। সাধারণ হিসেবে দেখা গেছে যে, দুই একর জমিওয়ালা একজন কৃষকের মাঠে ৩০০ টাকা এবং ঘরে ১০০ টাকার ফসল ইঁদুর বিনষ্ট করে থাকে। ইঁদুর প্রতি বছর আমাদের দেশে ৩০০ থেকে ৪৮০ কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট করে। বাংলাদেশে ইঁদুর জাতীয় প্রাণী দ্বারা প্রতিবছর ন্যূনতম পক্ষে ১০ লক্ষ টন গম, ১১০ লক্ষ টন রোপা আমন ও ২০ লক্ষ টন জলি আমন ধান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইঁদুর দ্বারা ক্ষতির নমুনা নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো–

১. ইঁদুর জাতীয় প্রাণী গুদামজাত শস্য যেমন–চাল, ডাল, গম এবং মাঠশস্য যেমন– ধান, গম, আনারস, আখ, নারিকেল ইত্যাদির ক্ষতিসাধন করে থাকে।

২. এরা মানুষের খাদ্যে ভাগ বসায় এবং তার অপচয় ঘটায়। এদের মলম ত্র দ্বারা খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয় এবং তা মানুষের ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

৩. এরা কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র, ব্যাগ, বৈদ্যুতিক তার ইত্যাদি কেটে নষ্ট করে।

৪. ইঁদুর মানুষের জন্য বহু মারাত্বক রোগ যেমন– প্লেগ রোগের জীবানু বহন করে এবং তার সংক্রমণ ঘটায়।

৫. ইঁদুরের কিছু কিছু প্রজাতি মাটিতে গর্ত খোঁড়ায় অত্যন্ত পটু। এজন্য বহু বাঁধ, বেড়ী বাঁধ, আইল, পুল ইত্যাদি অকালে ধ্বংস হয়।

প্রতিবছর শিয়াল প্রায় ৪৮৩ কোটি টাকার ফসল ও গৃহপালিত জীবজন্তু নষ্ট করছে।

শিয়ালও ফসলের ক্ষতি করে থাকে। শিয়াল আখ, ভূট্টা, চীনাবাদাম, তরমুজ, বাঙ্গী, কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি ফসলসহ হাঁস-মুরগী, গরু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদির বাচ্চার ক্ষতিসাধন করে। শিয়াল আখ ফসলের জন্য একটা মারাত্বক অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী। এর দ্বারা প্রতি বছর এদেশে প্রায় ১০-২৪% আখ ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এক জরিপে দেখা গেছে যে, প্রতিবছর শিয়াল প্রায় ৪৮৩ কোটি টাকার ফসল ও গৃহপালিত জীবজন্তু নষ্ট করছে। শিয়াল মানুষের জন্যও যথেষ্ট ক্ষতিকর। এর কামড়ের ফলে রেবিস, টিটেনাস প্রভৃতি রোগ হয় এবং লেপ্টোস্পাইরোসিসসহ অনেক ধরনের রোগজীবানু ছড়ায়।

খরগোস দ্বারাও অনেক শস্য বা ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এরা বাঙ্গী, তরমুজ ইত্যাদির পাতা খায়, গোলআলু খায় এমনকি আনারসেরও ক্ষতিসাধন করে থাকে।

কাঠবিড়ালী সাধারণত বিভিন্ন ফল খেয়ে এবং কেটে তার ক্ষতিসাধন করে থাকে। এছাড়া এরা বিভিন্ন গাছে যেমন– নারিকেল গাছে গর্ত বা ফোঁকর তৈরি করে সেখানে বসবাস করে। এর ফলে গাছ যথেষ্ট ক্ষতির সন্মুখীন হয়।

ক্ষতিকর মেরুদন্ডী প্রাণীদের মধ্যে পাখীও ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। যেমন- কাক, টিয়া, ময়না, শালিক, চড়ুই, কবুতর, বাবুই প্রভৃতি। মাঠে বীজ বপণ করার পর পাখি বীজগুলো খেয়ে ফেলে বা চারা গজালে চারা উপড়ে ফেলে। যেমন- গমবীজ লাগানোর পর সে ক্ষেতে শালিক ও চড়ুইয়ের উপদ্রব বেড়ে যায়। পাকা ধানে টিয়া, বাবুই পাখি এবং পাকা মরিচ ও টমেটোতে টিয়া প্রধান অনিষ্টকারী পাখি। গুদামজাত করার জন্য যখন ফসল শুকানো হয় তখন তা বিভিন্ন প্রকার পাখি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যেমন- ধান শুকানোর সময় মাঠে বা উঠানে শালিক, কবুতর, চড়ুই, কাক প্রভৃতি পাখির উপদ্রব বেড়ে যায়।



**সারমর্ম ঃ** বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষক কষ্ট করে যে ফসল উৎপাদন করে তা মাঠে ও গুদামে বিভিন্ন প্রকার আপদ দ্বারা নষ্ট হয়ে থাকে। যেমন– কীটপতঙ্গ, রোগ-বালাই, আগাছা, ইঁদুর, শিয়াল, পাখি প্রভৃতি আপদ। ফসলকে এসব আপদের হাত থেকে রক্ষা করাই হল শস্য সংরক্ষণ। প্রতি বছর এসব আপদ দ্বারা ফসলের প্রচুর পরিমাণ ক্ষতিসাধিত হচ্ছে। টাকার হিসেবে তা এক বিরাট অংকে গিয়ে দাঁড়াবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এক তথ্যে জানা গেছে যে, এসব আপদ দ্বারা ফসলের যে পরিমাণ ক্ষতিসাধন হচ্ছে তা রোধ করতে পারলে বিদেশ থেকে আর খাদ্যশস্য আমদানি করতে হতো না।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

ক. বাংলাদেশে প্রায় কত ধরনের পোকা-মাকড় ফসলের ক্ষতিসাধন করে থাকে?

i) ৪০০ ii) ৫০০

iii) ৬০০ রা) ৭০০

খ. রোগের আক্রমণে প্রতি বছর এদেশে কত কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়?

i) ১০০০ কোটি টাকার ii) ৭২০ কোটি টাকার

iii) ৯০০ কোটি টাকার iv) ২০০০ কোটি টাকার

**২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।**

ক. পাখী অমেরুদন্ডী প্রাণী।

খ. শিয়ালের কামড়ে রেবিস রোগ হয়।

**৩। শুন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. ইঁদুর ----------- রোগের জীবানু বহন করে।

খ. ধানের শীষ কাটা লেদা পোকার আক্রমণ ব্যাপক হলে শতকরা --------- ভাগ ধানের শীষ নষ্ট হয়।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. দুইটি মেরুদন্ডী আপদের নাম লিখুন?

খ. পোকার আক্রমনে প্রতি বছর শতকরা কতভাগ ফসল মাঠেই নষ্ট হয়?

## পাঠ ১.২ কৃষিতে কীটপতঙ্গের গুরুত্ব



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- কীটপতঙ্গের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কীটপতঙ্গের উপকারী প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।



বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এ দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক কৃষির উপর সরাসরি নির্ভরশীল। কৃষি বলতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ফসল উৎপাদনকেই বুঝানো হয়ে থাকে। আর এ উৎপাদন আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। কৃষিক্ষেত্রে আদিকাল থেকেই মানুষ কীটপতঙ্গের সাথে সংগ্রাম করে আসছে। তবুও এর সাথে কুলিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। নানা রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এরা টিকে যাচ্ছে এবং এদের বংশকে বাড়িয়েই চলছে। কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মূখ্য কীটপতঙ্গ ধ্বংস হলেও পরবর্তীতে গৌণ পোকাই আবার মূখ্য পোকা হিসেবে আক্রমণ করে থাকে। আবার অনেক সময় কীটনাশকের মাত্রা কম হওয়াতে পোকাগুলো ঐ কীটনাশকের প্রতি প্রতিরোধী হয়ে উঠে। যার ফলে পরবর্তীতে ঐ কীটনাশক জমিতে বেশি মাত্রায় প্রয়োগ করলেও কোনো ফল পাওয়া যায় না, বরং উপকারী পোকা মাকড় ধ্বংস হয়ে কৃষি ক্ষেত্রে ক্ষতিকর পোকামাকড়ের সংখ্যা বেড়েই চলে। এরা প্রায় সব রকমের গাছপালা, লতা-গুল্ম, এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উদ্ভিদ প্রজাতিকেও আক্রমণ করে থাকে। মাঠ পর্যায়ের উৎপাদিত খাদ্যশস্য যেমন– ধান, গম, পাট, শাক-সবজি, মসলা, ফল-মূল ও অর্থকরী ফসল যেমন- পাট, চা, তুলা, বনজ সম্পদ থেকে শুরু করে গুদামজাত খাদ্যশস্য পর্যন্ত এরা আক্রমণ করে থাকে এবং প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। এক জরিপে দেখা গেছে যে, কেবল ধান ফসলেই ১৫৯ টির অধিক প্রজাতির পোকা ক্ষতিসাধন করে যার মধ্যে ২০-২৩ টি প্রজাতির পোকা অধিক ক্ষতিকর। এ পোকাগুলো আউশ মৌসুমে শতকরা ২৪ ভাগ, আমন মৌসুমে শতকরা ১৮ ভাগ এবং বোরো মৌসুমে শতকরা ১৩ ভাগ ধানের ক্ষতি করে থাকে। কীটপতঙ্গ উৎপাদিত খাদ্যশস্যের যে পরিমাণ ক্ষতি করে থাকে তা বিদেশ থেকে আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের প্রায় দ্বিগুন বলে জানা গেছে। এদের আক্রমণ চরমে পৌঁছলে ৮০-১০০ ভাগ পর্যন্ত ফসলের ক্ষতি হয়ে থাকে। এদেশে বিরাজমান আবহাওয়া ফসল উৎপাদনের জন্য যেমন সহায়ক তেমনি অনিষ্টকারী পোকা মাকড়, রোগ বালাই, ইঁদুর প্রভৃতির বংশবৃদ্ধির জন্যও সহায়ক। মানুষ কর্তৃক প্রয়োগকৃত যে কোনো দমন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে এবং প্রতিকূল পরিবেশেও বেঁচে থাকতে পারে। প্রতিকূল পরিবেশে এরা অপছন্দনীয় খাবার খেয়েও জীবন ধারণ করতে পারে। পোকা মাকড় যেভাবে ফসলের ক্ষতি করে তা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল–

> কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মূখ্য কীটপতঙ্গ ধ্বংস হলেও পর-বর্তীতে গৌণ পোকাই আবার মূখ্য পোকা হিসেবে আক্রমণ করে থাকে।

১. চর্বনোপযোগী মুখোপাঙ্গ বিশিষ্ট পোকা গাছের পাতা, কুঁড়ি, কান্ড, ছাল ও ফল চিবিয়ে খেয়ে ফসলের ক্ষতি করে। যেমন– ঘাস ফড়িং, পামরী পোকা, ক্যাটারপিলার পর্যায়, পঙ্গপাল ইত্যাদি।

২. অনুবিদ্ধন ও শোষনোপযোগী মুখোপাঙ্গ বিশিষ্ট পোকা পাতা, কুড়ি, কান্ড ও ফল থেকে রস শোষণ করে নিয়ে ফসলের ক্ষতি করে থাকে। যেমন– জাবপোকা এভাবে সীম, সরিষা ফসলের ক্ষতিসাধন করে।

৩. কিছু বিটল আছে যারা কাঠ ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে ও কাঠের প্রভ ত ক্ষতি করে। যেমন– কাঠ ছিদ্রকারী বিটল।

৪. অনেক পোকার আক্রমণে গাছের কান্ডে ও পাতায় ফোসকার মত অবস্থার (Cancerour growth) সৃষ্টি হয়। যেমন– ধানের গল (Rice gall)।

৫. মাটিতে বসবাসকারী কিছু পোকা আছে যারা গাছের শিকড় এবং নিচের কান্ড কেটে দিয়ে বা খেয়ে মারাত্মক ক্ষতি করে। যেমন– কাটুই পোকা (Cutworm) দিনের বেলা লুকিয়ে থাকে, কিন্তু

সন্ধ্যা হলেই আলু গাছের শিকড় কেটে দেয়; উঁই পোকা (Termite) ও হোয়াইট গ্রাব (white grab) আঁখের শিকড় খেয়ে ক্ষতিসাধন করে।

৬. অনেক পোকা আছে যারা পাতা ও ফুলের মধ্যে ডিম পেড়ে ফসলের প্রচুর ক্ষতি করে। যেমন– স্ট্র বেরী উইভিল, কিছু কিছু বিটল ইত্যাদি।

৭. কিছু কিছু পোকা গাছের পাতা কেটে বাসা বাঁধে। যেমন– পাতা কাটা পিঁপড়া (Leaf cutting ants)।

৮. কিছু পোকা আছে যাদের উপস্থিতির কারণে অন্য পোকার আগমন দেখা যায়। যেমন– জাবপোকার উপস্থিতি থাকলে পিঁপড়ার আগমন ঘটে। কারণ– জাবপোকা কর্তৃক নিঃসৃত মধু খাবার জন্য পিঁপড়া আসে। এজন্য জাবপোকাকে পিঁপড়ার গাভী বলা হয়। এ ক্ষেত্রে পিঁপড়া কিন্তু সরাসরি গাছের কোনো ক্ষতি করেনা। তবে তার উপস্থিতি জাবপোকার জন্য কয়েকটি সহায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে বংশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং তা থেকে গাছ আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এভাবে জাবপোকা আক্রান্ত গাছে পিঁপড়া পরোক্ষভাবে ক্ষতিসাধন করে থাকে।

৯. অনেক পোকা আছে যারা উদ্ভিদের রোগ বিস্তারে সহায়তা করে থাকে। যেমন– পাতার হপার ধানের টুংরো ভাইরাস ছড়িয়ে থাকে। জাবপোকাও ভাইরাস বহন করে।

পোকা মাকড় যে শুধু ফসলের ক্ষতিই করে থাকে এ কথা ঠিক নয়। অনেক পোকা মাকড় আছে যারা কৃষিক্ষেত্রে যথেষ্ট উপকারী প্রভাব রাখে।

১. অনেক পরভোজী (Predator) পোকা আছে যারা অন্যান্য ক্ষতিকর পোকাকে সরাসরি ধরে খেয়ে ফেলে এবং কৃষির উপর উপকারী প্রভাব রাখে। যেমন– লেডি বার্ড বিটল *(Menochilus sexmaculatus k.)* জাবপোকাকে ধরে খায়। এরকম ফড়িং, টাইগার বিটল, গ্রাউন্ড বিটল, প্রেইং ম্যানটিভ প্রভৃতি পোকা ক্ষতিকর পোকাকে ধরে খায়।

> কিছু কিছু পরজীবী পোকা আছে যারা অন্য একটি পোকার দেহে বাস করে তাদের দূর্বল করে ও মেরে ফেলে। এরূপ পরজীবী পোকা ব্যবহার করে তাদের পোষক পোকাকে দমন করা যায়।

২. কিছু কিছু পরজীবী (Parasite) পোকা আছে যারা অন্য একটি পোকার দেহে বাস করে তাদের দূর্বল করে ও মেরে ফেলে। এরূপ পরজীবী পোকা ব্যবহার করে তাদের পোষক পোকাকে দমন করা যায়। যেমন– *Trichogramma sp.* আখের ডগার মাজরা পোকার ডিমের পরজীবী হিসেবে বাস করে তাকে ধ্বংস করে দেয়। *Apanteles sp.* পাটের ক্ষতিকর বিছা পোকার দেহে ডিম পাড়ে। এতে বিছা পোকা যখন পিউপেশনে যায় তখন পিউপা থেকে পাটের বিছা পোকার মথ বের না হয়ে *Apanteles sp.* এর পূর্ণাঙ্গ পোকা বের হয়। এছাড়া অনেক বিছা পোকা দূর্বল হয়ে মারাও যায়।

> অনেক কীটপতঙ্গ আছে যাদের কারণে শিল্প গড়ে উঠেছে। যেমন– মৌমাছি, রেশম পোকা, লাক্ষা পোকা।

৩. ফসলের পরাগায়ন না হলে উৎপাদন মারাত্বকভাবে ব্যহত হত। এ পরাগায়নে কীটপতঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং ফলন বাড়াতে সহায়তা করে থাকে। মৌমাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি পোকা ফসলের পরাগায়নে সাহায্য করে।

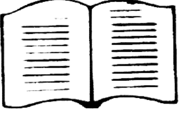
৪. অনেক কীটপতঙ্গ আছে যাদের কারণে শিল্প গড়ে উঠেছে। যেমন– মৌমাছি, রেশম পোকা, লাক্ষা পোকা। মৌমাছি আমাদেরকে মধু ও মোম দেয়। রেশম পোকা আমাদেরকে সিল্ক বা রেশম দেয় যা দ্বারা মূল্যবান কাপড় চোপড় তৈরি করা হয়। লাক্ষা পোকা আমাদেরকে গালা দেয়। এছাড়া কীটপতঙ্গের গল থেকে ট্যানিক এসিড ও কিছু কিছু প্রসাধন সামগ্রীর প্রয়োজনীয় উপাদান ও রঞ্জক পাওয়া যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে কীটপতঙ্গ থেকে ঔষধপত্রও তৈরি হয়ে থাকে।

৫. অনেক পোকা আছে যারা মাটিতে বাস করে এবং মৃত্তিকা বায় চলাচলে সহায়তা করে। অনেকে আবর্জনা খেয়ে হিউমাস তৈরিতে সাহায্য করে। যেমন– স্প্রিংটেইল, ক্লোফ্লিয়া ইত্যাদি। অনেক

গোবরে পোকা কৃষি জমির উর্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার মৃত পোকার শরীর পচে গিয়ে মাটিতে পুষ্টি উপাদান যোগ করে।

৬. ফনিমনসা (Prickly pears) জাতীয় আগাছাকে দমন করার জন্য কীটপতঙ্গ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অস্ট্রেলিয়াতে ফনিমনসা জাতীয় আগাছা আক্রান্ত জমিতে আর্জেন্টিন মথ বিস্তার লাভ করলে উক্ত আগাছা সহজেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ক্যালিফোর্নিয়াতে সেন্ট জনসওয়ার্ট আগাছা দমনের জন্য ক্রাইসোলিনা গণের পাতা খেকো বিটল ছড়িয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। আগাছা দমনের এই পদ্ধতি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমা রাজ্যগুলোতে চালু আছে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কৃষিক্ষেত্রে কীটপতঙ্গ একতরফাভাবে শুধু ক্ষতিই করে না, বরং যথেষ্ট উপকারী প্রভাবও রাখে।



**সারমর্ম ঃ** পোকামাকড় মাঠ ফসল থেকে শুরু করে গোলাজাত শস্যের পর্যন্ত প্রচুর ক্ষতি করে থাকে। ক্ষতির পরিমাণ চরমে পৌঁছলে তা শতকরা ৮০-১০০ ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে। আবার উপকারী প্রভাবও কম নয়। অনেক পরভোজী পোকা ক্ষতিকর পোকাকে ধরে খেয়ে ফেলে এবং পরজীবী পোকা ক্ষতিকর পোকার দেহে রোগ সৃষ্টি করে দূর্বল করে ও মেরে ফেলে। এছাড়া মৌমাছি মধু ও মোম দিয়ে, রেশম পোকা রেশম দিয়ে, লাক্ষা পোকা গালা দিয়ে, বিভিন্ন পোকা ফসলের পরাগায়নে মোট কথা বিভিন্নভাবে কীটপতঙ্গ মানুষের উপকার সাধন করে আসছে।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

ক. টুংরো ভাইরাস কোন্ পোকার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে?

i) টাইগার বিটল	ii) কাঠ ছিদ্রকারী পোকা
iii) মৌমাছি	iv) পাতার হপার

খ. পরভোজী পোকা কোন্‌টি?

i) রেশম পোকা	ii) বিছা পোকা
iii) প্রেয়িং ম্যানটিড	iv) পামরী পোকা

**২। সত্য হলে ‘‘স’’ এবং মিথ্যা হলে ‘‘মি’’ লিখুন।**

ক. কীটপতঙ্গের আক্রমন চরমে পৌঁছলে শতকরা ৮০ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত ফসলের ক্ষতি হয়ে থাকে।

খ. ঘাস ফড়িং পাতা থেকে রস শোষণ করে ফসলের ক্ষতি করে।

**৩। শুন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. উঁইপোকা আখের ---------- খেয়ে ক্ষতিসাধন করে।

খ. ---------- পোকা আমাদেরকে গালা দেয়।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. কোন্ পোকাকে পিঁপড়ার গাভী বলা হয়?

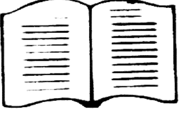
খ. কোন্ পরভোজী পোকা জাবপোকাকে ধরে খায়?

## পাঠ ১.৩ পোকার দেহের বিভিন্ন অংশের পরিচিতি



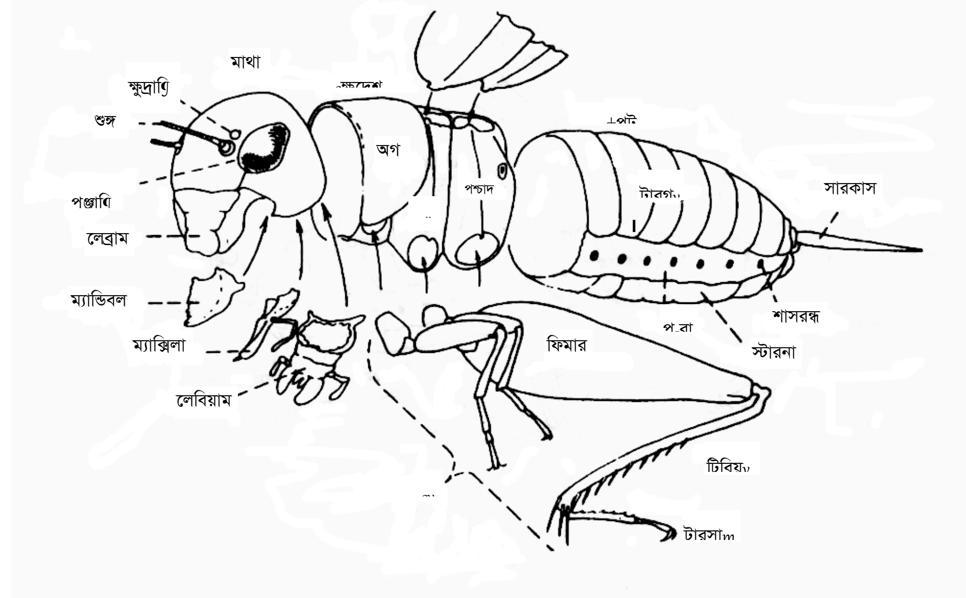
### এ পাঠ শেষে আপনি–

- পোকা ও মাকড়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।
- পোকার মাথা, বক্ষ ও পেট সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- পোকার মুখোপাঙ্গ, শুঙ্গ ও পায়ের বিভিন্ন অংশের নাম বলতে পারবেন।
- পোকার পাখার সাধারণ শিরাবিন্যাস সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।



কবির ভাষায়– দিনে মশা রাতে মাছি এ নিয়ে বেঁচে আছি। আমরা মশা মাছিকেই মূলতঃ পোকা বলে জেনে আসছি অনেক ছোটবেলা থেকে। অনেকে আবার পোকা মাকড়ও বলে থাকে। আসলে পোকা আর মাকড় সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পোকার তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, যথা– ১. তিন জোড়া পা থাকবে, ২. মাথায় শুঙ্গ থাকবে এবং ৩. দেহ মাথা, বক্ষ ও পেট এই তিন অংশে বিভক্ত থাকবে। কিন্তু মাকড়ের বেলায় ১. চার জোড়া পা থাকবে ২. মাথায় শুঙ্গ থাকবে না এবং ৩. দেহ সেফালোথোরাক্স (Cephalothorax) ও পেট এই দুই অংশে বিভক্ত থাকবে।






চিত্র ১.১ পোকার বাহ্যিক গঠন

পোকার দেহের তিনটি অংশ আবার পর পর কতগুলো খন্ড (segment) নিয়ে গঠিত। প্রতিটি খন্ডের পৃষ্ঠদেশকে টারগাম (বহুবচন- Terga), অঙ্কীয়দেশকে স্টারনাম (বহুবচন- Sterna) এবং এই দুই অংশের মধ্যবর্তী অংশকে প্লুরন (বহুবচন- Pleura) বলা হয়। পোকার দেহের উপরিভাগে কাইটিন ছাড়াও বেশ কিছু পদার্থ এসে জমা হয়। এসব পদার্থ কতগুলো শক্ত প্লেটের সৃষ্টি করে যাদেরকে স্ক্লেরাইট (Sclerite) বা স্ক্লেরা (Sclera) বলে। এ শক্ত প্লেটগুলো টারগাম, স্টারনাম ও প্লুরনে অবস্থান করে। টারগামে অবস্থিত প্লেটকে টারগাইট (Tergite), স্টারনামে অবস্থিত প্লেটকে স্টারনাইট (Sternite) এবং প্লুরার প্লেটকে প্লুরাইট (Pleurite) বলা হয়। কিন্তু দেহের উভয় দিকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কোনো স্ক্লেরা থাকে না। ঐ অংশে পাতলা আবরণ থাকে যেখানে শ্বাসরন্ধ্রগুলো (Spiracles) অবস্থান করে।

> মুখোপাঙ্গের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে তিন প্রকার মাথা দেখা যায় যেমন–অধঃমুখী মাথা, সন্মুখমুখী মাথা এবং পশ্চাদমুখী মাথা।

### মাথা (Head)

পোকার মাথায় চোখ, শুঙ্গ ও মুখোপাঙ্গ রয়েছে। মুখোপাঙ্গের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে তিন প্রকার মাথা দেখা যায়। ১. অধঃমুখী মাথা (hypognathous head) যেখানে মুখের উপাঙ্গগুলো নিচের দিকে

মুখ করে থাকে। ২. সন্মুখমুখী মাথা (Prognathous head) যেখানে মুখোপাঙ্গগুলো সামনের দিকে মুখ করে থাকে এবং ৩. পশ্চাদমুখী মাথা (Opisthognathous head) যাতে মুখোপাঙ্গগুলো দেহের নিচে কিন্তু পিছন দিকে মুখ করে অবস্থান করে। পোকার মুখোপাঙ্গে লেব্রাম বা উপরের ওষ্ঠ, লেবিয়াম বা নিচের ওষ্ঠ, ম্যান্ডিবল এবং ম্যাক্সিলা থাকে। ম্যাক্সিলা সবসময় কার্ডো, স্টাইপস, ম্যাক্সিলারী পাল্প, গ্যালিয়া ও ল্যাসিনিয়া নিয়ে গঠিত এবং ল্যাবিয়াম সবসময় সাবমেন্টাম, মেন্টাম, প্রিমেন্টাম, ল্যাবিয়াল পাল্প, প্যারাগ্লসা ও গ্লসা নিয়ে গঠিত। ম্যাক্সিলা ও ল্যাবিয়ামের গঠন চিত্র সহকারে নিম্নে দেখানো হলো।



চিত্র ১.২ ম্যাক্সিলা

চিত্র ১.৩ ল্যাবিয়াম

বেশির ভাগ পতঙ্গের পেডিসেল জনস্টন অঙ্গ (Johnston's organ) নামে এক প্রকার চলাচলের জন্য সুক্ষ অনুভূতি সম্পন্ন অঙ্গ থাকে যা ভার-সাম্যের জন্য প্রয়োজন।

কীটপতঙ্গের দু'ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চোখ রয়েছে ঃ ক্ষুদ্রাক্ষি (eOcllus) ও পুঞ্জাক্ষি (Compound eye)। ক্ষুদ্রাক্ষির সংখ্যা ৩,২ বা অনুপস্থিত এবং পুঞ্জাক্ষি এক জোড়া থাকে। এ ছাড়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক পোকাতে স্টেমাটা নামে আরও এক প্রকার চোখ রয়েছে। কীটপতঙ্গ সব জিনিসের ছবি উল্টোভাবে দেখে এবং নড়াচড়া না করলে জিনিসটিকে ঠিকভাবে দেখতে পারে না। পোকার মাথার সন্মুখ ভাগে দুই চোখের মধ্যবর্তী অংশে দু'টো শুঙ্গ (Antenna) থাকে। এই শুঙ্গের তিনটি অংশ থাকে। যথা, স্কেপ (Scape), পেডিসেল (Pedicel) ও ফ্ল্যাজেলাম (Flagellum) বা ক্ল্যাভোলা (Clavola)। স্কেপ শুঙ্গের প্রথম অংশ এবং এর সাহায্যে মাথার সাথে যুক্ত থাকে। পেডিসেল হলো দ্বিতীয় অংশ যার দৈর্ঘ্য খুব কম এবং বেশির ভাগ পতঙ্গের এ অংশে জনস্টন অঙ্গ (Johnston's organ) নামে এক প্রকার চলাচলের জন্য সুক্ষ অনুভূতি সম্পন্ন অঙ্গ থাকে যা ভারসাম্যের জন্য প্রয়োজন। শুঙ্গের শেষ অংশ হলো ফ্ল্যাজেলাম যা সবচেয়ে লম্বা এবং অনেকগুলো খন্ডাংশ নিয়ে গঠিত।



চিত্র ১.৪ পোকার স্বাভাবিক শুঙ্গ

### বক্ষ (Thorax)

পোকার বক্ষদেশ অগ্রবক্ষ (Prothorax), মধ্যবক্ষ (Mesothorax) ও পশ্চাদবক্ষ (Metathorax) এই তিন অংশে বিভক্ত থাকে। এই তিন অংশ থেকে তিন জোড়া পা উৎপন্ন হয় যা মূলত পোকা হাঁটা বা চলাফেরার কাজে ব্যবহার করে থাকে। পোকার স্বাভাবিক একটা পা সাধারণত কক্সা (Coxa), ট্রকেন্টার (Trochanter), ফিমার (Femur), টিবিয়া (Tibia), টারসাস (Tarsus) ও প্রিটারসাস (Pretarsus) অংশ নিয়ে গঠিত। কক্সা পায়ের প্রথম অংশ যার আকৃতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গোলাকার এবং এর সাহায্যে দেহের সাথে পা লেগে থাকে। ট্রকেন্টার পায়ের দ্বিতীয় অংশ যার আকৃতি অনেক ছোট। এটি একটি কব্জার সাহায্যে কক্সার সঙ্গে স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করার সুযোগ পায়। ফিমার হলো পায়ের সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী অংশ। টিবিয়া খুব সরু, লম্বায় ফিমারের চেয়ে কিছু খাটো এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বড়ও দেখা যায়। টিবিয়ার শেষপ্রান্তে কিছু কিছু সূক্ষ্ম কাঁটা বা লোম থাকে। টারসাস সাধারণত দুই থেকে পাঁচটি উপখন্ডাংশে বিভক্ত থাকে যাদেরকে টারসোমিয়ার (Tarsomere) বলা হয়। টারসাসের অগ্রভাগে পায়ের শেষ খন্ডাংশই হল প্রিটারসাস। প্রিটারসাস সাধারণত সূক্ষ্ম বাঁকা নখের (Claw) মত দেখা যায়। এর সাহায্যে পোকা সম্ভবত কোনো কিছু আকড়িয়ে ধরে রাখার কাজ করে থাকে।



চিত্র ১.৫ পোকার পায়ের বিভিন্ন অংশ

পোকার মধ্যবক্ষ ও পশ্চাদবক্ষ থেকেই দুই জোড়া পাখা উৎপন্ন হয়। অগ্রবক্ষ থেকে কোনো পাখা সৃষ্টি হয় না।

পোকার মধ্যবক্ষ ও পশ্চাদবক্ষ থেকে দুই জোড়া পাখা উৎপন্ন হয়। উল্লেখ্য যে, অগ্রবক্ষ থেকে কোনো পাখা সৃষ্টি হয় না। বেশিরভাগ পোকার পাখাই দেখতে পাতলা পর্দার মত। এই পাখার সুস্পষ্ট একটা কাঠামো রয়েছে এবং পাখার মধ্যে অনেক শিরা আছে। পাখায় অবস্থিত শিরার সংখ্যা ও বিন্যাস পদ্ধতি দেখে অনেক পতঙ্গ শনাক্ত করা যায়। পোকার স্বাভাবিক একটা পাখায় সাধারণত লম্বালম্বি শিরা, আড়াআড়ি শিরা, যুগ্ম শিরা, অতিরিক্ত শিরা ও আনুষাঙ্গিক শিরা বিশেষ নিয়মে সজ্জিত থাকে। শিরাগুলোর মধ্যবর্তী স্থানকে কোষ বলা হয়। কোষগুলো পাখার শেষ প্রান্তের দিকে থাকলে উন্মুক্ত কোষ এবং শিরা দ্বারা বেষ্টিত থাকলে তাদেরকে বদ্ধ কোষ বলে। ডিপটেরা বর্গের কোনো কোনো পোকার পাখার উপরে অতিসূক্ষ্ম লোম ও লেপিডপ্টেরা বর্গের পোকার পাখায় লোমের পরিবর্তে অসংখ্য আঁশ থাকে এবং কোনো কোনো পোকার পাখার কস্টার (একটি প্রধান অবিভক্ত শিরা) প্রান্তে একটা স্বচ্ছ দাগ দেখা যায় যাকে স্টিগমা বলা হয়।



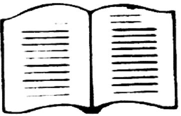
চিত্র ১.৬ কীটপতঙ্গের পাখার সাধারন শিরাবিন্যাস

C =কস্টা, Sc = সাবকস্টা, R = রেডিয়াস, M = মিডিয়া, Cu = কিউবিটাস, A =অ্যানাল ,

## পেট (Abdomen)

পোকার বক্ষের পিছনের অংশকে পেট বলা হয়। পোকার পেট স্পষ্ট ১১ বা ৮ বা তার চেয়ে কম সংখ্যক খন্ডাংশ নিয়ে গঠিত।

পোকার বক্ষের পিছনের অংশকে পেট বলা হয়। পোকার পেট স্পষ্ট ১১ বা ৮ বা তার চেয়ে কম সংখ্যক খন্ডাংশ নিয়ে গঠিত। অধিকাংশ পোকার পেট স্বাভাবিকভাবে ১১ খন্ডাংশ নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। স্পী জাতীয় পোকার পেটের অষ্টম ও নবম খন্ডাংশ এবং পুরুষ জাতীয় পোকার পেটের নবম খন্ডাংশ জনন খন্ডাংশ (Genital segment) নামে পরিচিত। এর আগের খন্ডাংশগুলোকে প্রাকজনন খন্ডাংশ (Pregenital segment) এবং পরেরগুলোকে জননোত্তর খন্ডাংশ (Postgenital segment) বলা হয়। সাধারণত অষ্টম ও নবম খন্ডাংশের উপাঙ্গ বা বহিরাংশ বাহ্যিক জনন অঙ্গ গঠন করে থাকে। পেটের শেষ প্রান্তে লেজের মত অংশকে টেলসন (Telson) বা সারকাস (Cercus) বলা হয়।



**সারমর্ম ঃ** পোকা ও মাকড় সম্পর্ণ ভিন্ন জিনিষ। পোকার দেহ মাথা, বক্ষ ও পেট এই তিন অংশে বিভক্ত। মাথায় চোখ, শুঙ্গ ও মুখোপাঙ্গ থাকে। ক্ষুদ্রাক্ষি ও পুঞ্জাক্ষি দু'ধরনের চোখ পোকায় থাকে। স্কেপ, পেডিসেল ও ফ্ল্যাজেলাম নামে তিনটি অংশ শুঙ্গে বর্তমান। পোকার মুখে লেব্রাম, ল্যাবিয়াম, ম্যান্ডিবল ও ম্যাক্সিলা নামে চার ধরনের উপাঙ্গ আছে। পোকার বক্ষদেশ তিন ভাগে বিভক্ত যথা- অগ্রবক্ষ, মধ্যবক্ষ ও পশ্চাদবক্ষ। বক্ষদেশের তিন অংশ থেকে তিন জোড়া পা এবং মধ্য ও পশ্চাদ বক্ষ থেকে দু'জোড়া পাখা উৎপন্ন হয়। পোকার পা কক্সা, ট্রকেন্টার, ফিমার, টিবিয়া, টারসাস ও প্রিটারসাস নিয়ে গঠিত। অধিকাংশ পোকার পাখাই পাতলা পর্দার মত এবং এই পাখায় বিভিন্ন ধরনের শিরা একটা বিশেষ নিয়মে সজ্জিত থাকে। পোকার পেটে জনন খন্ডাংশ থাকে।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

### ১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক. ফ্ল্যাজেলাম কোন্ অঙ্গের অংশ?

i) পায়ের ii) মুখের
iii) শুঙ্গের iv) পেটের

খ. পোকার পায়ের কোন্ অংশটি সবচেয়ে বড়?

i) কক্সা ii) ট্রকেন্টার
iii) ফিমার iv) টিবিয়া

### ২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।

ক. কীটপতঙ্গের দু'ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চোখ রয়েছে।
খ. ল্যাবিয়াম পোকার পায়ের একটি অংশ।

### ৩। শুন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. টারগামে অবস্থিত প্লেটকে ---------- বলে।
খ. --------- এর অগ্রভাগে পায়ের শেষ খন্ডাংশই হলো প্রিটারসাস।

### ৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. পোকার বক্ষদেশ কয়ভাগে বিভক্ত?
খ. কক্সা পোকার কিসের অংশ?

## পাঠ ১.৪ পোকার বিভিন্ন মুখাবয়ব ও তাদের বিবরণ



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- কীটপতঙ্গের বিভিন্ন প্রকার মুখোপাঙ্গের নাম বলতে পারবেন।
- কীটপতঙ্গের বিভিন্ন প্রকার মুখোপাঙ্গের বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার মুখোপাঙ্গের সাহায্যে কীটপতঙ্গ কিভাবে খাদ্য খেয়ে থাকে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



কীটপতঙ্গের মুখে যে সমস্ত উপাঙ্গ থাকে এবং তাদের খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় তাদেরকে মুখোপাঙ্গ বা মুখের উপাঙ্গ (Mouth Parts) বলে। যেমন– উপরের ওষ্ঠ বা লেব্রাম, নিচের ওষ্ঠ বা লেবিয়াম, ম্যান্ডিবল, ম্যাক্সিলা এবং জিহ্বা (Hypo-pharynx) বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আলজিহ্বা (Superlinguae) থাকে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বের পাঠে দেয়া আছে। মুখের উপাঙ্গগুলো পতঙ্গের খাদ্যবস্তু গ্রহণ করার কাজে সহায়তা করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের জন্য এদের মুখোপাঙ্গও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তাই নির্দিষ্ট কোনো ধরনের মুখোপাঙ্গ দ্বারা কেবল নির্দিষ্ট কোনোপ্রকার খাদ্য গ্রহণ করাই সম্ভব হয়ে থাকে। কীটপতঙ্গে যে সমস্ত ধরনের মুখোপাঙ্গ দেখা যায় তা নিচে উল্লেখ করা হল।

১. চর্বনকারী (Chewing type)
২. কর্তন ও শোষণকারী (Cutting and sponging type)
৩. শোষণকারী (Sponging type)
৪. চর্বন ও লেহনকারী (Chewing and lapping type)
৫. অনুবিদ্ধন ও চোষণকারী (Piercing and sucking type)
৬. সাইফনিং বা নলাকার (Siphoning tube type)

### চর্বনকারী মুখোপাঙ্গ

চর্বনকারী মুখোপাঙ্গই কীট-পতঙ্গের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। অন্যান্য যে সব মুখোপাঙ্গ আছে তা মূলত এর পরিবর্তিত রূপ।

এ ধরনের মুখোপাঙ্গে ম্যান্ডিব্‌ল বেশ শক্ত ও সবল থাকে যা খাদ্যবস্তুকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। পরে ম্যাক্সিলা ও লেবিয়াম ঐ খাদ্যবস্তুকে আরও চূর্ণবিচূর্ণ করে অন্ননালীর দিকে ঠেলে দেয়। ফড়িং, আরশোলা, প্রজাপতি ও মথের লার্ভা বা শুককীট, পরভূক চেলেপোকা, সৈনিক পিঁপড়া প্রভৃতি কীটপতঙ্গে এ ধরনের মুখোপাঙ্গ দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের মুখোপাঙ্গই কীটপতঙ্গের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। অন্যান্য যে সব মুখোপাঙ্গ আছে তা মূলত এর পরিবর্তিত রূপ। এ সম্পর্কে দুটো প্রমাণ দেয়া যায়– এক. কীটপতঙ্গের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেনটিপেড এবং সিমফাই-লাতে এ রকম মুখোপাঙ্গ আছে। দুই. অধিকাংশ গোত্রের (Family) পতঙ্গে এবং অনেক গোত্রের পতঙ্গের লার্ভাতে এ ধরনের মুখোপাঙ্গ থাকে।



চিত্র ১.৭ চর্বনকারী মুখোপাঙ্গ

### কর্তন ও শোষণকারী মুখোপাঙ্গ

কীটপতঙ্গের এ ধরনের মুখোপাঙ্গের ম্যান্ডিবল সাধারণত ধারালো ব্লেডের মত হয়ে থাকে। এদের ম্যাক্সিলা সরু ও লম্বা হয়ে থাকে। এ রকম ম্যান্ডিবল ও ম্যাক্সিলার সাহায্যে ঘোড়া (ডাকু) মাছি (Horse fly) স্তন্যপায়ী প্রাণীর ত্বক বা চামড়া কেটে ফেলে এবং সেই কাটা স্থান থেকে যে রক্ত বের হয় তা তাদের লেবিয়াম দ্বারা শোষণ করে জিহ্বার শেষ প্রান্তে পৌঁছে দেয়। এ জাতীয় পোকার জিহ্বা ও আলজিহ্বা একসংগে মিলে গিয়ে একটা নালীর সৃষ্টি করে। পরে রক্ত সেই নালীর ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে অন্ননালীর ভিতর প্রবেশ করে। ডিপটেরা বর্গের অন্তর্ভুক্ত ব্র্যাকাইসেরা উপবর্গের আওতাধীন ট্যাবানিড জাতীয় মাছিতে এ ধরনের মুখোপাঙ্গ দেখা যায়।



চিত্র ১.৮ কর্তন ও শোষণকারী মুখোপাঙ্গ

## শোষণকারী মুখোপাঙ্গ

শোষনকারী মুখোপাঙ্গে ম্যান্ডি-বল ও স্পষ্ট ম্যাক্সিলা নেই। তবে ম্যাক্সিলাকে এক জোড়া পাল্পের দ্বারা কেবল শনাক্ত করা যায়।

এ জাতীয় মুখোপাঙ্গে ম্যান্ডিবল ও স্পষ্ট ম্যাক্সিলা নেই। তবে ম্যাক্সিলাকে এক জোড়া পাল্পের দ্বারা কেবল শনাক্ত করা যায়। সুতরাং ম্যান্ডিব্‌ল ও ম্যাক্সিলার কোনো কাজ নেই। এ ধরনের মুখোপাঙ্গে ল্যাবিয়ামের সংকোচন করার ক্ষমতা থাকে এবং ল্যাবিয়াম খুব মাংশল থাকে। এই ল্যাবিয়াম রূপান্তরিত হয়ে শুঁড়ের আকার ধারণ করে যার অগ্রভাগ প্রশস্ত থাকে এবং একে ল্যাবেলা বলা হয়। ল্যাবেলার চারিদিকে অনেকগুলো সরু সরু নালিকা থাকে। ল্যাবেলা তরল খাবারের উপর পড়লে বা শক্ত খাবারের (যেমন–চিনি) উপর পড়লে লালার সংস্পর্শে তা তরল হয়ে ল্যাবেলার সংকোচনশীল ক্ষমতা থাকায় তার নালিকা দিয়ে শোষিত হয় এবং পরে তা অন্ননালীর ভিতর প্রবেশ করে। ঘরের মাছিতে এ রকম মুখোপাঙ্গ দেখা যায়।



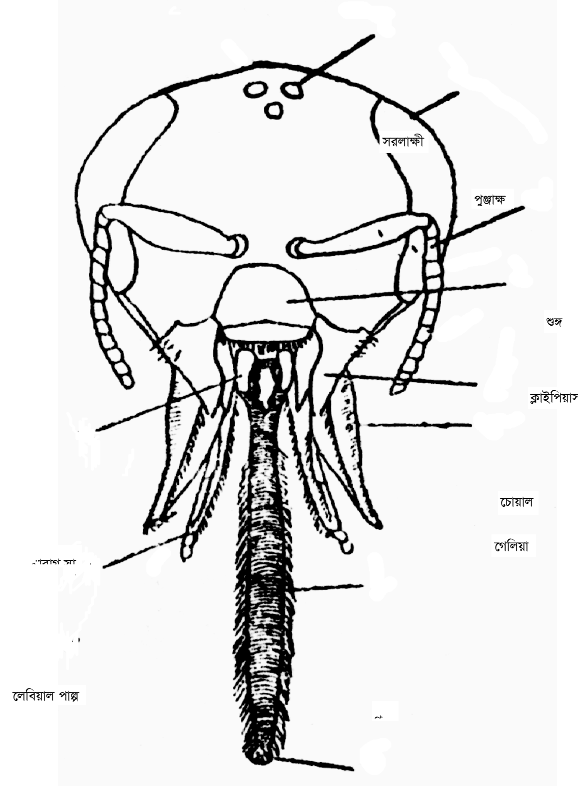
চিত্র ১.৯ শোষণকারী মুখোপাঙ্গ

## চর্বন ও লেহনকারী মুখোপাঙ্গ

ল্যাব্রাম, ল্যাবিয়াম, ম্যান্ডিবল ও ম্যাক্সিলা নিয়ে এ রকম মুখোপাঙ্গ গঠিত। এ ধরনের মুখোপাঙ্গে ম্যাক্সিলা ও ল্যাবিয়াম পাশাপাশি মিলে একটা লম্বা লেহন জিভ বা নলের সৃষ্টি করে। এ জিভ বা নলকে গ্লসা বলা হয়। গ্লসার দ্রুত সংকোচন ও প্রসারণ ক্ষমতা থাকায় ফুলের ভিতর থেকে সহজে মধু সংগ্রহ করতে পারে। অনেকের ধারণা যে, এ জাতীয় মুখোপাঙ্গ বিশিষ্ট পোকা ফুলের মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে মধুকোষের ভিতরে গ্লসা ছুড়ে দেয় এবং গ্লসার প্রান্ত দিয়ে মধু চুষে নেয়। ইমস্ এর মতে গ্লসার অঙ্কীয় নালী দিয়ে তরল খাবার ক্যাপিলারী শক্তিতে উপরে উঠে এবং পেশী সংকোচনের সাহায্যে গ্লসা সংকুচিত হয়ে তরল খাবার উপরের দিকে নিয়ে আসে। বোলতা, মৌমাছি প্রভৃতি পোকায় এ ধরনের মুখোপাঙ্গ দেখা যায়।

চর্বন ও লেহনকারী মুখোপাঙ্গে ম্যাক্সিলা ও ল্যাবিয়াম পাশাপাশি মিলে একটা লম্বা লেহন জিভ বা নলের (গ্লসা) সৃষ্টি করে। গ্লসা দ্বারা ফুলের ভিতর থেকে সহজে মধু সংগ্রহ করতে পারে।

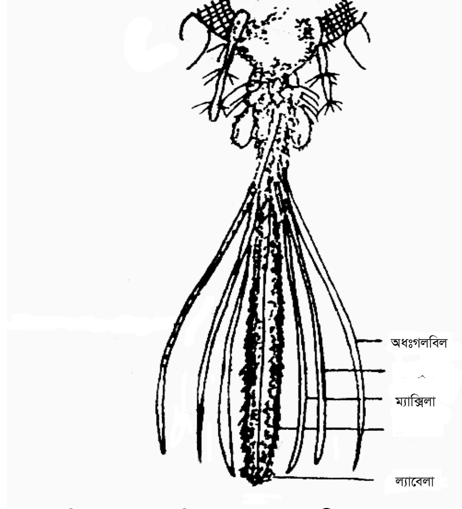





চিত্র ১.১০ চর্বন ও লেহনকারী মুখোপাঙ্গ

## অনুবিদ্ধন ও চোষণকারী মুখোপাঙ্গ

এ রকম মুখোপাঙ্গ লম্বা নলের মত যা সন্ধিযুক্ত থাকে। নলের মধ্যে সূচের মত কতগুলো স্টাইলেট অবস্থান করে। এ ধরনের মুখোপাঙ্গে ম্যান্ডিবল, ম্যাক্সিলা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জিহবা আকারে সরু ও লম্বা হয়ে সূচে পরিণত হয়। ল্যাব্রাম এ সূচকে শক্তভাবে অবস্থান করতে সাহায্য করে। নলের বাইরের আবরণটা হলো ল্যাবিয়াম। খাদ্য গ্রহণকালে এ ধরনের মুখোপাঙ্গ বিশিষ্ট কীটপতঙ্গ তাদের নল বা ঠোঁট উদ্ভিদ বা প্রাণীর ত্বকের উপর স্থাপন করে। এতে সূচের মত স্টাইলেট ত্বকের ভিতর প্রবেশ করে এবং উদ্ভিদ বা প্রাণী থেকে রস বা রক্ত চোষণ করে নেয়। যেমন– ছাতরা পোকা, জাবপোকা এ ধরনের মুখোপাঙ্গের সাহায্যে উদ্ভিদ থেকে রস চোষণ করে নেয়। আবার ছারপোকা,মশা প্রভৃতি স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহ থেকে রক্ত চোষণ করে নেয়।

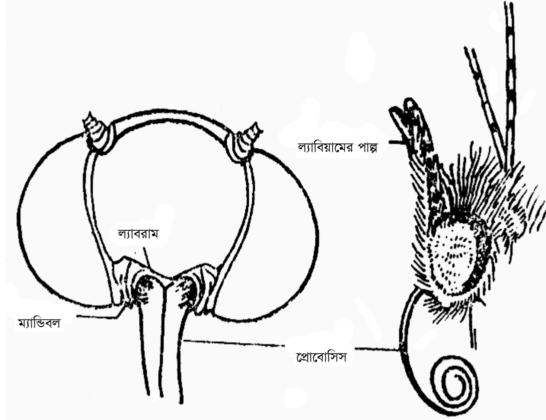



চিত্র ১.১১ অনুবিদ্ধন ও চোষনকারী মুখোপাঙ্গ

### সাইফনিং মুখোপাঙ্গ

সাইফনিং মুখোপাঙ্গের পেচানো প্রোবোসিস সোঁজা করে এর অগ্রভাগ তরল খাবারের উপর স্থাপন করে এবং তরল খাবার টেনে নেয়।

এ ধরনের মুখোপাঙ্গে সাধারণত ম্যান্ডিবল থাকে না। ম্যাক্সিলার পাল্পের কিছু অংশ রয়েছে এবং ল্যাব্রাম খুব ছোট থাকে। ল্যাবিয়ামের গোড়ার অংশ এবং তিন খন্ডাংশ বিশিষ্ট পাল্প ছাড়া অন্য কিছুই দেখা যায় না। ম্যাক্সিলার গ্যালিয়া অংশ অত্যন্ত লম্বা এবং দুটো গ্যালিয়া একত্রে মিলে একটা সরু ফাঁপা নলের সৃষ্টি করে। এ নল ব্যবহারহীন অবস্থায় মাথার নিচের দিকে ঘড়ির স্প্রিংয়ের মত পেচানো থাকে যাকে প্রবোসিস বলা হয়। পেচানো প্রোবোসিস সোঁজা করে এর অগ্রভাগ তরল খাবারের উপর স্থাপন করে এবং তরল খাবার টেনে নেয়। প্রজাপতি ও মথে এ ধরনের মুখোপাঙ্গ দেখা যায়।




চিত্র ১.১২ সাইফনিং মুখোপাঙ্গ

***অনুশীলন (Activity)*** *ঃ মাছি ও মশার মুখোপাঙ্গের ধরন কী? কীভাবে এরা খাবার খায় তার প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।*

**সারমর্ম ঃ** পোকার মুখে সাধারণত লেব্রাম, ল্যাবিয়াম, ম্যান্ডিবল ও ম্যাক্সিলা নামে উপাঙ্গ থাকে এবং এগুলো খাদ্য গ্রহণে সাহায্য করে। এ উপাঙ্গগুলো পরিবর্তিত হয়ে পতঙ্গভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে বিধায় মুখোপাঙ্গ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে, যেমন– চর্বনকারী, কর্তন ও শোষণকারী, চর্বন ও লেহনকারী, অনুবিদ্ধন ও চোষণকারী এবং সাইফনিং বা নলাকার মুখোপাঙ্গ। মুখোপাঙ্গের ধরন অনুযায়ী কীটপতঙ্গের খাদ্যের ধরণ খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া বিভিন্ন হয়ে থাকে।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

ক. প্রবোসিস কোন্ পোকায় থাকে?

i) মশা ii) প্রজাপতি
iii) ঘাস ফড়িং iv) ছারপোকা

খ. গ্যালিয়া কার অংশ?

i) ম্যাক্সিলা ii) ম্যান্ডিবল
iii) ল্যাব্রাম iv) ল্যাবিয়াম

**২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।**

ক. ঘোড়া মাছির মুখোপাঙ্গ চর্বোনোপযোগী।
খ. প্রজাপতিতে সাইফনিং টাইপ মুখোপাঙ্গ দেখা যায়।

**৩। শুন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. জাবপোকার মুখোপাঙ্গ ---------- ধরনের।
খ. শোষণকারী মুখোপাঙ্গে ------- ও ------- নেই।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

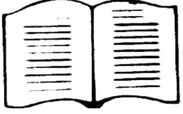
ক. ম্যাক্সিলা পোকার কিসের উপাঙ্গ?
খ. ঘরের মাছিতে কী ধরনের মুখোপাঙ্গ থাকে?

## পাঠ ১.৫ পোকার বিভিন্ন প্রকার পাখা, পা ও শুঙ্গ এবং তাদের বিবরণ



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- পোকার বিভিন্ন প্রকার পাখা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পোকার বিভিন্ন প্রকার পা সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পোকার বিভিন্ন প্রকার শুঙ্গের নাম লিখতে পারবেন।
- পোকার শুঙ্গের কার্যাবলী উল্লেখ করতে পারবেন।



### পোকার পাখা (Insect wings)

পতঙ্গের দু'জোড়া পাখা থাকে। প্রথম জোড়া মধ্যবক্ষ (Mesothorax) ও দ্বিতীয় জোড়া পশ্চাৎবক্ষ (Metathorax) থেকে উৎপন্ন হয়। অগ্রবক্ষ (Prothorax) থেকে কখনও পাখা গজায় না। পাখা থাকার দরুণ পতঙ্গ সহজেই উড়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। পৃথিবীতে অধিকাংশ পতঙ্গেরই পাখা আছে, তবে পাখাহীন পতঙ্গের সংখ্যাও কম নয়। পাখাধারী পতঙ্গের মধ্যেও লক্ষ্য করা গেছে এদের অনেকেরই বছরের সবসময় পাখা থাকে না। উদাহরণস্বরূপ এফিডের কথা বলা যায়। এফিডের পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় কিছুসংখ্যক পতঙ্গে পাখা থাকে। কিন্তু কিছু সংখ্যকে একেবারেই পাখা থাকে না। সেরকম উঁইপোকা ও পিপড়ার স্ত্রী পতঙ্গে পাখা থাকে না। পাখাধারী যে সব পতঙ্গে পাখা নেই তা আসলে প্রাথমিক অবস্থা নয়, বরং এটা হল মাধ্যমিক অবস্থা। ধরে নেয়া যেতে পারে, বিশেষ কোনো কারণে তারা পাখাহীন হয়ে পড়েছে।

> পতঙ্গের দু'জোড়া পাখা থাকে। প্রথম জোড়া মধ্যবক্ষ ও দ্বিতীয় জোড়া পশ্চাৎবক্ষ থেকে উৎপন্ন হয়। অগ্রবক্ষ থেকে কখনও পাখা গজায় না।

কীটপতঙ্গে বিভিন্ন প্রকার পাখা দেখা যায় যা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল–

### হলটেয়ার (Haltare)

ঘরের মাছিতে (House fly) এ ধরনের পাখা দেখা যায়। এদের প্রথম জোড়া পাখা উড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় জোড়া পাখা না থেকে সেখানে একটা অতি ছোট অংশ থাকে যাকে হলটেয়ার বলা হয়। এই হলটেয়ার উড়ার সময় দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে।

### ইলাইট্রা (Elytra)

অনেক পতঙ্গ আছে যাদের সামনের পাখা জোড়ার সম্পর্ণ অংশই খুব শক্ত থাকে, কিন্তু পিছনের জোড়া ঝিল্লীবৎ (Membranous) থাকে। সামনের এই শক্ত পাখাকে ইলাইট্রা বলা হয়। কলিওপটেরা বর্গের বিটল ও উইভিল জাতীয় পোকায় এ ধরনের পাখা দেখা যায়। যেমন– গোবরে পোকা (Dung beetle)। পোকা যখন বিশ্রামের সময় পিছনের ঝিল্লীবৎ পাখা শরীরের সাথে গুটিয়ে রাখে তখন সামনের শক্ত পাখা ঝিল্লীবৎ পাখাদ্বয়কে ঢেকে রাখে। ঝিল্লীবৎ এই পাখা পোকা উড়ার কাজে ব্যবহার করে থাকে।

### হেমিলাইট্রা (Hemelytra)

> কিছুসংখ্যক পোকার সামনের পাখার গোড়ার দিকের অর্ধেক অংশ শক্ত থাকে, কিন্তু অগ্রভাগের অর্ধেক অংশ ঝিল্লীবৎ থাকে। এ ধরনের পাখাকে হেমিলাইট্রা বলে।

কিছুসংখ্যক পোকার সামনের পাখার গোড়ার দিকের অর্ধেক অংশ শক্ত থাকে, কিন্তু অগ্রভাগের অর্ধেক অংশ ঝিল্লীবৎ থাকে। এ ধরনের পাখাকে হেমিলাইট্রা বলে। হেমিপটেরা বর্গের আওতাধীন হেটেরো-পটেরা উপবর্গের পোকায় এ ধরনের পাখা দেখা যায়। যেমন– ধানের গান্ধী পোকা। সামনের পাখার শক্ত অর্ধেক অংশের উপরের অর্ধেককে কোরিয়াম এবং নিচের অর্ধেককে ক্ল্যাভাস বলা হয়।

### ট্যাগমিনা (Tegmina)

অনেক কীটপতঙ্গ আছে যাদের সামনের পাখা জোড়া শক্ত হয়ে চামড়ার মত আকার ধারণ করে এ ধরনের পাখাকে ট্যাগমিনা বলা হয়। অর্থোপটেরা বর্গের পোকায় এ রকম পাখা দেখা যায়। যেমন– ঘাস ফড়িং, উঁড়চুঙ্গা ইত্যাদি।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামনের পাখার সাথে পিছনের পাখা কোনো কিছু দ্বারা যুক্ত থাকে এবং এর ফলে দু'জোড়া পাখা পৃথকভাবে কাজ না করে একই সাথে কাজ করে।

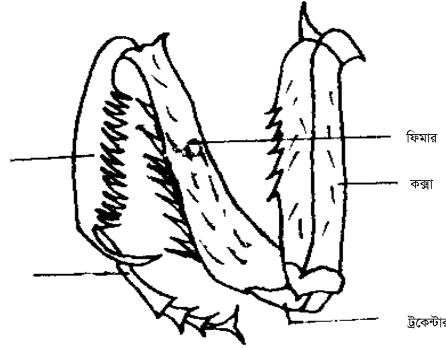
সামনের পাখা ও পিছনের পাখা সাধারণত পরস্পর থেকে পৃথক থাকে এবং উড়বার সময় পৃথকভাবে কাজ করে থাকে। কিন্তুকোনো কোনো ক্ষেত্রে সামনের পাখার সাথে পিছনের পাখা কোনো কিছু দ্বারা যুক্ত থাকে এবং এর ফলে দু'জোড়া পাখা পৃথকভাবে কাজ না করে একই সাথে কাজ করে। পাখাদ্বয়ের যুক্তকারী এ বস্তুগুলোর বিভিন্ন নাম আছে, যেমন হ্যামুলি, জুগাম, ফ্রেনুলাম এবং রেটিনাকুলাম।

## পোকার পা (Insect legs)

পোকার বক্ষদেশে তিনটি খন্ডাংশ আছে, যথা– অগ্রবক্ষ, মধ্যবক্ষ ও পশ্চাৎবক্ষ। এই তিন খন্ডাংশ থেকে তিন জোড়া পা উৎপন্ন হয়। পোকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তিন জোড়া পা। পৃথিবীতে অন্য কোনো প্রাণীর তিনজোড়া পা নেই। তাই পোকাকে ষড়পদী বলা হয়ে থাকে। হাঁটার সময় পোকার সামনের পা দেহকে টেনে নিয়ে যায় এবং পিছনের পা সামনের দিকে ঠেলে দেয়। মাঝখানের পা দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। সব প্রাণী সাধারণত হাটা বা দাঁড়াবার কাজে পা ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু পোকার বেলায় এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। কাজের পার্থক্যের কারণে পোকাভেদে পায়ের গঠন প্রকৃতিতে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। এ রকম কিছু ব্যতিক্রমধর্মী পা নিচে আলোচনা করা হল।

**১. শিকার ধরার উপযোগী পা (Grasping or Raptorial or Preying type leg)**

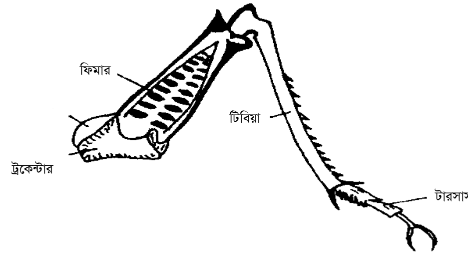
কিছু কিছু পোকা আছে যারা তাদের পা কে শিকার ধরার কাজে ব্যবহার করে থাকে। এ রকম পায়ের কক্সা আকারে বড় এবং ফিমার ও টিবিয়া কাঁটাযুক্ত থাকে। যেমন– প্রেয়িং ম্যানটিড পোকার সামনের পা।




চিত্র ১.১৩ শিকার ধরার উপযোগী পা

**২. লাফ দেয়ার উপযোগী পা (Jumping type leg)**

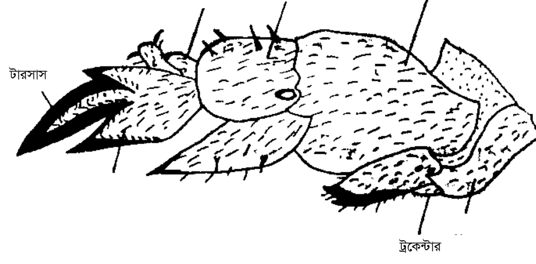
অনেক পতঙ্গের পিছনের পায়ের ফিমার আকারে বেশ বড়, পেশীবহুল ও শক্তিশালী। ফলে তারা সহজে লাফ দিতে পারে। যেমন– ঘাস ফড়িং এর পিছনের পা।




চিত্র ১.১৪ লাফ দেয়ার উপযোগী পা

**৩. গর্ত করার উপযোগী পা (Digging type leg)**

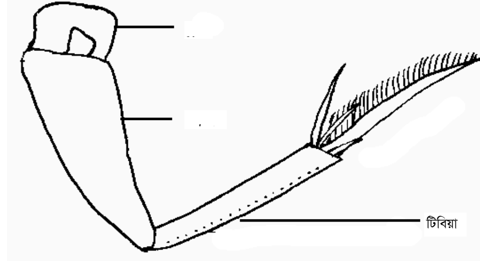
এ ধরনের পায়ের সবগুলো অংশই পুরু এবং শক্তিশালী। টারসাস তিন খন্ডাংশযুক্ত ও এর অগ্রভাগ দাঁত সদৃশ অর্থাৎ আঁচড়ার মত যা গর্ত করার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– মোল ক্রিকেটের সামনের পা।




চিত্র ১.১৫ গর্ত করার উপযোগী পা

**৪. সাঁতার কাটার উপযোগী পা (Swimming type leg)**

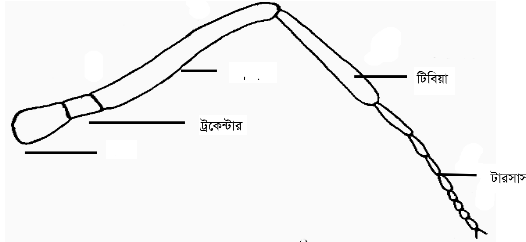
এ ধরনের পায়ের কক্সা বেশ প্রশস্ত হয়ে থাকে। টিবিয়া কাঁটাযুক্ত হয় এবং টারসাসের সঙ্গে লম্বা লম্বা লোম থাকে যা পানিতে নৌকার বৈঠার মত কাজ করে। ফলে পোকা এর সাহায্যে সহজে সাঁতরাতে পারে। যেমন– স্কেভেঞ্জার বিটলের (Scavenger beetle) পা।




চিত্র ১.১৬ সাঁতার কাটার উপযোগী পা

**৫. দৌড়ানোর উপযোগী পা (Running type leg)**

অনেক কীটপতঙ্গ আছে যাদের পায়ের ফিমার ও টিবিয়া বেশ লম্বা। ফলে এরা দ্রুত দৌড়াতে পারে। যেমন– তেলাপোকার (Cockroach) পা।




চিত্র ১.১৭ দৌড়ানোর উপযোগী পা

**৬. ফুলের রেণু বহনকারী হাটার উপযোগী পা (Walking type beg modified for pollen carrying)**

এ ধরনের পায়ের টিবিয়াতে ছোট ছোট লোম (bristle) থাকে। টারসাস পাঁচ খন্ডাংশযুক্ত হয়। টারসাসের প্রথম খন্ড বেশ প্রশস্ত হয় এবং ঝুড়ির (basket) মত দেখায় যা রেণু বহন করে ফুলের পরাগায়নে সাহায্য করে থাকে। যেমন– মৌমাছির পিছনের পা।



চিত্র ১.১৮ ফুলের রেণু বহনকারী হাটার উপযোগী পা

## পোকার শুঙ্গ (Antennae of insects)

শুঙ্গ পোকার মাথার অগ্রভাগ অর্থাৎ দুই চোখের মধ্যবর্তী অংশ থেকে উৎপন্ন হয়। পোকায় দুটো শুঙ্গ থাকে। শুঙ্গ হল পোকার একটি অনুভূতি নির্ণয়ক অঙ্গ। এর সাহায্যে পোকা চলাফেরার সময় বিপদজনক অবস্থা সনাক্ত করতে পারে। খাদ্য ও সঙ্গী খুঁজে বের করতে পারে, নিজস্ব গোষ্ঠীর পোকার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে, লিঙ্গ সনাক্ত করা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষ পোকা মিলনের সময় স্ত্রী পোকাকে ধরার কাজে ব্যবহার করে থাকে এবং মৌমাছি স্বাদ ও ঘ্রাণ বুঝতে পারে ইত্যাদি।

পোকাতে নানা আকার আকৃতির শুঙ্গ দেখা যায়। যেমন– সিটা-সিয়াস, ফিলিফর্ম, মনিলিফর্ম, সিরেট, পেকটিনেট, ক্লাব্‌ড, জেনিকিউলেট, প্লুমোজ, এ্যারি-স্টেট ও স্কাইলেট শুঙ্গ।

পোকায় নানা আকার আকৃতির শুঙ্গ দেখা যায়। নিচে বিভিন্ন প্রকার শুঙ্গের নামসহ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল ঃ

**১. সিটাসিয়াস শুঙ্গ (Setaceous antenna)**

এ শুঙ্গগুলো দেখতে খুব ছোট এবং দাঁড়ানো চুলের মতো। এদের খন্ডাংশগুলো সামনের দিকে আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসে। যেমন– পাতার হপার, ড্রাগন ফ্লাই ইত্যাদি পোকার শুঙ্গ।

**২. ফিলিফর্ম শুঙ্গ (Filiform antenna)**

এ রকম শুঙ্গ দেখতে অনেকটা সূতার মতো এবং এদের খন্ডাংশের সবগুলো প্রায় একই সমান। যেমন– টাইগার বিটল, গ্রাউন্ড বিটল প্রভৃতি পোকার শুঙ্গ।

**৩. মনিলিফর্ম শুঙ্গ (Moniliform antenna)**

এ ধরনের শুঙ্গ অসংখ্য গোলাকার দানাবিশিষ্ট মনে হয় এবং সবগুলো দানা প্রায় একই সমান হয়ে থাকে। যেমন– উঁইপোকার শুঙ্গ।

**৪. সিরেট শুঙ্গ (Serrate antenna)**

এ রকম শুঙ্গ দেখতে অনেকটা করাতের দাঁতের মত এবং প্রত্যেকটা খন্ডাংশ মোটামুটি ত্রিভুজাকৃতির। যেমন– পূর্ণ বয়স্ক তার পোকার (Click beetle) শুঙ্গ।

**৫. পেকটিনেট শুঙ্গ (Pectinate antenna)**

এ ধরনের শুঙ্গ দেখতে এক পাশে চিরুনীর মত। যেমন– পাটের বিছাপোকার স্ত্রী মথের শুঙ্গ। আবার শুঙ্গের উভয় পার্শ্ব দেখতে চিরুনীর মত হলে তাকে বাইপেকটিনেট (Bipectinate) শুঙ্গ বলে। যেমন– পাটের বিছাপোকার পুরুষ মথের শুঙ্গ।

**৬. ক্লাব্‌ড শুঙ্গ (Clubbed antenna)**

এ ধরনের শুঙ্গের খন্ডাংশগুলোর ব্যাস শেষ প্রান্তের দিকে বড় হয়ে থাকে। এ রকম শুঙ্গ আবার চার ধরনের, যেমন –

ক. ক্ল্যাভেট শুঙ্গ (Clavate antenna)

এ ক্ষেত্রে শুঙ্গের খন্ডাংশগুলোর ব্যাস ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। যেমন– লেডি বার্ড বিটলের শুঙ্গ।

খ. ক্যাপিটেট শুঙ্গ (Capitate antenna)

এ রকম শুঙ্গের শেষভাগের কয়েকটি খন্ডাংশের ব্যাস হঠাৎ বেড়ে যায়। যেমন– নিটিডিউলিডি (Nitidulidae) পরিবারের চেলে পোকার শুঙ্গ।

গ. ফ্ল্যাবেলেট শুঙ্গ (Flabellate antenna)

শুঙ্গের শেষ প্রান্তের কয়েকটি খন্ডাংশ জিহ্বার মত দেখায় এবং পরস্পর সমান্তরাল অবস্থায় থাকে। যেমন– স্যান্ডালিডি (Sandalidae) পরিবারের চেলে পোকার শুঙ্গ।

ঘ. ল্যামেলেট শুঙ্গ (Lamellate)

শুঙ্গের শেষ প্রান্তের খন্ডাংশগুলো পার্শ্ব থেকে পাতের মত বেড়ে যায়। যেমন– জুন বিটলের শুঙ্গ।

**৭. জেনিকিউলেট শুঙ্গ (Geniculate antenna)**

এ ধরনের শুঙ্গের প্রথম খন্ডাংশটি লম্বা থাকে। কিন্তু পরবর্তী খন্ডাংশগুলো খাটো থাকে এবং প্রথম খন্ডাংশের সাথে স্থূলকোণ সৃষ্টি করে অবস্থান করে। যেমন– মৌমাছি ও পিঁপড়ার শুঙ্গ।

**৮. প্লুমোজ শুঙ্গ (Plumose antenna)**

এ রকম শুঙ্গ অনেকটা পালকের মত দেখায়। শুঙ্গের প্রায় সবগুলো খন্ডাংশ হতেই লম্বা ও ঘন চুলের গোছা বের হলে তাকে প্লুমোজ শুঙ্গ বলে। যেমন– পুরুষ মশার শুঙ্গ। আবার চুলের গোছা ঘন না হয়ে পাতলা হলে তাকে পাইলোজ (Pilose) শুঙ্গ বলে। যেমন– স্পী মশার শুঙ্গ।

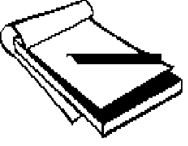
**৯. এ্যারিস্টেট শুঙ্গ (Aristate antenna)**

এ ধরনের শুঙ্গের শেষ খন্ডাংশ বেশ বড় হয় এবং সেই বড় খন্ডাংশের পিঠের দিকে একটা শুঁয়া (Arista) থাকে। যেমন– ঘরের মাছির (House fly) শুঙ্গ।

**১০. স্টাইলেট শুঙ্গ (Stylate antenna)**

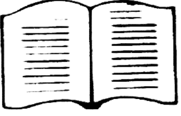
এ রকম শুঙ্গের শেষ প্রান্তে আঙ্গুলের মত একটা অতিরিক্ত অংশ বা স্টাইল (style) থাকে। যেমন– ডাকু মাছির (Horse fly) শুঙ্গ।





চিত্র ১.১৯ বিভিন্ন প্রকার শুঙ্গ

***অনুশীলন (Activity) ঃ** পোকার বিভিন্ন প্রকার পায়ের কাজ বর্ণনা করুন।*



**সারমর্ম ঃ** পাখাহীন ও পাখাধারী উভয় ধরনের পতঙ্গই দেখা যায়। পাখা সাধারণত হলটেয়ার, ইলাইট্রা, হেমিলাইট্রা, ট্যাগমিনা প্রভৃতি ধরনের হয়ে থাকে। তিন জোড়া পা থাকে বলে পোকাকে ষড়পদী বলা হয়। পোকার বিভিন্ন ধরনের পা থাকে। যেমন– শিকার ধরার উপযোগী, লাফ দেয়ার উপযোগী, গর্ত করার উপযোগী, সাঁতার কাটার উপযোগী, দৌড়ানোর উপযোগীও ফুলের রেণু বহনকারী হাটার উপযোগী পা। শুঙ্গ হলো পোকার একটি অনুভূতি নির্ণয়ক অঙ্গ। এর সাহায্যে পোকা বিপদজনক অবস্থা শনাক্ত ছাড়াও বিভিন্ন রকম কাজ করে থাকে। পোকার বিভিন্ন আকার আকৃতির শুঙ্গ থাকে, যেমন– সিটাসিয়াস, ফিলিফর্ম, মনিলিফর্ম, সিরেট, পেকটিনেট, ক্লাবড, জেনিকিউলেট, প্লুমোজ, এ্যারিস্টেট ও স্টাইলেট শুঙ্গ।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৫

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

ক. শিকার ধরার উপযোগী পা কোন্ পোকায় থাকে?

i) তেলাপোকা  ii) মৌমাছি
iii) ঘাস ফড়িং  iv) প্রেয়িং ম্যানটিড

খ. পাটের বিছা পোকার পুরুষ মথের শুঙ্গ কী ধরনের?

i) পেকটিনেট  ii) বাইপেকটিনেট
iii) প্লুমোজ  iv) পাইলোজ

**২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।**

ক. পোকার অগ্রবক্ষ থেকে এক জোড়া পাখা গজায়।
খ. মোলক্রিকেটের সামনের পা গর্ত করার উপযোগী।

**৩। শুন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. হলটেয়ার ধরনের পাখা উড়ার সময় পোকার দেহের -------- রক্ষা করে থাকে।
খ. হেমিলাইট্রা পাখার শক্ত অর্ধেক অংশের উপরের অর্ধেককে ----- বলা হয়।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. পোকার কয় জোড়া পা থাকে?
খ. মৌমাছির শুঙ্গ কী ধরনের?

# ব্যবহারিক

## পাঠ ১.৬ ঘাস ফড়িং অঙ্কন ও দেহের বিভিন্ন অংশের নাম লিখন

### এ পাঠ শেষে আপনি–

- ঘাস ফড়িং এর চিত্র অঙ্কন করতে পারবেন।
- ঘাস ফড়িং এর দেহের বিভিন্ন উপাঙ্গ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ঘাস ফড়িং এর বিভিন্ন উপাঙ্গের নাম লিখতে পারবেন।
- অর্থোপটেরা বর্গের অন্যন্য প্রজাতির পোকার উপাঙ্গ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- অর্থোপটেরা বর্গের কিছু বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।

### প্রাসঙ্গিক তথ্য

ঘাস ফড়িং অর্থোপটেরা বর্গের অন্তর্ভুক্ত মাঝারি আকৃতির পোকা। এদের দেহের রং সবুজ থেকে ধূসর এবং এরা উদ্ভিদভোজী। শুঙ্গ সূতাকৃতি, লম্বা বা খাটো। পুঞ্জাক্ষি বড় ও স্পষ্ট, ক্ষুদ্রাক্ষি ৩, ২ বা অনুপস্থিত। মুখোপাঙ্গ চর্বনোপযোগী। এদের অক্ষবক্ষ বড় ও ঢাল বিশিষ্ট। পিছনের পা দুটো বৃহদাকার, পেশীবহুল ও স্ফীতকার হওয়ায় সহজে লাফ দিতে পারে। সামনের পাখা জোড়া পুরু এবং দেখতে চামড়ার মতো যাকে ট্যাগমিনা বলা হয়। খাটো শুঙ্গ বিশিষ্ট ও লম্বা শুঙ্গ বিশিষ্ট দু'ধরনের ঘাস ফড়িং আছে। খাটো শুঙ্গ বিশিষ্ট ঘাস ফড়িং এর ডিম পাড়া অঙ্গ খাটো, শুঙ্গ দেহের চেয়ে খাটো এবং টারসি সাধারণত তিন খন্ডাংশযুক্ত। কিন্তু লম্বা শুঙ্গ বিশিষ্ট ঘাস ফড়িং এর ডিম পাড়া অঙ্গ লম্বা যা দেখতে তরবারির মতো, শুঙ্গ দেহের চেয়ে লম্বা এবং টারসি সাধারণত ৪ খন্ডাংশযুক্ত। অর্থোপটেরা বর্গের পোকাগুলোর শব্দ সৃষ্টি করার মতো অঙ্গ আছে।

### প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. ড্রইং পেপার
২. পেন্সিল
৩. পেন্সিল কাটার
৪. রাবার
৫. স্কেল

### কাজের ধাপ

১. ড্রইং পেপার ও পেন্সিল নিন।
২. ঘাস ফড়িং এর চিত্র দুটো ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করুন।
৩. এবার চিত্র দুটো অনুসরণ করে প্রাসঙ্গিক তথ্যের সাথে মিল রেখে ড্রইং পেপারে এদের চিত্র অঙ্কন করুন।
৪. অতঃপর অঙ্কিত চিত্রে ঘাস ফড়িং এর উপাঙ্গগুলো চিহ্নিত করুন।
৫. প্রয়োজনে রাবার, পেন্সিল কাটার ও স্কেল ব্যবহার করুন।

### সতর্কতা

চিত্র দুটো যাতে পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন।

চিত্র ১.২০ খাটো শুঙ্গ বিশিষ্ট ঘাস ফড়িং

চিত্র ১.২১ লম্বা শুঙ্গ বিশিষ্ট ঘাস ফড়িং

## পাঠ ১.৭ পোকার বিভিন্ন মুখাবয়ব পর্যবেক্ষণ ও অঙ্কন

### এ পাঠ শেষে আপনি–

- কীটপতঙ্গের বিভিন্ন প্রকার মুখোপাঙ্গের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- কীটপতঙ্গের বিভিন্ন ধরনের মুখোপাঙ্গের নাম বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার মুখোপাঙ্গে কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### প্রাসঙ্গিক তথ্য

কীটপতঙ্গের মুখে উপস্থিত উপাঙ্গ সমূহকে মুখোপাঙ্গ বলা হয়। যেমন– উপরের ওষ্ঠ, নিচের ওষ্ঠ, ম্যান্ডিবল, ম্যাক্সিলা, জিহ্বা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আলজিহ্বা থাকে। মুখের এ সমস্ত উপাঙ্গগুলো পোকার খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা দিয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের জন্য এদের মুখোপাঙ্গের ধরনও বিভিন্ন হয়ে থাকে। নিচে বিভিন্ন রকমের মুখোপাঙ্গের নাম উল্লেখ করা হলো–

১. চর্বনকারী মুখোপাঙ্গ (Chewing type mouthparts) যেমন– ঘাস ফড়িং ।
২. কর্তন ও শোষণকারী মুখোপাঙ্গ (Cutting and sponging type mouthparts) যেমন– ডাকু মাছি (Horse fly)
৩. শোষণকারী মুখোপাঙ্গ (Sponging type mouthparts) যেমন– ঘরের মাছি।
৪. চর্বন ও লেহণকারী মুখোপাঙ্গ (Chewing and lapping type mouthparts) যেমন– মৌমাছি।
৫. অনুবিদ্ধন ও চোষণকারী মুখোপাঙ্গ (Piercing and sucking type mouthparts) যেমন– মশা
৬. নলাকার মুখোপাঙ্গ (Siphoning type mouthparts) যেমন– প্রজাপতি।

উপরোক্ত বিভিন্ন ধরনের মুখোপাঙ্গের বিশদ বর্ণনা ও এদের চিত্র পাঠ ১.৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

### প্রয়োজনীয় উপকরণ

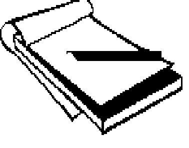
১. নিডল (Needle)
২. কাঁচি (Scissors)
৩. ব্রাশ 0-0 (Brush 0-0)
৪. আতশী কাঁচ (Magnifying glass)
৫. স্লাইড (Slide)
৬. অনুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope)
৭. পেন্সিল
৮. পেন্সিল কাটার
৯. রাবার
১০. ড্রইং পেপার ইত্যাদি।

### কাজের ধাপ

১. ঘাস ফড়িং, ডাকু মাছি, ঘরের মাছি, মৌমাছি, মশা ও প্রজাপতি সংগ্রহ করুন।
২. আপনার টিউটরের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় উপকরণ দ্বারা উল্লেখিত পোকাগুলোর মুখোপাঙ্গ সনাক্ত করুন।
৩. অতঃপর তা স্লাইডের উপর স্থাপন করে আতশী কাঁচ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পর্যবেক্ষণ করুন।
৪. এরপর পর্যবেক্ষনানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের মুখোপাঙ্গগুলো ড্রইং পেপারে অঙ্কন ও চিহ্নিত করুন।
৫. প্রয়োজনে পেন্সিল কাটার, রাবার ও স্কেল ব্যবহার করুন।

### সতর্কতা

১. সঠিক পন্থায় মুখোপাঙ্গগুলো সনাক্ত করুন।
২. মুখোপাঙ্গের চিত্রগুলো যাতে পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন।



## চূড়ান্ত মূল্যায়ন– ইউনিট ১

### সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। সংজ্ঞা দিন।

ক. শস্য সংরক্ষণ খ. আপদ

২। বিভিন্ন প্রকার আপদ দ্বারা শস্যের কী পরিমাণ ক্ষতি হয় তা আলোচনা করুন।

৩। কীটপতঙ্গের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিন।

৪। পাঁচটি উপকারী পোকার নাম লিখুন। কীটপতঙ্গের উপকারী প্রভাব আলোচনা করুন।

৫। একটি পোকার বাহ্যিক গঠন অঙ্কন করে তা চিহ্নিত করুন।

৬। পোকার বিভিন্ন প্রকার মাথার বর্ণনা দিন।

৭। পোকার মুখে কী কী উপাঙ্গ থাকে। ম্যাক্সিলা ও ম্যান্ডিবলের গঠন চিহ্নিত চিত্রসহ দেখান।

৮। পোকার শুঙ্গের চিহ্নিত চিত্র দিন।

৯। পোকার একটা স্বাভাবিক পায়ের চিহ্নিত চিত্র দিন।

১০। পোকার পাখার সাধারন শিরাবিন্যাস চিত্র সহকারে দেখান।

১১। চিত্র সহকারে ব্যাখ্যা করুন।

ক. চর্বনকারী মুখোপাঙ্গ খ. কর্তন ও শোষনকারী মুখোপাঙ্গ

গ. শোষণকারী মুখোপাঙ্গ ঘ. চর্বন ও লেহনকারী মুখোপাঙ্গ

ঙ. অনুবিদ্ধন ও চোষণকারী মুখোপাঙ্গ চ. সাইফনিং মুখোপাঙ্গ

১২। হলটেয়ার, ইলাইট্রা, হেমিলাইট্রা ও ট্যাগমিনা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১৩। পোকার বিভিন্ন প্রকার পা চিত্র সহকারে ব্যাখ্যা করুন।

১৪। শুঙ্গের কার্যাবলী লিখুন।

১৫। বিভিন্ন প্রকার শুঙ্গ চিত্র সহকারে ব্যাখ্যা করুন।



## উত্তরমালা– ইউনিট ১

### পাঠ ১.১

১। ক. iii  খ. ii
২। ক. মি  খ. স
৩। ক. প্লেগ  খ. ৮০ থেকে ১০০
৪। ক. ইঁদুর, শিয়াল  খ. ১০ থেকে ১৫ ভাগ

### পাঠ ১.২

১। ক. iv  খ. iii
২। ক. স  খ. মি
৩। ক. শিকড়  খ. লাক্ষা
৪। ক. জাবপোকা  খ. লেডি বার্ড বিটল

### পাঠ ১.৩

১। ক. iii  খ. iii
২। ক. স  খ. মি
৩। ক. টারগাইট  খ. টারসাস
৪। ক. তিন ভাগে  খ. পায়ের

### পাঠ ১.৪

১। ক. ii  খ. i
২। ক. মি  খ. স
৩। ক. অনুবিদ্ধন ও চোষণোপযোগী  খ. ম্যান্ডিবল, স্পষ্ট ম্যাক্সিলা
৪। ক. মুখের  খ. শোষণোপযোগী

### পাঠ ১.৫

১। ক. iv  খ. ii
২। ক. মি  খ. স
৩। ক. ভারসাম্য  খ. কোরিয়াম
৪। ক. তিন জোড়া  খ. জেনিকিউলেট

ইউনিট ২
পোকার শ্রেণিবিভাগ

# ইউনিট ২ পোকার শ্রেণিবিভাগ

পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ প্রাণীর প্রাজাতি শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে কীটপতঙ্গের প্রাজাতির সংখ্যাই সর্বাধিক। কারও মতে প্রাণীর মোট প্রজাতির শতকরা ৬০ ভাগ কীটপতঙ্গ দখল করে আছে। আবার কারও মতে প্রায় দশ লক্ষই হলো কীটপতঙ্গের প্রজাতি। এই বিপুল সংখ্যক প্রজাতির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে পুংখানুপুংখনু ভাবে জানা বা সম্যক জ্ঞান লাভ করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এই লক্ষ লক্ষ প্রজাতির কীটপতঙ্গের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে এদেরকে বিভিন্ন বর্গ, গোত্র ও গণে বিভক্ত করা হয়েছে। এতে কোনো একটি বর্গের সাধারণ বৈশিষ্ট্য জানা থাকলে ঐ বর্গের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রজাতি সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা পাওয়া যায় এবং সকল প্রজাতিকে সহজে শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

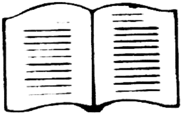
এই ইউনিট পাঠ করলে আপনি বর্গ পর্যন্ত পোকার শ্রেণিবিভাগ, কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বর্গের বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

## পাঠ ২.১ পোকার শ্রেণিবিভাগ (বর্গ পর্যন্ত )



**এ পাঠ শেষে আপনি–**

- বর্গ পর্যন্ত পোকার শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।
- শ্রেণিবিভাগ কি তা বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন উপশ্রেণী বা বিভাগে কয়টি বর্গ আছে তা জানতে পারবেন।
- কীটপতঙ্গের উপশ্রেণী ও বিভাগগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।



প্রায় সাড়ে বার লক্ষ প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ হলো কীটপতঙ্গের প্রজাতি। এই বহু সংখ্যক প্রজাতির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে ভালোভাবে জানা একজন মানুষের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। তাই এদের সম্বন্ধে সহজে জানার জন্য একটা বিজ্ঞানভিত্তিক সিস্টেম আছে। আর এই বিজ্ঞানভিত্তিক সিস্টেমটাই হলো শ্রেণিবিভাগ। কীটপতঙ্গের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে মিলের উপর ভিত্তি করে এদেরকে বিভিন্ন উপশ্রেণী , বিভাগ, বর্গ, উপবর্গ, গোত্র, গণ ইত্যাদিতে বিভক্ত করা হয়েছে। বর্গ হলো শ্রেণিবিভাগের মধ্যে একটি স্তর বা ধাপ।

বহু সংখ্যক প্রজাতির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে সহজে জানার জন্য একটা বিজ্ঞানভিত্তিক সিস্টেম আছে। আর এই বিজ্ঞানভিত্তিক সিস্টেমটাই হলো শ্রেণিবিভাগ।

পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে প্রথমে মেরুদন্ডী ও অমেরুদন্ডী এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কীটপতঙ্গ এই অমেরুদন্ডী ভাগে পড়ে। অমেরুদন্ডী প্রাণীকে আবার ৯টি পর্বে (Phylum) ভাগ করা হয়েছে যার মধ্যে সবচেয়ে বড় পর্ব হলো আরথ্রোপোডা (Arthropoda)। কীটপতঙ্গ এর অন্তর্ভুক্ত। আরথ্রোপোডা পর্বকে আবার ৮ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে যার মধ্যে সর্ববৃহৎ শ্রেণি হলো ইনসেক্টা (Insecta)| কীটপতঙ্গ এই ইনসেক্টা শ্রেণির আওতাধীন।

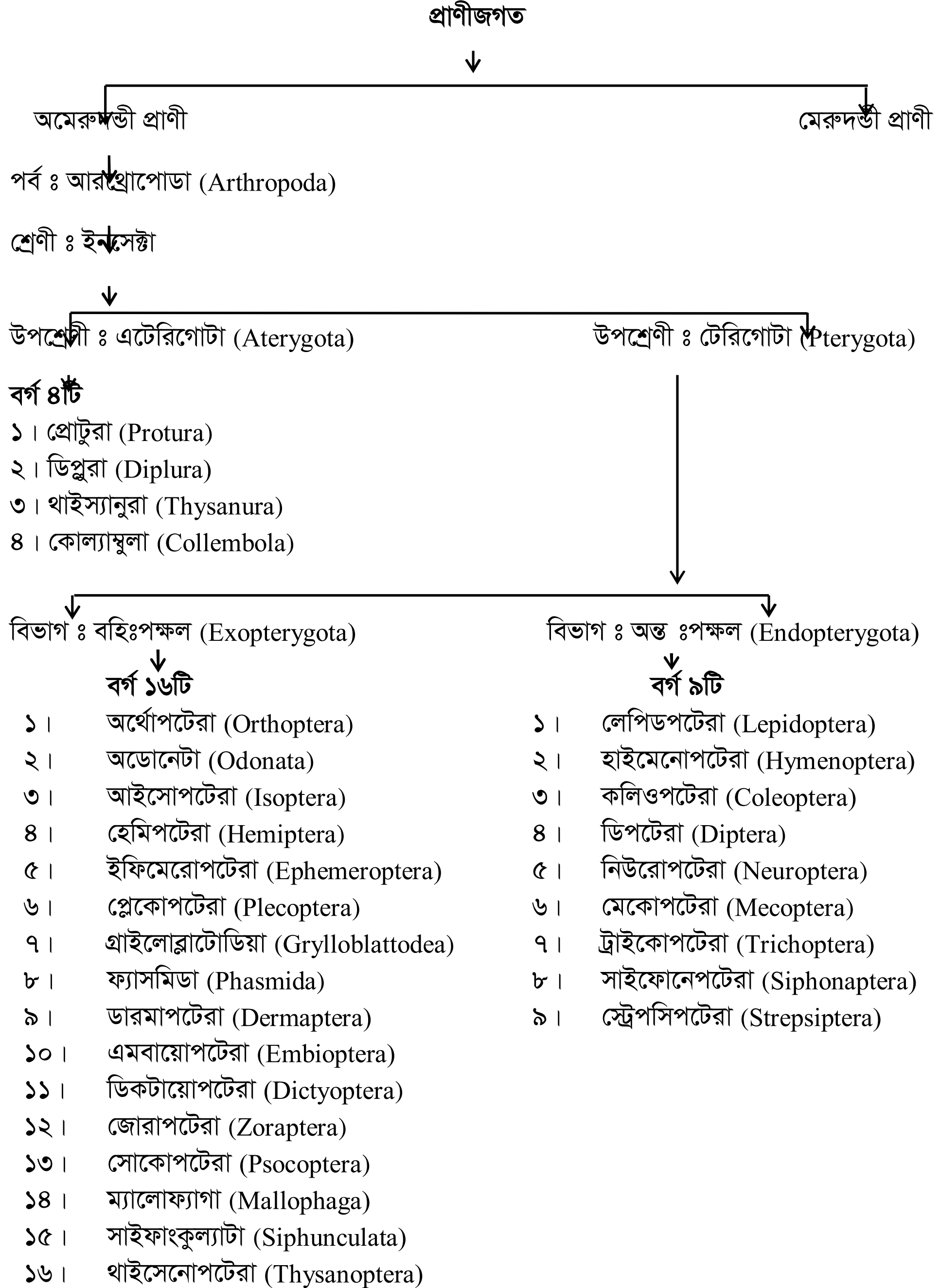
ইনসেক্টা শ্রেণীকে আবার দুটো উপশ্রেণী এটেরিগোটা (Apterygota) ও টেরিগোটা (Pterygota)- তে ভাগ করা হয়। নিম্নে এদের মধ্যে পার্থক্য করা হলো–

| | এটেরিগোটা | | টেরিগোটা |
|---|---|---|---|
| ১। | পাখাহীন | ১। | পাখাযুক্ত (ব্যতিক্রম পাখাহীন হতে পারে)। |
| ২। | ম্যান্ডিবল মাথার ক্যাপসুলের সাথে একটি মাত্র বিন্দুতে যুক্ত থাকে। | ২। | ম্যান্ডিবল মাথার ক্যাপসুলের সাথে দুটি বিন্দুতে যুক্ত থাকে। |
| ৩। | রূপান্তর সামান্য বা অনুপস্থিত। | ৩। | রূপান্তর সম্পর্ণ বা অসম্পর্ণ। |
| ৪। | এর অধীন ৪টি বর্গ আছে। | ৪। | এর অধীন ২৫টি বর্গ আছে। |

টেরিগোটা উপশ্রেণীকে দু'টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা– i) বহিঃপক্ষল (Exopterygota) ও ii) অন্তঃপক্ষল (Endopterygota)। এদের মধ্যের পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ

| | বহিঃপক্ষল | | অন্তঃপক্ষল |
|---|---|---|---|
| ১। | রূপান্তর অসম্পর্ণ অর্থাৎ ডিম-নিম্ফ-পূর্ণাঙ্গ অবস্থা। | ১। | রূপান্তর সম্পর্ণ অর্থাৎ ডিম-শুককীট-মুককীট-পূর্ণাঙ্গ অবস্থা। |
| ২। | পাখা প্যাড আকারে বাইরের দিক হতে বের হয়। | ২। | পাখা মুককীট অবস্থায় ভিতরের দিক হতে বের হয়। |
| ৩। | এর অধীন ১৬টি বর্গ আছে। | ৩। | এর অধীন ৯টি বর্গ আছে। |

## পোকার শ্রেণিবিভাগ (বর্গ পর্যন্ত )





**সারমর্ম ঃ** পৃথিবীতে প্রাণীজগতের মধ্যে কীটপতঙ্গের প্রজাতির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং এ সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে অমেরুদন্ডী প্রাণীসমূহকে ৯টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে যার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো আরথ্রোপোডা। এই আরথ্রোপোডা পর্বের ৮টি শ্রেণির মধ্যে ইনসেক্টা হলো সর্ববৃহৎ। ইনসেক্টা শ্রেণির মধ্যে মোট ২৯টি বর্গ আছে যেখানে ৪টি বর্গের পতঙ্গ পাখাহীন এবং ২৫টি বর্গের পোকা পাখাযুক্ত।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

ক. কীটপতঙ্গের শ্রেণীর নাম কোন্‌টি?

i) কাইলোপোডা  ii) ডিপ্লোপোডা
iii) অ্যারাকনিডা  iv) ইনসেক্টা

খ. টেরিগোটা উপশ্রেণীর কীটপতঙ্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?

i) পা আছে  ii) পা নেই
iii) পাখা আছে  iv) পাখা নেই

**২। সত্য হলে ‘‘স’’ এবং মিথ্যা হলে ‘‘মি’’ লিখুন।**

ক. কীটপতঙ্গ মেরুদন্ডী প্রাণী।
খ. আরথ্রোপোডা পর্বের মধ্যে ইনসেক্টা শ্রেণী সর্ববৃহৎ।

**৩। শুন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. ---------- উপশ্রেণীর পোকা পাখাহীন।

খ. অন্ত ঃপক্ষল পোকা রুপান্তর -----------।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. পোকার বহিঃপক্ষল বিভাগে কয়টি বর্গ আছে?
খ. অমেরুদন্ডী প্রাণীকে কয়টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে?

## পাঠ ২.২ অর্থোপটেরা ও অডোনেটা বর্গের বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- অর্থোপটেরা ও অডোনেটা বর্গের পোকার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- অর্থোপটেরা ও অডোনেটা বর্গের পোকার উদাহরণ দিতে পারবেন।
- অর্থোপটেরা ও অডোনেটা বর্গের পোকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



### বর্গ (Order) ঃ অর্থোপটেরা (Orthoptera)

অর্থোপটেরা শব্দটি দু'টি গ্রীক শব্দ 'Ortho' যার অর্থ 'Straight' (সোজা), এবং 'Ptera' যার অর্থ 'Wing' (পাখা) থেকে উদ্ভুত হয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে সমস্ত পোকার পাখা সোজা সেগুলোই এই অর্থোপটেরা বর্গের অন্তর্ভুক্ত। যেমন– খাটো শুঙ্গ বিশিষ্ট ঘাস ফড়িং, লম্বা শুঙ্গ বিশিষ্ট ঘাস ফড়িং, ক্রিকেট ইত্যাদি। এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত প্রায় ২৫ হাজার প্রজাতি শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ফসলের ক্ষতি করে এমন কতগুলো অর্থোপটেরা বর্গের পোকার নাম চিত্রসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো–



চিত্র ২.১ খাটো শুঙ্গ বিশিষ্ট ঘাস ফড়িং

চিত্র ২.২ লম্বা শুঙ্গ বিশিষ্ট ঘাস ফড়িং



চিত্র ২.৩ মোল ক্রিকেট

চিত্র ২.৪ ফিল্ড ক্রিকেট

### অর্থোপটেরা বর্গকে আবার দুটি উপবর্গে বিভক্ত করা যায়-

i) কেলিফেরা (Caelifera) (ii) এনসিফেরা (Ensifera)। নিম্নে এদের মধ্যের পার্থক্য তুলে ধরা হলো–

| | উপবর্গ ঃ এনসিফেরা | | উপবর্গ ঃ কেলিফেরা |
|---|---|---|---|
| i) | শুঙ্গ দেহের চেয়ে লম্বা এবং ৩০ খন্ডাংশের বেশি। | i) | শুঙ্গ দেহের চেয়ে খাটো এবং ৩০ খন্ডাংশের কম। |
| ii) | অভিপজিটর লম্বা যা দেখতে তরবারির মত। | ii) | অভিপজিটর খাটো। |
| iii) | টারসি সাধারণত ৪ খন্ডাংশযুক্ত<br>উদাহরণ ঃ লম্বা শুঙ্গ বিশিষ্ট ঘাস ফড়িং | iii) | টারসি সাধারণত ৩ খন্ডাংশযুক্ত<br>উদাহরণ ঃ খাটো শুঙ্গ বিশিষ্ট ঘাসফড়িং |

### অর্থোপটেরা বর্গের বৈশিষ্ট্য

১. বিস্তৃতি (Distribution) ঃ পৃথিবীর সর্বত্র।

২. আকার (Size) ঃ মাঝারি থেকে বড়।

৩. রং (Colour) ঃ বিভিন্ন ধরনের, যেমন- সবুজ, ধূসর, বাদামী, কালো ইত্যাদি।

৪. খাদ্যাভ্যাস (Food habit) ঃ উদ্ভিদভোজী (যেমন-ঘাস ফড়িং)। এছাড়াও কিছু পরভোজী (Predator) পোকা আছে, যেমন-ক্রিকেট।

৫. বাসস্থান (Habitat) ঃ অধিকাংশই স্থলভাগে বাস করে। এছাড়াও কিছু মাটির নিচে এবং কিছু মুক্তভাবে বসবাস করে।

৬. মাথা (Head) ঃ

i) শুঙ্গ ফিলিফর্ম (স তাকৃতি), লম্বা বা খাটো।

ii) পুঞ্জাক্ষি স্পষ্ট ও বড় এবং ক্ষুদ্রাক্ষি (Ocelli) ৩,২ বা অনুপস্থিত

iii) মুখোপাঙ্গ চর্বণোপযোগী।

৭. বঙ্গদেশ (Thorax) ঃ

বক্ষদেশের মধ্য ও পশ্চাৎভাগ একীভূত থাকে যাকে টেরো-থোরাক্স (Pterothorঀ) বলা হয়।

i) সন্মুখভাগ (Prothorax) বড়।

ii) প্রনোটাম ঘোড়ার পিঠে যে আসন বসানো হয় তার মত। প্রনোটাম হলো বক্ষদেশের সন্মুখভাগের আবরণ।

iii) বক্ষদেশের মধ্য ও পশ্চাৎভাগ একীভূত থাকে যাকে টেরোথোরাক্স (Pterothorঀ) বলা হয়।

iv) তিনজোড়া পা রূপান্তরিত থাকতে পারে।পিছনের পা দুটো বৃহদাকার, পেশীবহুল ও স্ফীতকার হওয়ায় লক্ষ দিতে পারে।

v) দু'জোড়া পাখা থাকে। সামনের জোড়া পুরু এবং চামড়ার মতো যাকে ট্যাগমিনা (Tegmina) বলে। পাখা খাটো থাকতে পারে।

৮. পেট (Abdomen) ঃ

i) পেট ১০ - ১১ খন্ডাংশযুক্ত।

ii) ডিম পাড়া অঙ্গ (Ovipositor) খাটো বা লম্বা।

৯. রূপান্তর (Metamorphosiঃ) ঃ অসম্পর্ণ অর্থাৎ ডিম্বনিম্ফ-পূর্ণবয়স্ক পোকা।

১০. এ বর্গের পোকাগুলোর শব্দ সৃষ্টি করার মত অঙ্গ আছে। যেমন - ঘাস ফড়িং, ক্রিকেট। সাধারণত ট্যাগমিনা এবং পায়ের ফিমার (Femur) এর কাটার মধ্যে ঘর্ষণের ফলে শব্দের সৃষ্টি হয়।

## অর্থনৈতিক গুরুত্ব

অর্থোপটেরা বর্গের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ পোকাই মাঠ ফসলের ক্ষতি করে থাকে। যেমন- পঙ্গপাল, ঘাসফড়িং, ফিল্ড ক্রিকেট ইত্যাদি। এছাড়া এ বর্গের কিছু কিছু প্রজাতির পোকা বিশ্বের কোনো কোনো দেশে মানুষের খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

## বর্গ ঃ অডোনেটা (Odonata)

'Odonata' বর্গকে 'Snake doctor's, 'Devils darning needle's, 'Snake feeder's, ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে।

ড্রাগনফ্লাই তাদের পাখাকে ভাঁজ করতে পারে না এবং এজন্য অবসর নেয়ার সময় তাদের পাখা দেহের দু'পার্শ্বে অনুভূমিকভাবে ছড়ানো থাকে।

'অডোনেটা' শব্দটি 'toothed' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। Toothed শব্দের অর্থ হলো দাঁতযুক্ত। এ পর্যন্ত প্রায় ৫,০০০ প্রজাতি এ বর্গের আওতায় অবিস্কৃত হয়েছে। যেমন- ড্রাগন ফ্লাই, ড্যামসেল ফ্লাই ইত্যাদি। এই ড্রাগন ফ্লাই ও ড্যামসেল ফ্লাই এর নিম্ফ পানিতে (Aquatic) বাস করে এবং পানির মধ্যে বসবাসকারী ক্ষুদ্র প্রাণী খেয়ে জীবনধারণ করে। এদের পূর্ণ বয়স্ক পোকা উড়ার সময় অন্য প্রজাতির পোকা শিকার করে খায়। ড্রাগনফ্লাই তাদের পাখাকে ভাঁজ করতে পারে না এবং এজন্য অবসর নেয়ার সময় তাদের পাখা দেহের দু'পার্শ্বে অনুভূমিকভাবে (Horizontally) ছড়ানো থাকে। কিন্তু ড্যামসেল

ফ্লাই অবসর নেয়ার সময় তাদের পাখাকে লম্বভাবে (Vertically) ভাঁজ করতে সক্ষম। নিম্নে ড্রাগনফ্লাই ও ড্যামসেল ফ্লাই এর চিত্র দেওয়া হলো ঃ



চিত্র ২.৫ ড্রাগন ফ্লাই

চিত্র ২.৬ ড্যামসেল ফ্লাই

অডোনেটা বর্গকে আবার দুটি উপবর্গে বিভক্ত করা হয়। যেমন– i) অ্যানআইসোপটেরা (Anisoptera) ii) জাইগোপটেরা (Zygoptera)। নিম্নে এদের মধ্যের পার্থক্য তুলে ধরা হলো–

| | অ্যানআইসোপটেরা | | জাইগোপটেরা |
|---|---|---|---|
| ১. | সামনের পাখার গোড়ার (base) চেয়ে পিছনের পাখার গোড়ার প্রশস্ততা বেশি। | ১. | সামনের ও পিছনের উভয় পাখাই আকৃতিতে একই রকম এবং উভয়ের গোড়াই সরু। |
| ২. | অবসর নেয়ার সময় পাখা অনুভূমিকভাবে (Horizontal]) দেহের দু'পার্শ্বে ছড়ানো থাকে। | ২. | অবসর নেয়ার সময় পাখা লম্বভাবে (vertically) দেহের উপরিবাগে একত্রে থাকে। |
| ৩. | মাথা সাধারণত লম্বা নয়, কম বা বেশি গোলাকার।<br>উদাহরণ ঃ ড্রাগন ফ্লাই | ৩. | মাথা আড়াআড়িভাবে লম্বা<br>উদাহরণ ঃ ড্যামসেল ফ্লাই। |

অডোনেটা বর্গের পোকা সাধারনত উপকারী পরভোজী পোকা।

**অডোনেটা বর্গের বৈশিষ্ট্য ঃ**

১. বিস্তৃতি ঃ পৃথিবীর সর্বত্র।

২. আকার ঃ মাঝারি থেকে বড়।

৩. রং ঃ উজ্জল রংয়ের হয়ে থাকে। সাধারণত কালো, নীল, হলুদ, লাল বা মেটালিক সবুজ রং এর হতে পারে।

৪. খাদ্যাভ্যাস ঃ সাধারণত পরভোজী পোকা অর্থাৎ অন্য পোকাকে ধরে খায়।

৫. বাসস্থান ঃ এদের উন্নয়নের জন্য আর্দ্র জায়গা প্রয়োজন। পূর্ণবয়স্ক পোকা প্রধাণত দিবাচর (Diurnal) অথবা সন্ধ্যাচর (Crepuscular)।

৬. মাথা ঃ
   - i) এদের চোখ বা পুঞ্জাক্ষি দুটি বড় এবং সুস্পষ্ট।
   - ii) মুখোপাঙ্গ চর্বণোপযোগী।
   - iii) শুঙ্গ খুব খাটো।
   - iv) পুর্ণ বয়স্ক পোকা তাদের মাথা বিভিন্ন দিকে ঘুরাতে সক্ষম।

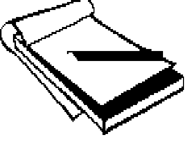
৭. বক্ষদেশ ঃ
   - i) সদৃশ বা বিসদৃশ আকৃতির দু'জোড়া পাখা আছে।
   - ii) পাখায় আড়াআড়ি জটিল শিরাবিণ্যাস (জালের মত) আছে এবং এতে স্টিগমা (Stigma) বিদ্যমান।

৮. রূপান্তর ঃ অসম্পর্ণ অর্থাৎ ডিম-নিম্ফ-পুর্ণবয়স্ক পোকা।

পরভোজী ড্রাগন ফ্লাই ও ড্যামসেল ফ্লাই ক্ষতিকর পোকা ধরে খায়।

**অর্থনৈতিক গুরুত্ব**

অডোনেটা বর্গের পোকা সাধারণত উপকারী পরভোজী পোকা। এরা ফসলের ক্ষতিকর অনেক কীটপতঙ্গ ধরে খায় এবং ফসলকে ক্ষতির হাত থেকে মুক্ত করে। পরভোজী ড্রাগন ফ্লাই ও ড্যামসেল ফ্লাই ক্ষতিকর পোকা যেমন– বাদামী গাছ ফড়িং, সবুজ পাতা ফড়িং, সাদা পিঠ গাছ ফড়িং, পাতা মোড়ানো পোকা, আঁকাবাঁকা পাতা ফড়িং ইত্যাদি ধরে খায়। এছাড়া এরা ফসলের পরাগায়নেও কিছুটা সাহায্য করে থাকে।



***অনুশীলন (Activity) ঃ*** *ঘাস ফড়িং ও ক্রিকেট জাতীয় পোকার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।*



**সারমর্ম ঃ** অর্থোপটেরা শব্দের অর্থ সোজা পাখা। এ বর্গের পোকার পিছনের পা দুটো লম্ফ দেয়ার উপযোগী। এদের সামনের পাথা জোড়া পুরু ও চামড়ার মতো যাকে ট্যাগমিনা বলা হয়। এদের শব্দ সৃষ্টি করার মতো অঙ্গ আছে এবং অধিকাংশই ফসলের ক্ষতি করে থাকে। অডোনেটা শব্দের অর্থ দাঁতযুক্ত। এ বর্গের পোকা পরভোজী। পুর্ণ বয়স্ক পোকা তাদের মাথা বিভিন্ন দিকে ঘুরাতে সক্ষম। এদের পাখায় আড়াআড়ি জটিল শিরাবিন্যাসের মাঝে স্টিগমা বিদ্যমান।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন  ২.২

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

ক. অর্থোপটেরা বর্গের পোকার সামনের পাখাকে কী বলা হয়?
- i) ট্যাগমিনা
- ii) ইলাইট্রা
- iii) হেমিলাইট্রা
- iv) হলটেয়ার।

খ. অর্থোপটেরা বর্গের পোকার রূপান্তর কী ধরনের?
- i) সম্পর্ণ
- ii) অসম্পর্ণ
- iii) উভয়ই
- iv) কোনটিই না

**২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।**

ক. 'Ortho` শব্দের অর্থ সোজা।

খ. অবসর নেয়ার সময় ড্যামসেল ফ্লাই এর পাখা অনুভূমিকভাবে ছড়ানো থাকে।

**৩। শুন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. অর্থোপটেরা বর্গের পোকার --------- সৃষ্টি করার মত অঙ্গ আছে।

খ. অডোনেটা বর্গের পোকা সাধারনত উপকারী ---------- পোকা।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. Crespuscular শব্দের অর্থ কী?

খ. প্রণোটাম কী?

## পাঠ ২.৩ লেপিডপটেরা ও আইসোপটেরা বর্গের বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক গুর€ত্বে



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- লেপিডপটেরা ও আইসোপটেরা বর্গের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- লেপিডপটেরা ও আইসোপটেরা বর্গের পোকার উদাহরণ দিতে পারবেন।
- লেপিডপটেরা ও আইসোপটেরা বর্গের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### বর্গ ঃ লেপিডপটেরা (Lepidoptera)



দুটি গ্রীক শব্দ 'Lepido' এবং 'Ptera' থেকে লেপিডপটেরা শব্দের উৎপত্তি। 'Lepido' শব্দের অর্থ হলো আঁশ (Scale) এবং 'Ptera' শব্দের অর্থ হলো পাখা (Wing)। বিভিন্ন ধরনের প্রজাপতি (Butterflies) এবং মথ (Moths) এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত। ঘরকে সাজানোর জন্য অনেকে সখ করে প্রজাপতি ও মথ সংগ্রহ করে থাকে। এ পর্যন্ত প্রায় ১,০৫,০০০ প্রজাতির মথ ও প্রজাপতি আবিস্কার করা সম্ভব হয়েছে। প্রজাপতি হলো দিবাচর (Diurnal) এবং মথ হলো নিশাচর (Nocturnal)।

### লেপিডপটেরা বর্গের বৈশিষ্ট্য

১. বিস্তৃতি ঃ পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গায় এদের দেখা যায়।

২. আকার ঃ অনেক ছোট হতে বেশ বড় হতে পারে।

৩. রং ঃ বিভিন্ন ধরনের উজ্জ্বল রং যা অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

৪. খাদ্যাভ্যাস ঃ তরল খাবার (ফুলের নেকটার) খায়।

৫. মাথা ঃ

   i) শুঙ্গ বেশিরভাগ ক্লাবড্ বা ক্ল্যাভেট টাইপ। তবে অন্য ধরনেরও হতে পারে।

   ii) পুঞ্জাক্ষি বড়। ক্ষুদ্রাক্ষি ২ বা অনুপস্থিত।

   iii) মুখোপাঙ্গ প্রোবোস্সিস (Proboscis) বা সাকটোরিয়াল (Suctorial) টাইপ। প্রোবোস্সিস মুখোপাঙ্গকে কুন্ডলী অবস্থায় এবং সাকটোরিয়াল মুখোপাঙ্গকে লম্বা নলাকার অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়।

৬. বক্ষদেশ ঃ

   i) দু' জোড়া পাখা আছে এবং এ পাখায় আড়াআড়ি শিরা সংখ্যায় খুব কম থাকে।

   ii) তিন জোড়া পা আছে।

৭. এই বর্গের পোকার শরীর, পাখা এবং অন্যান্য উপাঙ্গ আঁশ (Scale) দ্বারা আবৃত থাকে। আঁশগুলো বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। আঁশের আকার ও আকৃতি বিভিন্ন ধরনের হয় এবং সুগন্ধযুক্ত আঁশ থাকে যা যৌন মিলনের জন্য বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ করে।

> পোকার শরীরে, আঁশের আকার ও আকৃতি ও রঙ বিভিন্ন ধরনের হয় এবং সুগন্ধযুক্ত আঁশ থাকে যা যৌন মিলনের জন্য বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ করে।

৮. রূপান্তর ঃ সম্পূর্ণ অর্থাৎ ডিম-শুককীট-মূককীট-পূর্ণাঙ্গ অবস্থা।

৯. ডিম আকার, আকৃতি ও রঙের দিক থেকে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। ডিম এক জায়গায় শুধু একটি বা অনেকগুলো একত্রে পাড়ে।

১০. শুককীটকে ক্যাটারপিলার (Caterpillar) বলা হয় যা অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং এদের মুখোপাঙ্গ চর্বণোপযোগী। এই শুককীটে দু' ধরনের পা থাকে। i) বক্ষদেশে ৩ জোড়া পা ii) পেটের III থেকে VI নং খন্ডাংশে ৪ জোড়া ও শেষ খন্ডাংশে ১ জোড়া–মোট ৫ জোড়া উপ-পা (Prolegs) থাকে। এই উপ-পা গুলো মাংসল থাকে এবং এতে কোনো সন্ধি (Joint) থাকে না। এই উপ-পাগুলোর শীর্ষভাগে খুব ছোট হুক (Crochet) থাকে যা চলাচলে সহায়তা করে থাকে।

১১. মূককীট মুক্ত বা কোকুন দ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং কোকুন ঢিলা (পাটের বিছা পোকা) বা শক্ত (রেশম পোকা) হতে পারে।

**লেপিডপটেরা বর্গের তিনটি উপবর্গ আছে। যথা -**

| | | |
|---|---|---|
| i) জিউগ-পটেরা (Zeugloptera) | ঃ | পূর্ণ বয়স্ক পোকার কার্যকরী ম্যান্ডিবল থাকে; যেমন- মাইক্রপটেরিক্স। |
| ii) মনোট্রিসিয়া (Monotrysia) | ঃ | পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী পোকার পেটের ৩ঢ নং খন্ডাংশে একটি জনন রন্ধ্র থাকে। যেমন– সুইফট্ মথ। |
| iii) ডাইট্রিসিয়া (Ditrysia) | ঃ | পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী পোকার পেটের VIII এবং ৩ঢ নং খন্ডাংশে দুটি জনন রন্ধ্র আছে। যেমন–পাটের বিছাপোকার মথ। |

**নিম্নে কতগুলো প্রজাপতি ও মথের ছবি দেওয়া হলো–**



শুককীট মুককীট মথ

চিত্র ২.৭ পাটের বিছাপোকা



হলুদ মাজরা পোকা গোলাপী মাজরা পোকা ডোরাকাটা মাজরা পোকা

চিত্র ২.৮ ধানের মাজরা পোকা

### অর্থনৈতিক গুরুত্ব

এ বর্গের অধিকাংশ কীটপতঙ্গ অর্থাৎ শুককীট অবস্থা ফসল ও বনাঞ্চলের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে থাকে। কিন্তু প্রজাপতি ও মথ ফসলের পরাগায়নে সাহায্য করে। এছাড়া ঘরকে সাজানোর জন্য অনেকে প্রজাপতি ও মথ সংগ্রহ করে। কোনো কোনো সময় কিছু পতঙ্গ ফসলের রোগ জীবানু বিস্তারেও সাহায্য করে। রেশম পোকা (*Bombyx mori*) রেশম তৈরির মাধ্যমে অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহন করে।

> দুটি গ্রীক শব্দ 'Iso' এবং 'Ptera' থেকে 'আইসোপটেরা' শব্দের উৎপত্তি। 'Iso' শব্দের অর্থ সমান এবং 'Ptera' শব্দের অর্থ পাখা।

## বর্গ ঃ আইসোপটেরা (Isoptera)

দুটি গ্রীক শব্দ 'Iso' এবং 'Ptera' থেকে 'আইসোপটেরা' শব্দের উৎপত্তি। 'Iso' শব্দের অর্থ সমান এবং 'Ptera' শব্দের অর্থ পাখা। উঁইপোকা (White ant) এ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এ পর্যন্ত প্রায় ২,০০০ প্রজাপতির উঁইপোকার কথা জানা সম্ভব হয়েছে। এরা সামাজিক পোকা এবং কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী

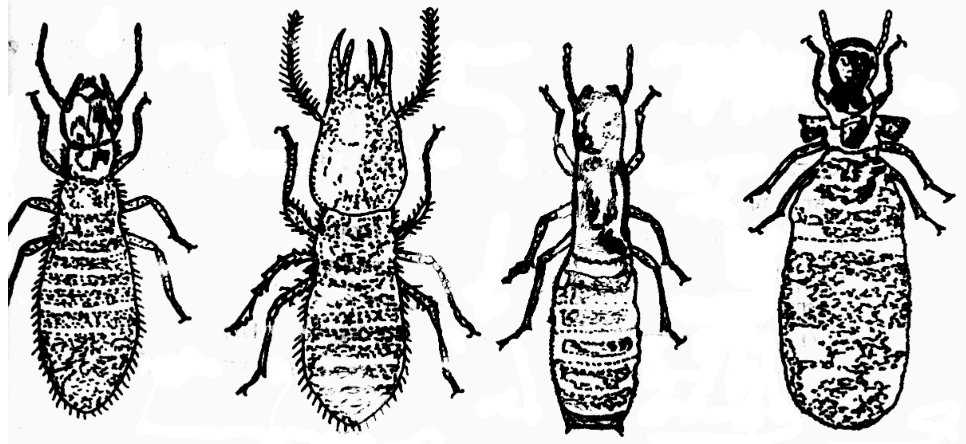
এদের মধ্যে রাজা, রানী শ্রমিক ও সৈনিক পোকা দেখা যায়। কিন্তু শ্রমিক ও সৈনিক উঁইপোকা প্রজননে অক্ষম অর্থাৎ বন্ধ্যা।

শ্রমিক উঁইপোকা ডিম ও নিম্ফের সেবাযত্ন থেকে শুরু করে রাণীর খাবার ব্যবস্থা করা, রাণীর কাছে উপস্থিত থাকা, খাদ্য সংগ্রহ করা, বাসা তৈরি করা, বাসা পরিস্কার করা ইত্যাদি কাজ করে থাকে। সৈনিক উঁইপোকা কলোনী রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এদের মাথা ও ম্যান্ডিবল আকারে বড় থাকে।

**বৈশিষ্ট্যঃ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | বিস্তৃতি | ঃ | পৃথিবীর বিভিন্ন উষ্ণ ও অবউষ্ণ এলাকা। |
| ২. | আকার | ঃ | ছোট হতে মাঝারি আকৃতির। |
| ৩. | রং | ঃ | সাদা হতে হালকা হলুদ। |
| ৪. | মাথা | ঃ | ছোট হতে বড় আকৃতির। |
| ৫. | শুঙ্গ | ঃ | ৯-৩০ খন্ডাংশ বিশিষ্ট এবং মনিলিফর্ম। |
| ৬. | মুখোপাঙ্গ | ঃ | চর্বনোপযোগী। |
| ৭. | দেহ | ঃ | নরম। |
| ৮. | চোখ | ঃ | অনুপস্থিত অথবা হ্রাসকৃত। |
| ৯. | পাখা | ঃ | দুই জোড়া, লম্বা ও সরু, ঝিলি-বৎ, আকারে প্রায় একই সমান। পাখাযুক্ত ও পাখাবিহীন উভয়ই কলোনীতে দেখা যায়। |
| ১০. | রূপান্তর | ঃ | অসম্পূর্ণ অর্থাৎ ডিম-নিম্ফ-পূর্ণাঙ্গ অবস্থা। |

**নিম্নে রাজা, রানী, শ্রমিক ও সৈনিক উঁইপোকার ছবি দেয়া হলো–**



শ্রমিক উঁইপোকা সৈনিক উঁইপোকা রাজা উঁইপোকা রাণী উঁইপোকা

চিত্র ২.৯ বিভিন্ন প্রকার উঁইপোকা

**অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঃ**

এ বর্গের অন্তর্ভুক্ত উঁইপোকা ফসল ও ঘরের কাঠের বা বাঁশের তৈরি আসবাবপত্রের মারাত্বক ক্ষতিসাধন করে থাকে। এছাড়া এরা বাঁশ ও কাঠ জাতীয় পদার্থ এবং মাটিকে ভেঙ্গে জৈব পদার্থে পরিণত করে।

***অনুশীলন (Activity)*** *ঃ আপনার এলাকায় কোন্ কোন্ প্রকারের উঁইপোকা দেখা যায়? এদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।*



**সারমর্ম ঃ** সব ধরনের প্রজাপতি ও মথ লেপিডপটেরা বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এ বর্গের পোকার শরীর, পাখা ও অন্যান্য উপাঙ্গ আঁশ দ্বারা আবৃত থাকে। এদের শুককীটকে ক্যাটারপিলার বলে। ক্যাটারপিলারে বক্ষদেশীয় ৩ জোড়া পা ছাড়াও পেটে ৫ জোড়া উপ পা থাকে। ক্যাটারপিলার ফসলের মারাত্বক ক্ষতি করে, কিন্তু প্রজাপতি ও মথ ফসলের পরাগায়নে সহায়তা করে থাকে। আইসোপটেরা বর্গের পোকা সামাজিক এবং এদের মধ্যে রাজা, রাণী, শ্রমিক ও সৈনিক পোকা দেখা যায়। রাজা, রাণী প্রজননে সক্ষম, কিন্তু শ্রমিক ও সৈনিক পোকা প্রজননে অক্ষম। এ বর্গের পোকা ফসল ও ঘরের আসবাব পত্রের ক্ষতি করে থাকে।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

ক. লেপিডপটেরা বর্গের পোকার শুককীটকে কী বলা হয়?

i) গ্রাব ii) ক্যাটারপিলার
iii) ম্যাগট iv) নায়াড

খ. আইসোপটেরা বর্গের পোকার শুঙ্গ কী ধরনের?

i) প্লুমোজ ii) পাইলোজ
iii) ফিলিফর্ম iv) মনিলিফর্ম

**২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।**

ক. প্রজাপতি হলো দিবাচর।
খ. শ্রমিক উঁইপোকা প্রজননে সক্ষম।

**৩। শুন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. লেপিডপটেরা বর্গের শুককীটকে ---------- বলা হয়।
খ. সৈনিক উঁইপোকা --------- রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. লেপিডপটেরা বর্গের পোকার শুককীটে কয় ধরনের পা থাকে?
খ. রেশম পোকার বৈজ্ঞানিক নাম কী?

## পাঠ ২.৪ হাইমেনোপটেরা ও হেমিপটেরা বর্গের বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব



**এ পাঠ শেষে আপনি–** চিত্র ২.১০ পরভোজী বোলতা

- হাইমেনোপটেরা ও হেমিপটেরা বর্গের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- হাইমেনোপটেরা ও হেমিপটেরা বর্গের পোকার উদাহরণ দিতে পারবেন।
- হাইমেনোপটেরা ও হেমিপটেরা বর্গের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

**বর্গ ঃ হাইমেনোপটেরা (Hymenopter**চিত্র ২.১১ পরজীবী বোলতা

'হাইমেনোপটেরা' শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ 'Hymeno' যার অর্থ 'membrane' (ঝিল্লী বা অতি পাতলা পর্দা) এবং 'Ptera' যার অর্থ 'wing' (পাখা) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের পিঁপড়া, বোলতা, মৌমাছি ইত্যাদি এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এ পর্যন্ত এই বর্গের আওতায় প্রায় ১,২০,০০০ প্রজাতির পোকা শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

**হাইমেনোপটেরা বর্গের কিছু পোকার নাম চিত্রসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো–**

চিত্র ২.১২ সরিষার স্লফ্লাই চিত্র ২. আলু বিনষ্টকারী কালো পিঁপড়া১৩ গোল



হাইমেনোপটেরা বর্গকে আবার দুটো উপবর্গে ভাগ করা যায়; যথা- i) সিম্ফাইটা (Symphyta) ও ii) এপোক্রিটা (Apocrita)। নিম্নে এই উপবর্গ দুটোর পার্থক্য আলোচনা করা হলো–

মৌমাছি মধু ও মোম উৎপাদনে এবং পরাগায়নে সাহায্য করে থাকে।

| | সিম্ফাইটা | | এপোক্রিটা |
|---|---|---|---|
| ১. | পেটের ১ম ও ২য় খন্ডাংশের মাঝখানে কোনো সুস্পষ্ট সংকুচিত স্থান (Constriction) নেই। | ১. | পেটের ১ম ও ২য় খন্ডাংশের মাঝখানে সুস্পষ্ট ও গভীর সংকুচিত স্থান আছে। |
| ২. | ডিম পাড়া অঙ্গ করাতের মত কাজের উপযোগী। | ২. | ডিম পাড়া অঙ্গ বিদ্ধ বা ফুটা করার উপযোগী। |
| ৩. | এদের শুককীটের বক্ষদেশ ছাড়াও পেটে পা থাকে। উদাহরণ ঃ সরিষার স্লফ্লাই | ৩. | এদের শুককীট পা বিহীন (apodous) উদাহরণ ঃ পিঁপড়া, মৌমাছি, বোলতা। |

**তিন ধরনের মৌমাছি বাংলাদেশে দেখা যায়–**

বড়, মাঝারী ও ছোট এই তিন প্রজাতির মৌমাছি বাংলাদেশে দেখা যায়।

১. *Apis dorsata* ঃ আকারে বড়, বণ্য এবং এদেরকে পালন করা যায় না।

২. *Apis cerana inফরপধ* ঃ মাঝারী আকারের এবং এদেরকে পালন করা যায়।

৩. *Apis florea* ঃ আকারে ছোট, সাধারণত পালন করা হয় না। খুলনা জেলায় এদের দেখা যায়।

**হাইমেনোপটেরা বর্গের বৈশিষ্ট্য**

১. বিস্তৃতি ঃ পৃথিবীর সর্বত্র (World wide)।

২. আকার ঃ ছোট হতে বড় ধরনের।

৩. রং ঃ বাদামী, লাল, কালো প্রভৃতি।

৪. বাসস্থান ঃ অধিকাংশ জায়গাতেই এদের দেখা যায়। এরা সাধারণত দিবাচর (Diurnal) হয়ে থাকে।

৫. খাদ্যাভ্যাস ঃ আলাদাভাবে শক্ত ও তরল খাদ্যাভ্যাসী প্রজাপতিসমূহ বিদ্যমান।

৬. মাথা ঃ

i) শুঙ্গ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন– ফিলিফর্ম, জেনিকিউলেট প্রভৃতি।

ii) পুঞ্জাক্ষি বড় এবং তাদের দেখার ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি (very acute vision)।

iii) মুখোপাঙ্গ চর্বন ও লেহনোপযোগী (Chewing-lapping type)।

৭. বক্ষদেশ ঃ

i) ঝিল্লিবৎ (Membranous) দু'জোড়া পাখা আছে। পিছনের পাখা দুটো সামনের পাখার তুলনায় ছোট থাকে এবং সামনের ও পিছনের পাখা দুটো পরস্পরের সহিত হ্যামুলি বা হুকলেট (Hamuli or Hooklet) দ্বারা যুক্ত থাকে। পাখায় খুব কম সংখ্যক শিরা বিদ্যমান থাকে।

ii) পুষ্পরেণু পরিবহণের জন্য পা পরিবর্ধিত।

মৌমাছির হুল হলো রূপান্তরিত অভিপজিটর যা প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৮. ডিম পাড়া অঙ্গ (Ovipositor) ঃ করাতের মত বা অনুবিদ্ধন বা ফুটা করার উপযোগী। মৌমাছির হুল হলো রূপান্তরিত অভিপজিটর যা প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৯. রূপান্তর (Metamorphosis) ঃ সম্পর্ণ অর্থাৎ ডিম-শুককীট-মূককীট-পূর্ণাঙ্গ অবস্থা।

১০. প্রজনন (Rrproduction) ঃ বিশেষ ধরনের প্রজনন এ বর্গের পোকায় দেখা যায়। যেমন– যৌন, পার্থেনোজেনেসিস, পলিএমব্রায়োনী।

**অর্থনৈতিক গুরুত্ব**

মৌমাছি মধু ও মোম উৎপাদনে এবং পরাগায়নে সাহায্য করে থাকে। কিছু কিছু পোকা আছে যারা শস্যের ক্ষতিসাধন করে থাকে। যেমন- সরিষার স্লফ্লাই, পিঁপড়ার *Dorylus sp.*। আবার কিছু পোকা

আছে যারা পরবাসী (Parasite) হিসেবে যেমন-পাটের বিছাপোকার পরবাসী হলো *Apanteles obliquae*, ধানের পাতা মোড়ানো পোকার পরবাসী হলো *Melcha sp.*, মূককীটের পরবাসী হলো *Brachymeria sp.* এবং শুককীটের পরভোজী হিসেবে *Vespa sp., Polistes sp.* ইত্যাদি কাজ করে জৈবিকভাবে ফসলের আপদ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

## বর্গ ঃ হেমিপটেরা (Hemiptera)

দুটি গ্রীক শব্দ 'Hemi' এবং 'Ptera' থেকে হেমিপটেরা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। 'Hemi' শব্দের অর্থ হলো অর্ধেক (Half) এবং 'ptera' শব্দের অর্থ হলো পাখা (Wing)। সমস্ত বাগ (Bug) বা গান্ধীপোকা এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এই বর্গের অধীন প্রায় ৫০,০০০ প্রজাতির পোকা শনাক্তকরণ হয়েছে।

চিত্র ২.১৫ ধানের গান্ধী পোকা

**বৈশিষ্ট্য**

চিত্র ২.১৪ ধানের বাদামী গাছ ফড়িং

১. বিস্তৃতি ঃ পৃথিবীর সর্বত্র।

২. আকার ঃ অনেক ছোট হতে অনেক বড় আকৃতির।

৩. রং ঃ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

৪. খাদ্যাভ্যাস ঃ তরল খাবার (রস) চুষে খায়।

৫. বাসস্থান ঃ স্থলে (Terrestrial) বা জলে (Aquatic) বাস করে।

৬. মাথা ঃ

i) শুঙ্গ ৪-১০টি খন্ডে বিভক্ত এবং অনেক ছোট (জাবপোকা) হতে বেশ বড় (তুলার লাল বাগ) হয়।

চিত্র ২.১৬ তুলার লাল গান্ধী পোকা

ii) চোখ বড়, ক্ষুদ্রাক্ষি (Ocelli) উপস্থিত বা অনুপস্থিত।

চিত্র ২.১৭ তুলার

iii) মুখোপাঙ্গ অনুবিদ্ধন ও চোষণোপযোগী (Piercing sucking type)। ম্যান্ডিবল এবং ম্যাক্সিলা রূপান্তরিত হয়ে সূচের আকৃতি বিশিষ্ট হয়।

৭. বক্ষদেশ ঃ

i) দু'জোড়া পাখা থাকে। আবার পাখা নাও থাকতে পারে যেমন- জাব পোকা। অধিকাংশ প্রজাতির সামনের পাখার গোড়ার দিকের অর্ধেক অংশ শক্ত ও পুরু এবং প্রান্তীয় অর্ধেক অংশ পাতলা ঝিল্লিবৎ (Membranous)। এ ধরনের পাখাকে হেমিলাইট্রা (Hemelytra) বলা হয়। কিন্তু পিছনের পাখার সমস্ত অংশই ঝিল্লিবৎ এবং সামনের পাখার তুলনায় ছোট। আবার কিছু প্রজাতির সামনের ও পিছনের পাখা একই ধরনের পাতলা ও ঝিল্লিবৎ।

> হেমিপটেরা বর্গের অধিকাংশ প্রজাতির সামনের পাখার গোড়ার দিকের অর্ধেক অংশ শক্ত ও পুরু এবং প্রান্তীয় অর্ধেক অংশ পাতলা ঝিল্লিবৎ । এ ধরনের পাখাকে হেমিলাইট্রা বলা হয়।

ii) তিন জোড়া পা থাকে। অনেক সময় পা রূপান্তরিত (Modified) হতে পারে।

৮. রূপান্তর ঃ অসম্পূর্ণ অর্থাৎ ডিম-নিম্ফ-পূর্ণাঙ্গ অবস্থা। হেমিপটেরা বর্গকে দুটো উপবর্গে বিভক্ত করা যায়। যেমন–হোমোপটেরা (Homoptera) এবং হেটেরোপটেরা (Heteroptera)। নিম্নে এই উপবর্গ দুটোর পার্থক্য তুলে ধরা হলো

> হেমিপটেরা বর্গের অধিকাংশ পোকা ফসলের ক্ষতি করে থাকে এবং কিছু পোকা আছে যারা উদ্ভিদের রোগ বিস্তারে সাহায্য করে থাকে।

| | হোমোপটেরা | | হেটেরোপটেরা |
|---|---|---|---|
| ১. | সামনের পাখা সুষমভাবে পুরু। | ১. | সামনের পাখা পরিবর্তিত হয়ে হেমিলাইট্রা হয়। |
| ২. | অবসর নেয়ার সময় পাখা দেহের দু'পার্শ্বে ঢালু আকারে থাকে। | ২. | অবসর নেয়ার সময় পাখা অনুভূমিকভাবে সমতলে অবস্থান করে। |
| ৩. | অনেক পোকা পাখা ও পা বিহীন হওয়ায় নিষ্ক্রিয় (sessile) যেমন-স্কেল পোকা, মিলি বাগ। | ৩. | অধিকাংশ পোকা সক্রিয়। যেমন-লাল বাগ, স্টিংক বাগ, পেন্টাটমিড বাগ। |

**নিম্নে হেমিপটেরা বর্গের কিছু পোকার নাম চিত্রসহ উল্লেখ করা হলো ঃ**

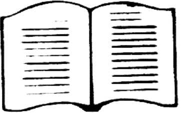


চিত্র ২.১৯ লেবুর সাইলিড বাগ

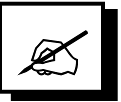
চিত্র ২.১৮ আমের পাতা শোষক পোকা

**অর্থনৈতিক গুরুত্ব**

হেমিপটেরা বর্গের অধিকাংশ পোকা ফসলের ক্ষতি করে থাকে। যেমন– তুলার লাল গান্ধী পোকা, ধানের গান্ধী পোকা। কিছু পোকা আছে যারা উদ্ভিদের রোগ বিস্তারে সাহায্য করে থাকে। যেমন– ভাইরাস রোগ বিস্তারে বাদামী পাতা ফড়িং (*Nephotettix virescens, N. apicalis, N. inapicticeps* এবং *Myzus persicae*) সহায়তা করে থাকে। এ ছাড়া কতগুলো বাগ (ছাঁরপোকা) পরভোজী হিসেবে কাজ করে থাকে। যেমন– জায়ান্ট ওয়াটার বাগ (*Belostoma sp.*)। লাক্ষা পোকা (*Laccifer lacca*) থেকে গালা (Shellac) উৎপাদন করা হয়।



**সারমর্ম ঃ** হাইমেনোপটেরা বর্গের পোকার পিছনের পাখা সামনের পাখার তুলনায় ছোট থাকে এবং পরস্পর হ্যামুলি বা হুকলেট দ্বারা যুক্ত থাকে। এদের দেখার ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি এবং অভিপজিটর প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহার করে থাকে। মৌমাছি মধু ও মোম উৎপাদন ছাড়াও পরাগায়নে সাহায্য করে। এ বর্গে অনেক পরবাসী ও পরভোজী পোকা আছে। হেমিপটেরা বর্গের পোকার সামনের পাখার গোড়ার অর্ধেক অংশ শক্ত ও পুরু এবং বাইরের অর্ধেক অংশ ঝিল্লিবৎ যাকে 'হেমিলাইট্রা' বলে। এ বর্গের অধিকাংশ পোকাই ফসলের ক্ষতি করে। তবে কিছু উপকারী পোকাও আছে।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৪

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

ক. কোন্ বর্গের স্পী পোকার অভিপজিটর প্রতিরক্ষা কাজে ব্যবহার করে?

i) লেপিডপটেরা ii) কলিওপটেরা

iii) হেমিপটেরা iv) হাইমেনোপটেরা

খ. হেমিপটেরা বর্গের পোকার সামনের পাখা জোড়াকে কী বলে?

i) ইলাইট্রা ii) হেমিলাইট্রা

iii) ট্যাগমিনা iv) হলটেয়ার

**২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।**

ক. এপোক্রিটা উপবর্গের পোকার শুককীট পা বিহীন।

খ. জাবপোকা হাইনোপটেরা বর্গের অন্তর্ভক্ত।

**৩। শুন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. মৌমাছির হুল হলো রূপান্তরিত ---------------।

খ. মিলিবাগ হলো ---------- পোকা।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. কোন্ প্রজাতির মৌমাছি বাংলাদেশে পালন করা হয়?

খ. লাক্ষা পোকার বৈজ্ঞানিক নাম কী?

## পাঠ ২.৫ কলিওপটেরা ও ডিপটেরা বর্গের বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব



**এ পাঠ শেষে আপনি–**

- কলিওপটেরা ও ডিপটেরা বর্গের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- কলিওপটেরা ও ডিপটেরা বর্গের পোকার উদাহরণ দিতে পারবেন।
- কলিওপটেরা ও ডিপটেরা বর্গের পোকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।



### বর্গ ঃ কলিওপটেরা (Coleoptera)

'কলিওপটেরা' শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ 'Coleo' যার অর্থ 'Sheath ' (আবরণ) এবং 'Ptera' যার অর্থ 'Wing' (পাখা) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সকল প্রকার বিটল (Beetles) ও উইভিল (Weevils) জাতীয় পোকা এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত। কীটপতঙ্গের বর্গগুলোর মধ্যে কলিওপটেরা সবচেয়ে বড় বর্গ। কীটপতঙ্গের ৪০% পোকা এই বর্গের অন্তর্গত। এ বর্গের আওতাধীন এ পর্যন্ত প্রায় ২,৭৫,০০০ প্রজাতির কথা জানা সম্ভব হয়েছে।

**এই বর্গের আওতাধীন কিছু পোকার নাম চিত্রসহ নিম্নে দেয়া হলো–**



চিত্র ২.২০ ধানের পামরী পোকা

চিত্র ২.২১ সবজির কাটালে পোকা

চিত্র ২.২২ পাটের চেলে (Apion) পোকা

চিত্র ২.২৩ নারিকেল গাছের গন্ডার পোকা

চিত্র ২.২৪ কলাগাছের কান্ডের উইভিল

চিত্র ২.২৫ ক্যারাবিড বিটল (পরভোজী পোকা)

কলিওপটেরা বর্গকে আবার কয়েকটি উপবর্গে ভাগ করা যায়। যেমন– i) আর্কোস্টোমেটা (Archostemata), এই উপবর্গের পোকার পাখার অগ্রভাগ (tip) কুন্ডলী আকারে পাকানো থাকে। ii) মিক্সোফেগা (Myxophaga), যার গুরুত্ব খুব কম iii) অ্যাডিফেগা (Adephaga) ও iv) পলিফেগা (Polyphaga) নিম্নে অ্যাডিফেগা ও পলিফেগার মধ্যে পার্থক্য করা হলো–

| | অ্যাডিফেগা | | পলিফেগা |
|---|---|---|---|
| ১. | পশ্চাৎ কক্সি (coxae) পেটের দৃশ্যমান প্রথম স্টারনাইটকে সমান দু'অংশে বিভক্ত করে। | ১. | পশ্চাৎ কক্সি পেটের দৃশ্যমান প্রথম স্টারনাইটকে সমান দু'অংশে বিভক্ত করে না। |
| ২. | এই উপবর্গের আওতায় পরিবারের সংখ্যা কম।<br>উদাহরণ ঃ টাইগার বিটল, গ্রাউন্ড বিটল ইত্যাদি। | ২. | এই উপবর্গের অধীন উপবর্গের সংখ্যা বেশি ।<br>উদাহরণ ঃ নারিকেলের গন্ডার পোকা, ধানের পামরী পোকা ইত্যাদি। |

**কলিওপটেরা বর্গের বৈশিষ্ট্যঃ**

১. বিস্তৃতি ঃ পৃথিবীর সর্বত্র

২. আকার ঃ ছোট থেকে বড় আকারের।

৩. আকৃতি ঃ খাটো ও শক্ত, লম্বা ও সরু, সিলিন্ড্রিক্যাল, চ্যাপ্টা ইত্যাদি।

৪. রং ঃ বিভিন্ন ধরনের যেমন– কালো, লাল প্রভৃতি।

৫. খাদ্যাভ্যাস ঃ উদ্ভিদভোজী, বীজভোজী, পরভোজী প্রভৃতি ধরনের হয়ে থাকে।

৬. বাসস্থান ঃ সকল জায়গায় এদের দেখা যায়।

৭. মাথা ঃ

i) প্রোগনেথাস (Prognathous) অর্থাৎ মাথা সামনের দিকে বাড়িয়ে নিতে পারে।

ii) হাইপোগনেথাস (Hypognathous) অর্থাৎ মাথা দেহের ভিতরের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

iii) উইভিলের ক্ষেত্রে মাথার সামনে একটি লম্বা অঙ্গ থাকে যাকে স্নাউট (Snout) বলা হয়।

iv) শুঙ্গ ১০-১৪ খন্ডাংশ বিশিষ্ট হয় এবং এক্ষেত্রে সেক্সুয়াল দ্বিরূপতা (Sexual dimorphism) দেখা যায়। অর্থাৎ পুরুষ পোকার শুঙ্গ স্ত্রী পোকার শুঙ্গের চেয়ে লম্বা থাকে।

উইভিলের ক্ষেত্রে মাথার সামনে একটি লম্বা অঙ্গ থাকে যাকে্লাউট (ঝহড়ঁঃ) বলা হয়।

v) চোখ বড় এবং ক্ষুদ্রাক্ষি (Ocelli) অনুপস্থিত।

vi) মুখোপাঙ্গ চর্বণোপযোগী।

৮. বক্ষদেশ ঃ

i) বক্ষদেশের অগ্রভাগ মুক্ত (Free)। কিন্তু মধ্য ও পশ্চাৎভাগ একীভূত থাকে যাকে টেরোথোরাক্স (Pterothorax) বলা হয়।

ii) তিন জোড়া পা রূপান্তরিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- হাঁটার উপযোগী, দৌড়ানোর উপযোগী, গর্ত করার উপযোগী, সাঁতার কাটার উপযোগী ইত্যাদি।

কলিওপটেরা বর্গের পোকার সামনের পাখা দুটো খুব শক্ত ও শিরাবিহীন এবং এরূপ শক্ত পাখাকে 'ইলাইট্রা' (Elytra) বলা

iii) দু' জোড়া পাখা থাকে। পাখা ছোট হতে পারে। সামনের পাখা দুটো খুব শক্ত ও শিরাবিহীন এবং এরূপ শক্ত পাখাকে 'ইলাইট্রা' (Elytra) বলা হয়। পিছনের পাখা দুটো পাতলা, শিরাবিশিষ্ট এবং এ দু'টো পাখাকেই এরা উড়ার কাজে ব্যবহার করে থাকে।

৯. পেট ঃ ১০-১১ খন্ডাংশযুক্ত। বিটলের পেটের শেষ খন্ডাংশকে 'পাইজিডিয়াম' (Pygidium) বলা হয়।

১০. রূপান্তর ঃ সম্পর্ণ অর্থাৎ ডিম-শুককীট-মূককীট-পূর্ণাঙ্গ অবস্থা।

কলিওপটেরা বর্গের পোকার শুককীটকে গ্রাব (Grub) বলা হয়।

১১. এই বর্গের পোকার শুককীটকে গ্রাব (Grub) বলা হয়।

**অর্থনৈতিক গুরুত্ব**

কলিওপটেরা বর্গের অধিকাংশ পোকাই নিরপেক্ষ (Neutral)। কিছু বিটল আছে যারা ফসলের পরাগায়নে সাহায্য করে এবং কিছু বিটল আছে যারা পরভোজী হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ধরে খায়। যেমন–টাইগার বিটল লেডিবার্ড বিটল, ইত্যাদি। কোনো কোনো পোকা মাঠ ফসল ও ফল গাছের ক্ষতি করে থাকে। যেমন–ধানের পামরী পোকা, নারিকেল গাছের গন্ডার পোকা প্রভৃতি। আবার কোনো কোনো পোকা গুদামজাত শস্য দানারও ক্ষতিসাধন করে থাকে। যেমন-ডালের বিটল। এছাড়া কোনো কোনো বিটল ফসলের রোগজীবাণু বিস্তারেও সাহায্য করে থাকে।

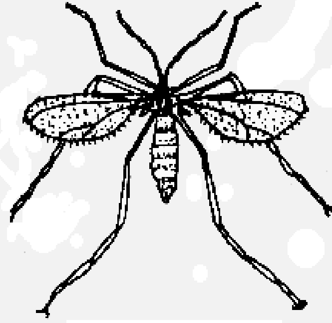
**বর্গ ঃ ডিপটেরা (Diptera)**

‘ডিপটেরা’ শব্দটি দু’টি গ্রীক শব্দ ‘উর’ যার অর্থ Two (দুই) এবং ÔPtera’ যার অর্থ Wing (পাখা) হতে এসেছে।

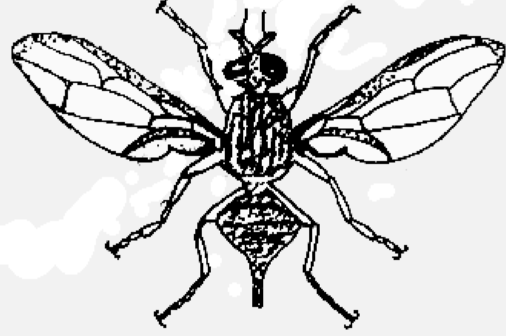


‘ডিপটেরা’ শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ ‘Di’ যার অর্থ Two (দুই) এবং ‘Ptera’ যার অর্থ Wing (পাখা) হতে এসেছে। অর্থাৎ যে সমস্ত পোকার শুধু এক জোড়া পাখা আছে তারাই এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। সকল প্রকার মশা ও মাছি এই বর্গের আওতাধীন। এ পর্যন্ত এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৭৫,০০০ প্রজাতির কথা জানা গেছে।

**নিম্নে কতগুলো মশা ও মাছির নাম চিত্রসহ দেয়া হলো ঃ**



চিত্র ২.২৬ ধানের গলমাছি



চিত্র ২.২৭ ফুলের মাছি



পুরুষ -

চিত্র ২.২৮ কুমড়া জাতীয় ফলের মাছি

চিত্র ২.২৯ আমের মাছি পোকা

চিত্র ২.৩০ ঘরের মাছি

চিত্র ২.৩১ এডিশ মশা

চিত্র ২.৩২ এনোফিলিস মশা

চিত্র ২.৩৩ কিউলেক্স মশা

**এই বর্গকে আবার তিনটি উপবর্গে ভাগ করা যায়। যেমন–**

i) নেমাটোছেরা (Nematocera) ii) ব্রাকাইছেরা (Brachycera) ও iii) সাইক্লোর‌্যাফা (Cyclorrhapha)। নিম্নে এই উপবর্গ তিনটির মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলো–

| | নেমাটোছেরা | | ব্রাকাইছেরা | | সাইক্লোর‌্যাফা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | শুঙ্গ লম্বা, অনেক খন্ডাংশ যুক্ত। | ১. | শুঙ্গ খাটো এবং শুঙ্গের শীর্ষে এরিস্টা (Arista) থাকে যা দেখতে সূতার মত। | ১. | শুঙ্গ ৩ খন্ডাংশযুক্ত এবং এরিস্টা শুঙ্গের গায়ে লাগানো থাকে। |
| ২. | শুককীটের মাথা সুউন্নত। | ২. | শুককীটের মাথা অর্ধউন্নত। | ২. | শুককীটের মাথায় ক্যাপসুল (Capsule) থাকে না। |
| ৩. | মূককীট মুক্ত। | ৩. | মূককীট মুক্ত। | ৩. | মূককীট পিউপেরিয়ামের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। |

**ডিপটেরা বর্গের বৈশিষ্ট্য**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | বিস্তৃতি | ঃ | পৃথিবীর সর্বত্র। |
| ২. | আকার | ঃ | ছোট হতে মাঝারী ধরনের । |
| ৩. | রং | ঃ | বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন– মেটালিক সবুজ, নীল, কালো ইত্যাদি। |
| ৪. | খাদ্যাভ্যাস | ঃ | তরল খাবার শোষণ করে বা চুষে খায়। |
| ৫. | বাসস্থান | ঃ | সকল জায়গায় এদের দেখা যায়। তবে গৃহে বেশি দেখা যায়। |

৬. মাথা ঃ

i) মাথা বড় এবং বিভিন্ন দিকে ঘুরাতে সক্ষম।

ii) শুঙ্গ বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন– স্টাইলেট, পাইলোজ, প্লুমোজ প্রভৃতি।

iii) পুঞ্জাক্ষি বড়।

iv) মুখোপাঙ্গ শোষণ কাজের উপযোগী (Sponging type) যেমন– ঘরের মাছি, কামড়ানোর পর শোষণোপযোগী (Cutting sponging type), যেমন– ঘোড়া মাছি এবং বিদ্ধ করে রস চোষণোপযোগী, যেমন– মশা।

৭. বক্ষদেশ ঃ

i) অগ্র ও পশ্চাৎবক্ষ ছোট এবং মধ্য বক্ষ বড় থাকে।

ii) সামনের পাখা সুউন্নত, কিন্তু পিছনের পাখা জোড়া ক্ষুদ্রাকৃতি ও রূপান্তরিত। এ দুটো পাখাকে 'হলটেয়ার' (Haltare) বলা হয়, যা মশা ও মাছি জাতীয় পোকার উড়ার সময় দেহের ভারসাম্য রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

> ডিপটেরা বর্গের পোকার সামনের পাখা সুউন্নত, কিন্তু পিছনের পাখা জোড়া ক্ষুদ্রাকৃতির ও রূপান্তরিত। এ দুটো পাখাকে 'হলটেয়ার' (Haltare) বলা হয়,

৮. রূপান্তর ঃ সম্পর্ণ অর্থাৎ ডিম-শুককীট-মূককীট-পূর্ণাঙ্গ অবস্থা।

৯. এই বর্গের পোকার শুককীটকে (Larva) 'ম্যাগট' (Maggot) বলা হয়। শুককীটের মাথার উন্নয়ন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, অর্থাৎ কোনোটির মাথা সুউন্নত, কোনোটির মাথা অর্ধউন্নত আবার কোনোটির মাথার উন্নয়ন হয় না।

১০. মূককীট (Pupa) মুক্ত বা পিউপেরিয়ামের (Puparium) মধ্যে আবদ্ধ থাকে।

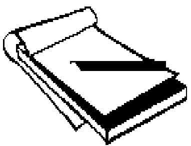
১১. এ বর্গের পোকার টার্সিতে এক জোড়া থাবা (Claws) বা এক জোড়া পালভিলি (Pulvili) বা এক জোড়া ইম্পোডিয়াম (Empodium) থাকে।

১২. এ বর্গের অন্তর্গত চিরোনমিডি (Chironomidae) পরিবারের পোকার (*Chironomus sp.*) রক্ত লাল। কারণ রক্তে হিমোগ্লোবিন থাকে এবং এদের লার্ভাকে রক্ত কৃমি (Blood worm) বলা হয়।

> ডিপটেরা বর্গের অন্ গর্ত চিরোন-মিডি (Chironomidae) পরি-বারের পোকার (*Chirono-mus sp.*) রক্ত লাল। কারণ রক্তে হিমোগ্লোবিন থাকে এবং এদের লার্ভাকে রক্ত কৃমি (Blood worm) বলা হয়।

## অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মানব চিকিৎসা ও পশুচিকিৎসা শাস্ত্রে এ বর্গের পোকার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। অনেক মশা ও মাছি আছে যারা উদ্ভিদ ও প্রাণীর রোগজীবাণু বিস্তারে সাহায্য করে থাকে। যেমন-স্পী অ্যানোফিলিস মশা, ঘোড়া মাছি, ঘরের মাছি ইত্যাদি। কিছু পোকা আছে যারা মাঠ ফসলের ক্ষতি করে থাকে। যেমন-ধানের গলমাছি, কুমড়া জাতীয় ফলের মাছি, আমের মাছি পোকা ইত্যাদি। আবার কিছু পোকা যেমন-ট্যাচিনিড মাছি কলিওপটেরা বর্গের পোকার প্যারাসাইট হিসেবে এবং হভার মাছি জাবপোকার পরভোজী হিসেবে কাজ করে জৈবিকভাবে ফসলের আপদ নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া ঘরের মাছি ও মশা খাবার নষ্ট করে এবং ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়।



***অনুশীলন (Activity)*** *ঃ ডিপটেরা বর্গের পোকা সমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। এই বর্গের বিভিন্ন উপবর্গের বৈশিষ্ট্য সমূহ লিখুন।*



**সারমর্ম ঃ** কলিওপটেরা হলো সবচেয়ে বড় বর্গ। সকল বিটল ও উইভিল জাতীয় পোকা এ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এ বর্গের পোকার সামনের পাখা দুটো খুব শক্ত ও শিরাবিহীন যাকে ইলাইট্রা বলা হয়। বিটলের পেটের শেষ খন্ডাংশকে 'পাইজিডিয়াম' বলে। এদের শুককীটকে গ্রাব বলে। সব মশা ও মাছি ডিপটেরা বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এদের সামনের পাখা সুউন্নত, কিন্তু পিছনের পাখা ক্ষুদ্রাকৃতি ও রূপান্তরিত যাকে 'হলটেয়ার' বলে। এদের শুককীটকে ম্যাগট বলা হয়। এ বর্গের পোকা রোগজীবানু বিস্তার ও ফসলের ক্ষতি করে। তবে কিছু কিছু পরবাসী ও পরভোজী রূপে কাজ করে।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৫

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

ক. ‘হলটেয়ার’ পাখা কোন্ বর্গের পোকায় থাকে?

i) অর্থোপটেরা ii) লেপিডপটেরা

iii) অডোনেটা iv) ডিপটেরা

খ. হভার মাছি কোন্ পোকার পরভোজী?

i) জাবপোকা ii) ছাতরা পোকা

iii) মিলিবাগ iv) মশা

**২। সত্য হলে ‘‘স’’ এবং মিথ্য হলে ‘‘মি’’ লিখুন।**

ক. প্রোগনেথাস অর্থ মাথা সামনের দিকে বাড়িয়ে নিতে পারে।

খ. কলিওপটেরা বর্গের পোকরা পাখা ইলাইট্রা ধরনের।

**৩। শুন্যস্থান পূরণ করুন।**

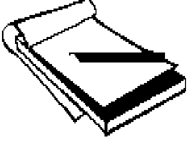
ক. উইভিলের ক্ষেত্রে মাথার সামনে একটা লম্বা অঙ্গ থাকে যাকে ------- বলা হয়।

খ. ডিপটেরা বর্গের শুককীটকে -------- বলে।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. কলিওপটেরা বর্গের পোকার শুককীটকে কী বলা হয়?

খ. চিরোনমিডি পরিবারের পোকার রক্তের রং কী এবং লার্ভাকে কী বলা হয়?



## চূড়ান্ত মূল্যায়ন– ইউনিট ২

**১। সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন।**

ক. শ্রেণিবিভাগ কী? বর্গ পর্যন্ত পোকার শ্রেণিবিভাগ করুন।

খ. নিম্নলিখিত বর্গগুলোর বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব লিখুন।

i) অর্থোপটেরা ও অডোনেটা
ii) লেপিডপটেরা ও আইসোপটেরা
iii) হাইমেনোপটেরা ও হেমিপটেরা
iv) কলিওপটেরা ও ডিপটেরা

**২। টীকা লিখুন।**

ক. ইনসেক্টা
খ. উপ পা
গ. শ্রমিক উঁইপোকা
ঘ. ট্যাগমিনা
ঙ. হেমিলাইট্রা
চ. ইলাইট্রা
ছ. পরবাসী
জ. পরভোজী

**৩। পার্থক্য করুন।**

ক. এটেরিগোটা ও টেরিগোটা
খ. বহিঃপক্ষল ও অন্তঃপক্ষল
গ. প্রজাপতি ও মথ
ঘ. বিটল ও উইভিল
ঙ. সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ রূপান্তর



# উত্তরমালা– ইউনিট ২

## পাঠ ২.১

১। ক. iv খ. iii
২। ক. মি খ. স
৩। ক. এটেরিগোটা খ. সম্পর্ণ
৪। ক. ১৬ টি খ. ৯ টি

## পাঠ ২.২

১। ক. i খ. ii
২। ক. স খ. মি
৩। ক. শব্দ খ. পরভোজী
৪। ক. সন্ধ্যাচার খ. বক্ষদেশের সম্মুখভাগের আবরণ।

## পাঠ ২.৩

১। ক. ii খ. iv
২। ক. স খ. মি
৩। ক. ক্যাটারপিলার খ. কলোনী
৪। ক. দু'ধরনের খ. *Bombyx mori*

## পাঠ ২.৪

১। ক. iv খ. ii
২। ক. স খ. মি
৩। ক. অভিপজিটর খ. নিষ্ক্রিয়
৪। ক. *Apis cerana indica* খ. *Laccifer lacca*

## পাঠ ২.৫

১। ক. iv খ. i
২। ক. স খ. মি
৩। ক. প্লাউট খ. ম্যাগট
৪। ক. গ্রাব খ. লাল, রক্ত কৃমি

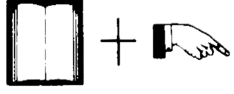
ইউনিট ৩
প্রধান ফসলের
ক্ষতিকর পোকার
বর্ণনা ও দমন

# ইউনিট ৩ প্রধান ফসলের ক্ষতিকর পোকার বর্ণনা ও দমন

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশে সারা বৎসরই কোনো না কোনো ফসলের আবাদ হয়ে থাকে। বাংলাদেশের জলবায়ু কীট-পতঙ্গের বেঁচে থাকা এবং তাদের বংশবৃদ্ধির পক্ষে খুবই অনুকূল। তাই দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রতিটি শস্য একাধিক প্রজাতির কীটপতঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ সব কীট-পতঙ্গের আক্রমণের ফলে ফসলের ব্যপক ক্ষতি সাধিত হয়। এক হিসাবে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে শতকরা ১০-১৫% শস্য পোকা দ্বারা নষ্ট হয়ে থাকে। কাজেই ফসলের কীটপতঙ্গ দমনের মাধ্যমে আমরা আমাদের শস্যের ফলন ১০-১৫% বৃদ্ধি করতে পারি।

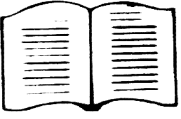
এ ইউনিটে ধান, পাট, ডাল ও তৈল বীজ ফসলের মূখ্য অনিষ্টকারী পোকা- মাকড়ের বর্ণনা, তাদের ক্ষতির ধরন এবং দমন সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

## পাঠ ৩.১ ধানের মাজরা, পামরী ও লেদা পোকার বর্ণনা ও দমন



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- ধানের মূখ্য অনিষ্টকারী পোকাসম হের আক্রমণের ফলে বোরো, আউশ এবং রোপা আমন মৌসুমে শতকরা কত ভাগ ফলন কম হয় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- মাজরা পোকার বর্ণনা ও ক্ষতির প্রকৃতি এবং দমন ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পামরী পোকার বর্ণনা, ক্ষতির প্রকৃতি ও দমন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ধানের লেদা পোকার বর্ণনা, ক্ষতির প্রকৃতি ও দমন সম্পর্কে ব্যখ্যা করতে পারবেন।



ভাত বাঙ্গালীদের প্রধান খাদ্য। এদেশের শতকরা প্রায় ৮৮ ভাগ জমিতে ধানের চাষ হয়ে থাকে। তবুও আমরা যে ধান উৎপন্ন করি তাতে আমাদের সারা বছরের খাদ্য সংকুলান হয় না। প্রতি বছর আমাদের খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ১০-১৫ লক্ষ টন। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ধান গাছের পক্ষে ক্ষতিকারক ১৭৫টি প্রজাতির পোকা শনাক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে ২০-৩০টি প্রজাতির পোকাকে মূখ্য আপদ (Major pest) হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ সব অনিষ্টকারী পোকা-মাকড়ের আক্রমণের ফলে আমাদের খাদ্য ঘাটতি আরও বেড়ে যাচ্ছে। এক হিসাবে দেখা গেছে যে, প্রধান অনিষ্টকারী পোকার আক্রমণের ফলে বোরো, আউশ এবং রোপা আমন মৌসুমে যথাক্রমে শতকরা ১৩, ২৪ এবং ২৮ ভাগ ফলন কম হয়। প্রধান প্রধান অনিষ্টকারী পোকা দমনের মাধ্যমে ধানের গড়পড়তা ফলন শতকরা ১৩% বৃদ্ধি করা যায় বলে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে।

### ধানের মাজরা পোকাসমূহ (Rice stem borers)

ধানের প্রধান অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ সমুহের মধ্যে মাজরা পোকা অন্যতম। এরা নিয়মিত ভাবে প্রতি ঋতুতে ধানের জমিতে আবির্ভূত হয় এবং ধানের চারা অবস্থা থেকে শুরু করে পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত ধান গাছে আক্রমণ করে থাকে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট সাতটি প্রজাতির মাজরা পোকা পাওয়া গিয়েছে (সারণি-১)। এ পোকার শূককীট ধান গাছের অভ্যন্তরে ঢুকে মধ্য কুশি খায়। তাই এ পোকাকে মাজরা পোকা বলে। পূর্ণাঙ্গ মাজরা পোকা হলো মথ এবং এ অবস্থায় এরা কোনো ক্ষতি করে না।

মাজরা পোকা ধানের চারা অবস্থা থেকে শুরু করে পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত ধান গাছে আক্রমণ করে থাকে।

সারণি ১ ঃ বাংলাদেশে প্রাপ্ত ধানের মাজরা পোকা সমূহ

| বাংলা ও ইংরেজি নাম | বৈজ্ঞানিক নাম | বর্গ |
|---|---|---|
| হলুদ মাজরা পোকা (Yelow stem borer) | *Scripophaga incertulas* (Walk.) | লেপিডোপ্টেরা (Lepidoptera) |
| সাদা মাজরা পোকা (White stem borer) | *Scripophaga innotata* (Walk.) | লেপিডোপ্টেরা |
| সোনালী মাজরা পোকা (Gold fringed borer) | *Chilo auricilia* Dudg. | লেপিডোপ্টেরা |
| কালো মাথা মাজরা পোকা (Dark headed stem borer) | *Chilo polychrysa* (Meyr.) | লেপিডোপ্টেরা |
| ডোরা কাটা মাজরা পোকা (Pale headed striped borer) | *Chilo suppressalis* (Walk.) | লেপিডোপ্টেরা |
| কান্ড মাজরা পোকা (Pink borer) | *Chilo partellus* (Swinh.) | লেপিডোপ্টেরা |
| গোলাপী মাজরা পোকা (Pink stem borer) | *Sesamia inferens* (Walk). | লেপিডোপ্টেরা |

হলুদ মাজরা, কালো মাথা মাজরা এবং গোলাপী মাজরা পোকা বাংলাদেশে ধান ফসলের জন্য বিশেষ ক্ষতিকারক।

বাংলাদেশে মাজরা পোকার বেশ কয়েকটি প্রজাতি পাওয়া গেলেও সবগুলোই ধান গাছের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক নয়। এদের মধ্যে হলুদ মাজরা, কালো মাথা মাজরা এবং গোলাপী মাজরা পোকা বাংলাদেশে ধান ফসলের জন্য বিশেষ ক্ষতিকারক। এরা শুককীট অবস্থায় ধান গাছের ক্ষতি করে।

## হলুদ মাজরা পোকা

### বর্ণনা ও জীবন চক্র

পূর্ণ বয়স্ক মথ দেখতে ছোট। স্ত্রী মথের সামনের পাখার রং কমলা-হলুদ বা খড়ের মত এবং সামনের পাখার প্রতিটিতে একটি করে কালো গোলাকার দাগ থাকে (চিত্র ৩.১)। পুরুষ মথ তামাটে হলুদ বর্ণের। স্ত্রী মথ পাতার উপরে গাদা করে ডিম পাড়ে। একটি স্ত্রী পোকা মোট ১০০-৩০০টি ডিম পাড়ে। ডিমের গাদা ফ্যাকাশে কমলা-বাদামী (Pale orange brown hair) রঙের অথবা হালকা ধূসর রংঙের আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। ডিম গুলো প্রথমে স্বচ্ছ থাকে এবং আস্তে আস্তে কালো হতে থাকে। সাধারণত ১৬$^{o}$C বা তার উপরের তাপমাত্রায় ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। ২৪-২৯$^{o}$C তাপমাত্রা সবচেয়ে অনুকূল। ৫-৮ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। কীড়াগুলো গাছের খোলের উপর ছিদ্র করে কান্ডের ভিতরে ঢুকে। কীড়া অবস্থায় এরা ৩-৬ সপ্তাহ কাটায়। এ সময়ে এরা ৬ বার খোলস বদলায়। কীড়া অবস্থা শেষে এরা ধান গাছের অভ্যন্তরে মূককীটে পরিণত হয়। মূককীট কাল ৯-১২ দিন স্থায়ী হয়। পূর্ণ বয়স্ক মথ ৪-১০ দিন বাঁচে।

কীড়াগুলো গাছের খোলের উপর ছিদ্র করে কান্ডের ভিতরে



চিত্র ৩.১ হলুদ মাজরা পোকা ঃ (ক) ডিম, (খ) শূককীট, (গ) মূককীট (ঘ) ও (ঙ) পূর্ণ বয়স্ক মথ Grist and Lever (১৯৬৯ থেকে নেয়া হয়েছে)।

শুকিয়ে যাওয়া ডিগপাতাকে মরা ডিগ (Deadheart) বলা হয়।

**ক্ষতির ধরন (Nature of damage)**

মাজরা পোকার কীড়াগুলো কান্ডের ভিতরে ঢুকে খেতে শুরু করে এবং ক্রমে গাছের ডিগপাতার গোড়া খেয়ে কেটে ফেলে। ফলে ধান গাছের ডিগপাতা শুকিয়ে যায়। এ শুকিয়ে যাওয়া ডিগপাতাকে মরা ডিগ (Deadheart) বলা হয়। থোড় আসার আগ পর্যন্ত গাছে এ ধরনের ক্ষতি দেখতে পাওয়া যায়। ধান গাছে থোড় আসার আগে মাজরা পোকার আক্রমণ হলে বাড়তি কিছু কুশি উৎপাদন করে গাছ আংশিকভাবে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে।

গাছে শীষ বের হবার পর মাজরা পোকা দ্বারা আক্রান্ত হলে সম্পর্ণ শীষটি শুকিয়ে সাদা হয়ে যায়। এটাকে সাদা শিষ বা মরা শিষ (White head) বলা হয়। শীষ আসার পর আক্রমণ হলে গাছ সে ক্ষতি পূরণ করতে পারে না।

মরাডিগ টান দিলে উঠে আসে এবং পোকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ কান্ডের ভিতরে কীড়ার মল উপস্থিত থাকে।

ধানের ক্রিসেক রোগ বা ইঁদুরের ক্ষতির নমুনার সাথে মাজরা পোকা দ্বারা সৃষ্ট মরা ডিগের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় এবং মরা ডিগ বলে ভুল হতে পারে। তবে তাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মরাডিগ টান দিলে উঠে আসে এবং পোকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ কান্ডের ভিতরে কীড়ার মল উপস্থিত থাকে। কোন কোনো সময় কীড়া পাতার খোলের ভিতরে খায় অথবা কান্ডের ভিতরে খেলেও মাঝ ডগা সম্পর্ণরূপে কেটে দেয় না। এ অবস্থায় ধান গাছের আংশিক ক্ষতি হয় এবং শীষের গোড়ার দিকের কিছু ধান চিটা হয়ে যায়।

মাজরা পোকা দ্বারা আক্রান্ত হলে গাছের কান্ডের ভিতরে কীড়া, তার খাওয়ার নিদর্শণ বা মল পাওয়া যায়, অথবা কান্ডের বাইরের রং বিবর্ণ হয়ে যায়, এবং কীড়া বের হওয়ার ছিদ্র থাকে।

**প্রতিকার (Control)**

১। ডিমের গাদা সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলতে হবে।

২। আলোক ফাঁদের সাহায্যে মাজরা পোকার মথ সংগ্রহ করে মেরে ফেললে এ পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩। মাজরা পোকা প্রতিরোধক ধানের জাত লাগিয়ে এ পোকা প্রতিরোধ করা যায়।

৪। এ ইউনিটের শেষে দেয়া কীটনাশক সমূহের তালিকা অনুযায়ী কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৫। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের পাখি, যেমন ফিঙ্গে ও শালিক পাখি ধানের মাজরা সহ অন্যান্য পোকা খায়। জমিতে ডাল-পালা পুঁতে এ সব পাখির বসবার সুযোগ করে দিয়ে এ সব পোকার সংখ্যা কমিয়ে আনা যায়।

৬। ধান কাটার পর নাড়া বা অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা নষ্ট করে ফেলতে হবে।

*  এ ইউনিটের শেষে দেয়া কীটনাশক সমূহের তালিকা অনুযায়ী কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

পূর্ণ বয়স্ক ও গ্রাব- এ দু’ অবস্থাতেই পামরী পোকা ধান গাছের ক্ষতি করে থাকে।

## পামরী পোকা

বাংলাদেশে পামরী পোকা ধানের একটি মারাত্মক ক্ষতিকারক পোকা হিসাবে বিবেচিত হয়। এ দেশে প্রথম এ পোকাকে ১৮০৫ সালে বরিশালে আমন ধান ক্ষেতে পাওয়া গিয়েছিল। পূর্ণ বয়স্ক ও গ্রাব- এ দু’ অবস্থাতেই এরা ধান গাছের ক্ষতি করে থাকে।

### বর্ণনা ও জীবনচক্র

পূর্ণ বয়স্ক পামরী পোকা দেখতে কালো এবং গায়ে ছোট ছোট কাটা আছে (ছবি ৩.২)। এরা দেখতে মাছির চেয়েও ছোট, লম্বায় ৫ মি.মি. হয়ে থাকে। স্পী পামরী পোকা পাতার নিচের দিকে ডিম পাড়ে। ১-৩ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে শূককীট বের হয়। শূককীটের রং সাদা, এবং আকৃতি চ্যাপ্টা। শূককীট ২.৪-৫.৫ মি.মি. লম্বা এবং ১.১ মি.মি. চওড়া হয়। শূককীট অবস্থায় ৯-১২ দিন থাকে। তার পর

মূককীটে পরিণত হয়। শূককীট হালকা বাদামী রংয়ের। মূককীট কাল ৩-৪ দিন স্থায়ী হয় এবং এরপর পূর্ণাঙ্গ পোকা বের হয়। পূর্ণ বয়স্ক পোকা ৯-২১ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে। বাংলাদেশ এ পোকা বছরে ছয়টি প্রজন্ম তৈরি করে।



প্রতি বিঘা জমিতে ১.৫ লিটার কেরোসিন ভেজানো পাটের রশি আক্রান্ত জমিতে টানলে পামরী পোকার আক্রমণ কমে যায়।

চিত্র ৩.২ ধানের পামরী পোকা (ক) শূককীট বা গ্রাব, (খ) মূককীট, (গ) পূর্ণ বয়স্ক বিটল, (ঘ) আক্রান্ত গাছ (অষধস, ১৯৬৯ থেকে নেয়া হয়েছে)।

পূর্ণ বয়স্ক পামরী পোকা পাতার সবুজ অংশ কুড়ে কুড়ে খায়। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পাতার উপর লম্বালম্বি কয়েকটি সমান্তরাল সাদা দাগ দেখা যায়।

**ক্ষতির ধরন**

পূর্ণ বয়স্ক পামরী পোকা পাতার সবুজ অংশ কুড়ে কুড়ে খায়। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পাতার উপর লম্বালম্বি কয়েকটি সমান্তরাল সাদা দাগ দেখা যায়। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জমির পাতাগুলিকে শুকিয়ে পুড়ে যাওয়ার মত মনে হয়। কীড়াগুলো পাতার দুই পর্দার মধ্যে সুড়ঙ্গ করে সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে যার ফলে সম্পূর্ণ পাতা সাদা হয়ে যায়। পোকায় আক্রান্ত গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। এসব গাছে কুশির সংখ্যা কম হয় এবং ফলন কমে যায়। গাছে কাইচথোড় আসার পর যদি ৩৫% পাতা আক্রান্ত হয় তাহলে অর্থনৈতিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা থাকে। এ পোকার আক্রমণের দরুণ শতকরা ২০-৬০ ভাগ ফলনের ক্ষতি হতে পারে।

বাংলাদেশের দক্ষিনাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে এ পোকার প্রার্দুভাব বেশি দেখা যায়। সাধারণত জলাবদ্ধ জমিতে পামরী পোকার আক্রমণ বেশি পরিলক্ষিত হয়।

আউশ, আমন ও বোরো এ তিন জাতীয় ধানেই এ পোকা আক্রমণ করে থাকে। তবে রোপা আমন ধানই এ পোকা দ্বারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পূর্ণ বয়স্ক পামরী পোকা অনেক দূর পর্যন্ত উড়তে পারে। তাই এরা এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় আক্রমণ করতে পারে।

### প্রতিকার

১। গাছে কুশি ছাড়ার শেষ সময় পর্যন্ত পাতার গোড়ার ২-৩ সে. মি. (প্রায় ১ ইঞ্চি) উপর থেকে ছেটে দিয়ে শতকরা ৭৫-৯২ টি পামরী পোকার কীড়া মেরে ফেলা যায় এবং পরবর্তী আক্রমণ রোধ করা যায়।

২। হাতজাল দিয়ে পোকা সংগ্রহ করে কেরোসিনে চুবিয়ে মেরে ফেলতে হবে।

৩। প্রতি বিঘা জমিতে ১.৫ লিটার কেরোসিন ভেজানো পাটের রশি আক্রান্ত জমিতে টানলে এ পোকার আক্রমণ কমে যায়।

* এ ইউনিটের শেষে দেয়া তালিকা (সারণি ৩) অনুযায়ী কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

## লেদা পোকা

স্পী মথ পাতার উপর গাদা করে ডিম পাড়ে। ডিমগুলো ধূসর বর্ণের শুয়া দ্বারা আবৃত

ধানের ক্ষতিকারক পোকা গুলোর মধ্যে লেদা পোকা অন্যতম। এরা কেটে কেটে খায় বলে ইংরেজিতে এদেরকে কাটওয়র্াম (Cutworm) বলে। ১৯৫২ সালে এটিকে ধানের ক্ষতিকারক পোকা হিসেবে শনাক্ত করা হয়। এ পোকা কীড়া অবস্থায় ধান গাছের ক্ষতি করে।

### বর্ণনা ও জীবন চক্র

এদের জীবনচক্রে ৪টি স্তর আছে– ডিম, শূককীট, মূককীট ও পূর্ণাঙ্গ পোকা। পূর্ণাঙ্গ মথ মাঝারি আকারের। সামনের পাখা ধূসর বা গাঢ় বাদামী। সামনের পাখায় একটি কালো ফোঁটা আছে। এ পাখায় শিরার কাছে ধূসর রঙের আঁকা-বাঁকা দাগ আছে ( চিত্র ৩.৩)। স্পী মথ পাতার উপর গাদা করে ২০০-৩০০টি ডিম পাড়ে। ডিমগুলো ধূসর বর্ণের শুয়া দ্বারা আবৃত থাকে। ডিম ফুটে বের হতে ৫-৯ দিন সময় লাগে। কীড়াগুলো প্রথমে সবুজ থাকে এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত কীড়াগুলো ৩৮ মি.মি. লম্বা এবং গাঢ় থেকে হালকা সবুজ রঙের হয় এবং শরীরে হালকা বাদামী অথবা লাল রঙের দাগ আছে। কীড়াকাল ৩-৪ সপ্তাহ স্থায়ী হয়। কীড়াকাল শেষে এরা মাটিতে প্রবেশ করে ও মূককীটে পরিণত হয়। মূককীট কাল ১০-১৪ দিন স্থায়ী হয়। মূককীটের রং গাঢ় বাদামী এবং দৈর্ঘে ১৩ মি. মি. হয় ।

কীড়াগুলো প্রথমাবস্থায় শুধু পাতা খেয়েই বড় হতে থাকে। পরে ডগা এমনকি গাছের গোড়া পর্যন্ত খেয়ে ফেলতে পারে।

### ক্ষতির ধরন

এ পোকা শুকনো ধানের জমিতে বেশি আক্রমণ করে। এদের জীবন চক্র সম্পন্ন করার জন্য শুক্নো জমির প্রয়োজন হয়। কীড়াগুলো প্রথমাবস্থায় শুধু পাতা খেয়েই বড় হতে থাকে। পরে ডগা এমনকি গাছের গোড়া পর্যন্ত খেয়ে



চিত্র ৩.৩ ধানের লেদা পোকা-(ক) ডিম, (খ) শূককীট, (গ) মূককীট, (ঘ) পূর্ণ বয়স্ক মথ, (ঙ) আক্রান্ত গাছ Grist & Lever ১৯৬৯ থেকে নেয়া হয়েছে)।

ফেলতে পারে। এরা বীজতলায় ধানের চারার গোড়া কেটে দেয়। কীড়াগুলো দিনের বেলায় মাটিতে বা আড়ালে লুকিয়ে থাকে। তাই সচরাচর এরা চোখে পড়ে না। একটি ক্ষেত ধ্বংস করার পর এরা দলে দলে অন্য জমিতে আক্রমণ করে। এভাবে এরা ক্ষেতের পর ক্ষেতে ধ্বংস করে ফেলে। এভাবে দলবেধে খাওয়ার কারণেই এদেরকে ইংরেজিতে Swarming caterpillar বলে। এদের আক্রমণে ক্ষেতের শতকরা ১০০ ভাগ ফসলই ধ্বংস হতে পারে।

বাংলাদেশের সব জেলাতেই এদের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত আউশ ধানেই এরা বেশি ক্ষতি করে।

আক্রান্ত ক্ষেতে একটু বেশি করে সেচ দিয়ে এবং পাখির খাওয়ার জন্য ক্ষেতের বিভিন্ন স্থানে ডালপালা পুতে দিয়ে লেদা পোকার সংখ্যা কমানো যায়।

**প্রতিকার**

১। ধান কাটার পর ক্ষেতের নাড়া পুড়িয়ে দিলে বা জমি চাষ করে ফেললে এ পোকার সংখ্যা অনেক কমানো যায়।

২। আক্রান্ত ক্ষেতে একটু বেশি করে সেচ দিয়ে এবং পাখির খাওয়ার জন্য ক্ষেতের বিভিন্ন স্থানে ডালপালা পুতে দিয়ে এ পোকার সংখ্যা কমানো যায়।

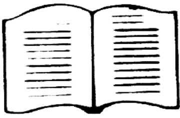
৩। মাঠের চারপাশ থেকে বন্য ঘাস ও আগাছা পরিস্কার করতে হবে।

৪। অধিক আক্রান্ত ক্ষেত থেকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফসল সংগ্রহ করে সেখানে এ পোকা দ্বারা কম আক্রান্ত হয় বা আক্রান্ত হয় না এমন জাতের ধান লাগাত হবে।

* সারণি ৩ অনুযায়ী কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।



***অনুশীলন (Activity)*** *: বাংলাদেশের ধানের মাজরা পোকার কয়টি প্রজাতি পাওয়া যায়? এদের নাম লিখুন। আপনার এলাকার মাজরা পোকার প্রাদুর্ভাব কেমন? মাজরা ও পামরী পোকার ক্ষতির নম না লিখুন।*



**সারমর্ম ঃ** ধানের অনিষ্টকারী হিসাবে এ পর্যন্ত প্রায় ১৭৫টি প্রজাতির পোকা শনাক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে ২০-৩০টি প্রজাতিকে প্রধান বা মূখ্য অনিষ্টকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মাজরা পোকার আক্রমণে ধানের মরা ডিগ ও সাদাশিষ-এ দু'ধরনের ক্ষতি হয়ে থাকে। পামরী পোকার আক্রমণে ধানের পাতাগুলো সাদা হয়ে যায় এবং শুকনো খড়ের মত দেখায়। ধানের লেদাপোকা ধানের পাতা ও ডগা খায় এবং গোড়া পর্যন্ত কেটে দিতে পারে। শুকনো জমিতে এ পোকার আক্রমণ বেশি হয়।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√ ) দিন।**

ক. কোন্ ধরনের জমিতে লেদা পোকা বেশি আক্রমণ করে?

i) জলাবদ্ধ জমি ii) আর্দ্র জমি
iii) শুকনো জমি iv) কোনোটাই নয়।

খ. বাংলাদেশের কোন্ অঞ্চলে পামরী পোকার আক্রমণ বেশি হয়?

i) পশ্চিমাঞ্চলে ii) দক্ষিণাঞ্চলে
iii) উত্তরাঞ্চলে iv) মধ্যাঞ্চলে

**২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।**

ক. লেদা পোকার আক্রমণে ধান গাছে সাদা শিষ সৃষ্টি হয়।
খ. পামরী পোকা শুক্নো ধানের জমিতে বেশি আক্রমণ করে।

**৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. ধানের অনিষ্টকারী হিসাবে বাংলাদেশে ............. টি প্রজাতির পোকাকে চিহি€ত করা হয়েছে।
খ. পামরী পোকার আক্রমণে শতকরা ............. ভাগ ফলন কম হতে পারে।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. ধানে থোড় আসার আগে মাজরা পোকা যে ক্ষতি করে তাকে কী বলে ?
খ. সাধারণত কোন্ ধরনের জমিতে পামরী পোকা বেশি আক্রমণ করে?

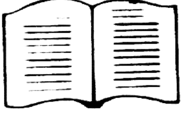
## পাঠ ৩.২ ধানের গলমাছি, পাতা মোড়ানো পোকা এবং গান্ধী পোকার বর্ণনা ও দমন।



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- ধানের গল মাছির বর্ণনা, ক্ষতির ধরন ও দমন সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।
- ধানের পাতা মোড়ানো পোকার বর্ণনা, ক্ষতির ধরন এবং দমন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ধানের গান্ধী পোকার বর্ণনা, ক্ষতির ধরন এবং দমন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

পূর্ববর্তী পাঠে আমরা ধানের তিনটি প্রধান অনিষ্টকারী পোকা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এ পাঠে আরও তিনটি পোকা, তাদের ক্ষতির প্রকৃতি এবং দমন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।



### ধানের গল বা নলি মাছি (Rice gall midge)

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Orseolia oryzae (*Wood-Mason)
বর্গ ঃ ডিপ্টেরা (Diptera)

ধানের গল মাছিকে বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে ''ডেপু পোকা'' নামেও অভিহিত করা হয়। গলমাছি বাংলাদেশে ধানের একটি প্রধান অনিষ্টকারী পতঙ্গ হিসাবে পরিগণিত। ১৯১৭ সালে এটিকে ধানের অনিষ্টকারী পোকা হিসাবে শনাক্ত করা হয়।

### বর্ণনা ও জীবনচক্র

ডিম ফুটে বের হবার পর শূককীট গুলো ধান গাছের মাঝের পাতার কান্ডের অভ্যন্তরে ঢুকে এবং মাঝের পাতার গোড়ায় গিয়ে খেতে

পূর্ণ বয়স্ক গল মাছি দেখতে অনেকটা মশার মত (চিত্র ৩.৪)। স্ত্রী পোকার পেট উজ্জ্বল লাল রঙের। পুরুষ পোকার রং মলিন বাদামী এবং আকারে সরু। এরা রাতের বেলা আলোতে আকৃষ্ট হয় কিন্তু দিনের বেলা বের হয় না। এ পোকার শূককীট ধানের ক্ষতি করে। স্ত্রী গল মাছি সাধারণত পাতার নীচের দিকে ১০০-১৫০ টি ডিম পড়ে। মাঝে মধ্যে এরা পাতার খোলের মধ্যেও ডিম পেড়ে থাকে। ডিম ফুটে কীড়া বের হতে ৩-৪ দিন লাগে। ডিম ফুটে বের হবার পর শূককীট গুলো ধান গাছের মাঝের পাতার কান্ডের অভ্যন্তরে ঢুকে এবং মাঝের পাতার গোড়ায় গিয়ে খেতে থাকে। এদের শূককীট অবস্থা ১৯-২৮ দিন স্থায়ী হয়। মূককীট ২-৮ দিনের মধ্যে পূর্ণ বয়স্ক পোকা হিসেবে বের হয়ে থাকে।



চিত্র ৩.৪ ধানের গল মাছি (ক) শূককীট, (খ) মূককীট, (গ) পূর্ণ বয়স্ক পোকা, (ঘ) আক্রান্ত গাছে গল মাছির শূককীট Grist & Lever, ১৯৬৯ থেকে নেয়া হয়েছে)।

ধানের গলমাছির আক্রমণের ফলে ধান গাছের মাঝের পাতাটির আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে পেঁয়াজ পাতার মত নলাকার হয়ে যায়। তাই এ পোকার ক্ষতির নমুনাকে পেঁয়াজ পাতা গল বা ওনিয়ন সুট বলা হয়ে থাকে।

**ক্ষতির ধরন**

এ পোকার আক্রমণের ফলে ধান গাছের মাঝের পাতাটির আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে পেঁয়াজ পাতার মত নলাকার হয়ে যায়। তাই এ পোকার ক্ষতির নমুনাকে পেঁয়াজ পাতা গল বা নল এবং ইংরেজিতে সিলভার সুট বা ওনিয়ন সুট বলা হয়ে থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় গলের রং উজ্জ্বল সাদা বলে একে Silver shoot বা রূপালী পাতা বলা হয়। সাধারণত বাড়ন্ত প্রাইমোর্ডিয়ামে খাদ্য গ্রহনের ফলে অথবা কোনো রাসায়নিক যৌগের নিঃসরণের ফলে কীড়ার চর্তুপার্শ্বস্থ পত্রখোল পরিবর্তিত হয়ে একটি ডিম্বাকৃতির প্রকোষ্ঠে Oval chamber পরিণত হয় যেটা শেষ পর্যন্ত একটা লম্বা নলাকৃতির পেঁয়াজ পাতার আকৃতি ধারণ করে। বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে কীড়া পৌঁছানোর ৩-৭ দিনের মধ্যে গল দৃশ্যমান হয়। গল বিভিন্ন আকারের হতে পারে। গল হলে সে গাছে আর শীষ বের হয় না। তবে গাছে কাইচ থোড় আসার পর গল মাছি গল সৃষ্টি করতে পারে না। এ পোকার আক্রমণ অত্যন্ত ব্যাপক হলে ধানের ফলন শতকরা ৫-৫০ ভাগ কমে যেতে পারে। এ পোকা সব মৌসুমেই ধানে আক্রমণ করে। তবে রোপা আমন ধানেই এরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে।

**প্রতিকার**

১। ধান ক্ষেত ও তার আশ-পাশ ঘাস জাতীয় আগাছা হতে মুক্ত রাখলে এ পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

২। ধান কাটার পর অবশিষ্টাংশ নষ্ট করে ফেললে এ পোকার আক্রমণ অনেকটা কমানো যায়।

৩। উপদ্রুত এলাকায় বর্ষাকালে ধান দেরিতে রোপণ করলে এই পোকার আক্রমণ অনেকটা এড়ানো যায়।

৪। শতকরা ১০ ভাগের বেশি কুশি এ পোকা দ্বারা আক্রান্ত হলে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

## ধানের পাতা মোড়ানো পোকা (Rice leaf roller)

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Cnaphalocrosis medinalis* G.
*Susumia exigua (Butler)*
বর্গঃ লেপিডোপ্টেরা

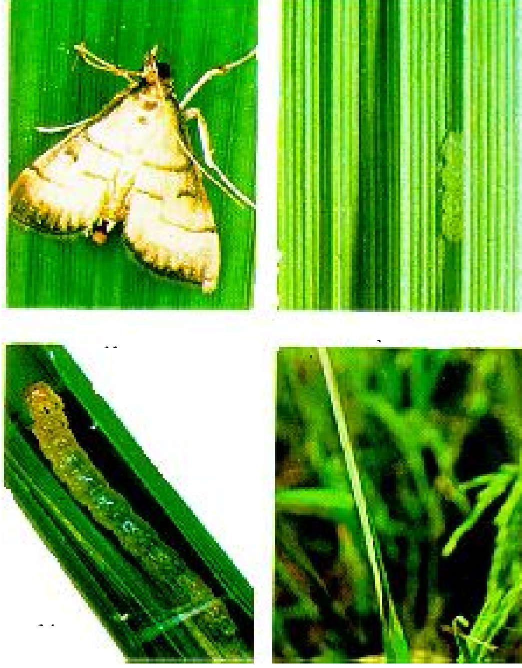
পাতা মোড়ানো পোকা ধান গাছের একটি প্রধান ক্ষতিকারক পোকা। এ পোকাটি ১৯১৭ সালে পূর্বভারতে ধানের গৌণ ক্ষতিকারক পোকা হিসাবে বিবেচিত হত। বর্তমানে বাংলাদেশে এ পোকার আক্রমণের তীব্রতা বেশ বেড়ে গেছে। বাংলাদেশে এ পোকার দু'টি প্রজাতি পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে *Cnaphalocrosis medinalis G. Susumia exigua B.* এ দু'টি প্রজাতির সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য মোটামুটিভাবে একই ধরনের। দ্বিতীয় প্রজাতিটি আমন মৌসুমে বেশি পাওয়া যায়। এ পোকা শূককীট অবস্থায় ধানের ক্ষতি করে।

সদ্য ফোটা কীড়াগুলো সূতার সাহায্যে বাতাসে ঝুলতে থাকে এবং বিভিন্ন গাছে চলে যায়।

**বর্ণনা ও জীবন চক্র**

এ পোকার জীবন চক্রে চারটি স্তর আছে– ডিম, শূককীট, মূককীট ও পূর্ণাঙ্গ মথ। পূর্ণ বয়স্ক মথের রং হলদে বাদামী। পাখায় ২-৪টি দাগ এবং পাখার নিচের অংশে গাঢ়-বাদামী দাগ থাকে (চিত্র ৩.৫)। পূর্ণাঙ্গ মথ বের হবার ১-২ দিনের মধ্যে ডিম পাড়তে পারে। স্ত্রী মথ পাতার মধ্য শিরার কাছে ডিম পাড়ে। একটি মথ ২০০-৩০০টি ডিম পাড়তে পারে। ৪-৬ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে শূককীট বের হয়। সদ্য ফোটা কীড়াগুলো সূতার সাহায্যে বাতাসে ঝুলতে থাকে এবং বিভিন্ন গাছে চলে যায়। সদ্য ফোটা কীড়ার রং স্বচ্ছ সাদা এবং মাথা হালকা বাদামী রঙের। পূর্ণতা প্রাপ্ত শূককীট হলদে সবুজ। শূককীট কাল ২১-৪২ দিন স্থায়ী হয়। এরা মোড়ানো পাতার ভিতরে মূককীটে পরিণত হয়। মূককীট হতে ৪-৯ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ মথ বের হয়ে আসে।





চিত্র ৩.৫ পাতা মোড়ানো পোকা (ক) পূর্ণ বয়স্ক মথ, (খ) ক্ষতিগ্রস্থ পাতা, (গ) শূককীট, (ঘ) মোড়ানো পাতা

**ক্ষতির ধরন**

এ পোকার কীড়াগুলো পাতার একেবারে মাথায় প্রথম দু'একদিন কুড়ে কুড়ে খায়। এরপর কীড়াগুলো ধানের পাতাকে লম্বালম্বিভাবে মুড়িয়ে পাতার ধারগুলোকে মুখের লালা দ্বারা আটকিয়ে পাতাকে নলাকৃতির করে ফেলে। এরা এ নলের  ভিতর অবস্থান করে পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। কীড়ার খাওয়ার ফলে পাতায় সাদা, লম্বা লম্বা এবং মধ্যশিরায় সমান্তরাল স্বচ্ছ (*Transparent*) দাগ পড়ে। সাধারণত দাগগুলো ১-২ মি. মি. প্রশস্ত এবং ১৫-৩০ মি. মি. লম্বা হয়। প্রতিটি পত্রফলকে এ রকম একাধিক দাগ পড়ে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে একটি গাছে একাধিক মোড়ানো পাতা থাকতে পারে। পাতা বিবর্ণ ও ভাঁজ হওয়ার ফলে পাতার শক্তি কমে যায় এবং সালোকসংশ্লেষণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। ক্ষতিগ্রস্ত পাতা ছত্রাক ও ব্যাকেটারিয়াজনিত রোগ বিস্তারের পক্ষে সহায়ক। মারাত্বক আক্রমণ হলে গাছ সম্পুর্ণ শুকিয়ে যেতে পারে। সাধারণত একটি পাতার মধ্যে একটি শূককীট থাকে তবে কোনো কোনো সময় ২/৩ টিও দেখা যায়। একটি পাতার দ্বারাই নল তৈরি করলেও কোনো কোনো সময় ২/৩ টি পাতাও এক সাথে ভাঁজ করতে পারে। মারাত্মক আক্রমণের সময় শতকরা ৬০ ভাগ কুশীর পাতা বিনষ্ট হতে পারে।

কীড়ার খাওয়ার ফলে পাতায় সাদা, লম্বা লম্বা এবং মধ্যশিরায় সমান্তরাল স্বচ্ছ দাগ পড়ে।

বাংলাদেশের সর্বত্র এ পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। যে সব অঞ্চলে রোদ বেশি হয় এবং বৃষ্টি কম হয় সে সব অঞ্চলে এ পোকার প্রাদুভার্ব বেশি হয়। বাংলাদেশে মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এদের দেখা যায়।

**প্রতিকার**

বাংলাদেশে মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এদের দেখা যায়। আলোর ফাঁদে আকৃষ্ট করে এ পোকার মথ ধ্বংস করতে হবে।

১। জমি এবং তার আশে পাশে যে সব ঘাস জাতীয় আগাছা আছে সেগুলো পরিস্কার রাখলে পোকার আক্রমণ কিছুটা কমানো যায়।

২। জমিতে ডালপালা পুঁতে পতঙ্গভূক পাখির বসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এতে এ পোকার সংখ্যা অনেক কমানো যায়।

৩। আলোর ফাঁদে আকৃষ্ট করে এ পোকার মথ ধ্বংস করতে হবে।

* সারণি ৩ এ দেয়া কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

## গান্ধী পোকা (Rice bug)

বৈজ্ঞানিক নাম t *Leptocorisa oratoria* (Fabricius)
*Leptocorisa acuta* (Thunberg)
বর্গ ঃ হেমিপ্টেরা(Hemiptera)

বাংলাদেশে গান্ধীপোকা ধানের একটি বিশেষ অনিষ্টকারী পোকা। বাংলাদেশে ১৯১৭ সালে এ পোকা সম্পর্কে জানা যায়। এ পোকার দু'টি প্রজাতি বাংলাদেশে পাওয়া যায়।

### বর্ণনা ও জীবনচক্র

গান্ধী পোকার জীবনচক্রে তিনটি স্তর আছে যথা, ডিম, নিম্ফ এবং পূর্ণ বয়স্ক পোকা।

এ পোকার জীবনচক্রে তিনটি স্তর আছে যথা, ডিম, নিম্ফ এবং পূর্ণ বয়স্ক পোকা। পূর্ণাঙ্গ গান্ধীপোকা লম্বা ও চ্যাপ্টা (চিত্র ৩.৬)। রং হালকা সবুজ। লম্বায় ১৪-১৭ মি. মি. এবং প্রস্থে ৩-৪ মি. মি. হয়। স্ত্রী পোকা পাতার উপর সারিবদ্ধভাবে ডিম পাড়ে। প্রতি সারিতে ১০-৩০টি ডিম থাকে। একটি স্ত্রী পোকা ২০০-৩০০টি ডিম পাড়ে। ৫-৮ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে নিম্ফ বের হয়। ১৫-৩০ দিনের মধ্যে নিম্ফগুলো পূর্ণাঙ্গ পোকায় পরিণত হয় এবং পাখা গজায়। নিম্ফ অবস্থায় এরা ৫ বার খোলস বদলায়। কোনো কোনো সময় এরা ২৪ দিনে জীবন চক্র সম্পন্ন করতে পারে। পূর্ণ বয়স্ক পোকা ৪৮-১২০ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে। শীতকালে এরা ঘাসে জীবন কাটায়।



চিত্র ৩.৬ ধানের গান্ধী পোকা

### ক্ষতির ধরন

গান্ধী পোকা দুধ ধানের দানার ভিতরে মুখের সূচালো অংশ ঢুকিয়ে দিয়ে রস শোষন করে খায়। ফলে ধান চিটা হয়ে

এ পোকা ধানের দানায় আক্রমণ করে। নিম্ফ ও পূর্ণ বয়স্ক এ দু' অবস্থাতেই এরা ধানের ক্ষতি করে। ধানে যখন দানা গঠন শুরু হয় অর্থাৎ ধানের যখন দুধ সৃষ্টি হয় তখন এ পোকার আক্রমণ শুরু হয়। এরা ধানের দানার ভিতরে মুখের সূচালো অংশ ঢুকিয়ে দিয়ে রস শোষন করে খায়। ফলে ধান চিটা হয়ে যায়। আংশিক আক্রমণে চাউলের উপর দাগ হয়। গান্ধীপোকা যে জায়গা দিয়ে আক্রমণ করে সে ক্ষতের চার পাশে বাদামী দাগ হয়। আক্রমণ তীব্র হলে শতকরা ৪৯ ভাগ ফলন কম হয়। যে সব অঞ্চলে সারা বছর ধান চাষ হয় সে সব অঞ্চলে এ পোকার আক্রমণ বেশি হয়। আউশ ও আগাম আমন ফসলে এ পোকার আক্রমণ অধিক হয়ে থাকে।

### প্রতিকার

১। ধান ক্ষেত ও তার আশপাশ আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। এতে এ পোকার আক্রমণ কম হবে।

২। ধানে থোড় আসার পর যদি প্রতি বর্গ মিটারে ৩-৫টি গান্ধী পোকা দেখা যায় তাহলে ৩ নং সারণি অনুযায়ী কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।



***অনুশীলন (Activity)ঃ*** *বাংলাদেশে ধানের পাতা মোড়ানো পোকার কয়টি প্রজাতি পাওয়া যায়? ধানের গল মাছি ও গান্ধী পোকার মধ্যে আপনার এলাকায় কোন্‌টির প্রাদুর্ভাব বেশি? পাতা মোড়ানো পোকা এবং গান্ধী পোকার ক্ষতির নমূনা বর্ণনা করুন।*



**সারমর্ম ঃ** ধানের গল মাছির আক্রমনে ধানের পাতা পেঁয়াজ পাতার মত নলাকার হয়ে যায়। তাই এ পোকার ক্ষতির নমুনাকে পেঁয়াজ পাতা নল বলে। গাছে কাইচ থোড় আসার পর গল মাছি  গল সৃষ্টি করতে পারে না। গল মাছির আক্রমণে ফলন ৫-৫০ ভগ কম হতে পারে। ধানের পাতা মোড়ানো পোকার কীড়া ধানের পাতাকে লম্বালম্বি ভাবে মুড়িয়ে তার ভিতরে অবস্থান করে। এরা পাতার সবুজ অংশ খায়। এদের আক্রমণে শতকরা ৬০ ভাগ পাতা নষ্ট হতে পারে। ধানের গান্ধী পোকা ধানের দুধ অবস্থায় আক্রমণ করে রস শুষে খায়। এ পোকার আক্রমণে শতকরা ৪৯ ভাগ ফলন কম হতে পারে।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

ক. ধানের গলমাছি কোন্ বর্গের অন্তর্গত?

i) অর্থোপ্টেরা ii) ডিপ্টেরা
iii) লেপিডোপ্টেরা iv) কলিওপ্টেরা

খ. গান্ধী পোকার আক্রমনে কত ভাগ ফলন কম হয়?

i) ২০ ভাগ ii) ৩১ ভাগ
iii) ৪৯ ভাগ iv) ৫১ ভাগ

**২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।**

ক. পূর্ণ বয়স্ক গল মাছি আলোতে আকৃষ্ট হয়।
খ. বাংলাদেশে ধানের পাতা মোড়ানো পোকার ১টি প্রজাতি পাওয়া যায়।

**৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. ............. পোকার কীড়া ধানের পাতাকে মুড়িয়ে নলাকৃতির করে ফেলে।
খ. ধানে যখন ........ সৃষ্টি হয় তখন গান্ধী পোকার আক্রমণ শুরু হয়।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

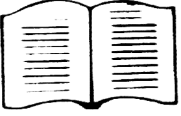
ক. কোন্ পোকার আক্রমণে ধানের পাতা পেঁয়াজ পাতার মত নলাকৃতির হয়ে যায়?
খ. কোন্ পোকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পাতা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া রোগ বিস্তারের পক্ষে সহায়ক?

## পাঠ ৩.৩ ধানের গাছ ফড়িং ও সবুজ পাতা ফড়িং এর বর্ণনা ও দমন



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- ধানের বাদামী গাছ ফড়িং এর জীবনচক্র, ক্ষতির ধরন এবং দমন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধানের সাদা পিঠ গাছ ফড়িং ও তার জীবনচক্র, ক্ষতির ধরন এবং দমন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ধানের ̧ ̧ বুজ পাতা ফড়িং এর জীবনচক্র, ক্ষতির নমুনা এবং প্রতিকার সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।



ধানের গাছ ফড়িং ও সবুজ পাতা ফড়িং বাংলাদেশে ধানের প্রধান বা মূখ্য অনিষ্টকারী পোকা হিসাবে বিবেচিত হয়। এ সব পোকা ধান গাছ এবং পাতা হতে রস শোষণ করে খায় এবং সেই সাথে ধান গাছে বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস রোগ ছড়ায়। বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি প্রজাতির গাছ ফড়িং ও সবুজ পাতা ফড়িং ধান গাছের ক্ষতি করে থাকে। এরা সবাই হেমিপ্টেরা বর্গের অন্তর্গত। এ পাঠে বাংলাদেশের কয়েকটি গাছ ফড়িং, সবুজ পাতা ফড়িং ও তাদের ক্ষয়ক্ষতি এবং দমন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

### বাদামী গাছ ফড়িং (Brown plant hopper)

বৈজ্ঞানিক নাম t *Nilaparvata lugens Stal*
বর্গ ঃ হেমিপটেরা (Hemiptera)

এ পোকা বাংলাদেশে ১৯৭০ সালের পর থেকে ধানের একটি মারাত্মক ক্ষতিকারক পোকা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। এ পোকাকে ১৯৬৩ সালে সর্বপ্রথম ধানের পোকা হিসাবে রেকর্ড করা হয়। পূর্ণ বয়স্ক পোকা এবং নিম্ফ দু'অবস্থাতেই এরা ধানের ক্ষতি করে থাকে।

### বর্ণনা ও জীবনচক্র

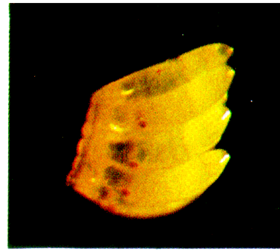
বাদামী গাছ ফড়িং পোকা পাতার খোলে এবং পাতার মধ্যশিরায় সারিবদ্ধভাবে ডিম পাড়ে।

এ পোকার জীবন চক্রে তিনটি ধাপ আছে। এ গুলো হলো ডিম, নিম্ফ এবং পূর্ণ বয়স্ক পোকা। পূর্ণ বয়স্ক পোকার রং বাদামী থেকে গাঢ় বাদামী হতে পারে। এ পোকা বেশ নরম এবং স্ত্রী পোকার পেটটা বেশ বড় থাকে (চিত্র ৩.৭)। পূর্ণ বয়স্ক পোকা ছোট ও বড় –এ দু'ধরনের পাখাবিশিষ্ট থাকতে পারে। পূর্ণ বয়স্ক পোকা ৩.৫ থেকে ৫.০ মি. মি. লম্বা হয়। এরা পাতার খোলে এবং পাতার মধ্যশিরায় সারিবদ্ধভাবে ডিম পাড়ে। ডিমগুলি পাতলা এবং চওড়া একটা আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। ডিম থেকে নিম্ফ বের হতে ৪-৯ দিন সময় লাগে। সদ্যজাত নিম্ফগুলো সাদা থাকে এবং পরবর্তীতে এদের রং বাদামী হয়ে যায়। নিম্ফ অবস্থায় ৫ বার খোলস বদলিয়ে ১০-১৫ দিন সময়ের মধ্যে এরা পূর্ণ বয়স্ক পোকায় পরিণত হয়। পূর্ণ বয়স্ক পোকা হিসাবে বের হবার ৩-৪ দিনের মধ্যে এরা ডিম পাড়ে।

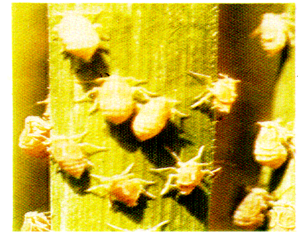




(ক)



(খ)



(গ)

চিত্র ৩.৭ বাদামী গাছ ফড়িং (ক) ডিম (খ) নিম্ফ (গ) পূর্ণ বয়স্ক পোকা

একটি স্পী পোকা ২০০-৫০০টি ডিম পাড়তে পারে। পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় এদের গড় আয়ুষ্কাল ১৪ দিন হয়ে থাকে। বছরে এ পোকার ১০-১১টি প্রজন্ম দেখা যায়।

**ক্ষতির ধরন**

বাদামী গাছ ফড়িংয়ের ক্ষতিকে ❛❛ফড়িং পোড়া" এবং ইংরেজিতে Hopper burn

পূর্ণ বয়স্ক পোকা ও নিম্ফ গাছ থেকে রস শোষণ করে খায়। এর ফলে ধান গাছ প্রথমে হলদে রং ধারণ করে এবং পরে শুকিয়ে যায়। দূর থেকে গাছগুলোকে পুড়ে যাওয়ার মত দেখায়। বাদামী গাছ ফড়িংয়ের এ ধরনের ক্ষতিকে "ফড়িং পোড়া" এবং ইংরেজিতে Hopper burn বলে। এ পোকা দ্বারা শতকরা ১০০ ভাগ ফসলই বিনষ্ট হতে পারে।

উপরোক্ত প্রত্যক্ষ ক্ষতি ছাড়াও বাদামী গাছ ফড়িং ধান গাছের রোগ বিস্তারে সহায়তা করে। বাদামী গাছ ফড়িং ধান গাছের গ্র্যাসি স্টান্ট (Grassy stunt) রোগ বিস্তারে সাহায্য করে।

লম্বা পাখা বিশিষ্ট পূর্ণ বয়স্ক পোকাগুলো প্রথমে ধান ক্ষেতে আক্রমণ করে। বোরো ও রোপা আমন ধানে এ পোকার আক্রমণ বেশি হয়। সেচের আওতাধীন উফশী জাতের আমন ধান ক্ষেতের পরিবেশ এ পোকার বংশবৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল।

**প্রতিকার**

১. যে সব অঞ্চলে বাদামী গাছ ফড়িং-এর প্রাদুর্ভাব বেশি সে সব অঞ্চলে আগে পাকে এমন জাতের গাছ লাগানো।

২. ধানের গোছা থেকে গোছার দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়া।

৩. অধিক উর্বর জমিতে নাইট্রোজেন সার উপরি প্রয়োগ না করা।

৪. আক্রান্ত জমি থেকে কয়েক দিনের জন্য (৭-১০ দিন) পানি সরিয়ে ফেলে এ পোকার আক্রমণ কমানো যায়।

আক্রান্ত জমি থেকে কয়েক দিনের জন্য (৭-১০ দিন) পানি সরিয়ে ফেলে বাদামী গাছ ফড়িং পোকার আক্রমণ কমানো যায়।

৫. উপদ্রুত এলাকায় ধানের পর ধান চাষ না করে অন্য ফসল চাষ করা।

৬. বাদামী গাছ ফড়িং- এর প্রতি প্রতিরোধক জাতের ধান চাষ করা।

৭. এ ছাড়া কীটনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে এ পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায় (সারণি-৩ দেখুন)।

## সাদা পিঠ গাছ ফড়িং (White backed plant hopper )

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Sogatella furcifera Horvath*

বর্গ ঃ হেমিপটেরা (Hemiptera)

বাংলাদেশে সাদা পিঠ গাছ ফড়িং ধানের একটি প্রধান ক্ষতিকারক পোকা। বেশিরভাগ সময় এদেরকে বাদামী গাছ ফড়িং এর সাথে একত্রে দেখা যায়। তাই এদেরকে শনাক্ত করতে ভূল হয়। নিম্ফ ও পূর্ণ বয়স্ক পোকা গাছ হতে রস শুষে খায়।

**বর্ণনা ও জীবন চক্র**

এ পোকা দেখতে অনেকটা বাদামী গাছ ফড়িং এর মত (চিত্র ৩.৮)। কিন্তু এদের পিঠের উপর একটা সাদা লম্বা দাগ থাকে আর এ কারণেই এদেরকে সাদা পিঠ গাছ ফড়িং বলে।



চিত্র ৩.৮ সাদা পিঠ গাছ ফড়িং

পূর্ণ বয়স্ক স্পী পোকা সাধারণত পত্র খোলের ভিতরে সারিবদ্ধ-ভাবে ডিম পাড়ে।

পূর্ণ বয়স্ক পোকা ৩-৪ মি. লম্বা হয়। পূর্ণ বয়স্ক স্পী পোকা সাধারণত পত্র খোলের ভিতরে সারিবদ্ধভাবে ডিম পাড়ে। ৫-৮ দিনে ডিম ফুটে নিম্ফ বের হয়। নিম্ফ গুলো সাদা থেকে বাদামী কালো ও সাদা মিশ্রিত রঙের এবং কোনো কোনো সময় ছাই রঙের হয়ে থাকে। এরা ৫ বার খোলস বদলিয়ে ১১-১৪ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ পোকায় পরিণত হয়। পূর্ণাঙ্গ পোকা হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার ৩-৬ দিনের মধ্যে এরা ডিম পাড়ে। ১৯-৫০ দিনের মধ্যে এদের জীবনকাল শেষ হয়। একটি পোকা ১৮৬-৫৩৩ টি ডিম পাড়ে। পূর্ণ বয়স্ক পোকার গড় আয়ু ১৪ দিন। স্পী পোকা পুরুষ অপেক্ষা বেশি দিন বাঁচে। ধানের জমিতে এরা ৬-৭ বার বংশ বিস্তার করে।

**ক্ষতির ধরন**

পূর্ণ বয়স্ক পোকা ও নিম্ফ উভয়েই গাছ থেকে রস শোষণ করে খায়। ফলে গাছ নির্জীব হয়ে যায়, গাছের পাতা হলদে হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে মরিচা রঙের মত লাল হয়ে

পূর্ণ বয়স্ক পোকা ও নিম্ফ উভয়েই গাছ থেকে রস শোষণ করে খায়। ফলে গাছ নির্জীব হয়ে যায়, গাছের পাতা হলদে হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে মরিচা রঙের মত লাল হয়ে যায়। আক্রান্ত গাছ গুলো শুকিয়ে যায়। এক সাথে অনেক পোকার আক্রমণ হলে পাতাগুলো শুকিয়ে যায় এবং ফড়িং পোড়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়। আক্রান্ত গাছ থেকে কোনো শীষ উৎপন্ন হয় না। অল্প সংখ্যক পোকার আক্রমণ হলে গাছে কুশি কম হয় অথবা ধানের ছড়ায় অনেক ধান চিটা হয়ে যেতে পারে। এ পোকার আক্রমণ ব্যাপক হলে ধানের ফলন শতকরা ৮০ ভাগ কম হতে পারে।

সাদা পিঠ গাছ ফড়িং বোরো ধানের জমিতে বেশি দেখা যায়। গরম ও অল্প বৃষ্টিপাতে এ পোকার বংশ বিস্তার খুব দ্রুত হয়। বৃষ্টিপাত অধিক হলে এ পোকার সংখ্যা কমে যায়।

**প্রতিকার**

এ পোকার দমন পদ্ধতি বাদামী গাছ ফড়িং এর অনুরূপ।

## সবুজ পাতা ফড়িং ( Green leaf hopper)

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Nephotettix virescens* (Distant)
*Nephotettix nigropictus* (stal.)
*Nephotettix modulatus* (Melichar.)

বর্গ ঃ হেমিপটেরা (Hemiptera)

সবুজ পাতা ফড়িং সাধারণত অল্প বয়স্ক গাছে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে নিম্ফ বের হতে ৫-১০ দিন সময় লাগে।

সবুজ পাতা ফড়িং বাংলাদেশে ধানের মূখ্য বা প্রধান অনিষ্টকারী পোকা। সর্বপ্রথম ১৯০৮ সালে এটিকে ধানের গৌণ আপদ হিসাবে শনাক্ত করা হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে এ পোকাকে ধানের মূখ্য আপদ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশে এ পোকার তিনটি প্রজাতি পাওয়া গিয়েছে যাদের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এদের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য মোটামুটি একই ধরনের। এখানে শুধু *Nephotettix virescens* সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

**বর্ণনা ও জীবনচক্র**

পূর্ণ বয়স্ক পোকা আকারে ছোট, ৩-৫ মি. মি. লম্বা। এদের গায়ের রং সবুজ এবং পাখার উপরে কালো দাগ আছে (চিত্র ৩.৯)। স্পী পোকা পাতার খোলে এবং পাতার মধ্য শিরায় সারি করে একত্রে ৮-১৬ টি ডিম পাড়ে। একটি স্পী পোকা ২০০-৩০০টি ডিম পাড়ে। এরা সাধারণত অল্পবয়স্ক গাছে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে নিম্ফ বের হতে ৫-১০ দিন সময় লাগে। কুশি অবস্থায় নিম্ফের সংখ্যা বেশি থাকে। ৫ বার খোলস বদলিয়ে ১২-২১ দিনে এর নিম্ফ অবস্থা শেষে পূর্ণ বয়স্ক পোকায় পরিণত হয়। একটি পূর্ণ বয়স্ক পোকা গড়ে ১৫ দিন বাঁচে। অনুকূল আবহাওয়ায় এরা ৩ সপ্তাহের মধ্যে জীবন চক্র সম্পন্ন করে। এক বছরে এ পোকা প্রায় ১০ টি প্রজন্ম তৈরি করে।



চিত্র ৩.৯ সবুজ পাতা ফড়িং (Grist & Lever, ১৯৬৯ থেকে নেয়া হয়েছে) (ক) একটি ডিম (খ) পাতায় সারিবদ্ধ ডিম (গ) পূর্ণবয়স্ক পোকা।

**ক্ষতির ধরন**

সবুজ পাতা ফড়িং দু'ভাবে ধান গাছের ক্ষতি করে থাকে- (ক) নিম্ফ ও পূর্ণবয়স্ক পোকা উভয়েই গাছের পাতা থেকে রস শোষণ করে খায়। (খ) এ পোকা ধান গাছের টুংরো ভাইরাস রোগ ছড়ায়। এক সাথে অনেক পোকা রস শুষে খেলে পাতা সাদা হয়ে যায়। সরাসরি রস শোষন করার ফলে গাছের শক্তি কমে যায়। ধান গাছের টুংরো ভাইরাস রোগ ছড়িয়ে এ পোকা আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। পূর্ণ বয়স্ক পোকা ও নিম্ফ উভয়েই টুংরো ভাইরাস ছড়ায়। টুংরো ভাইরাস হলে ধানের ফলন সম্পূর্ন নষ্ট হয়ে যায়। এরা বাংলাদেশে ৫০-৮০% পর্যন্ত ধানের ক্ষতি করতে পারে।
শুষ্ক ও গরম আবহাওয়ায় এ পোকার প্রাদর্ভাব বেশি হয়।

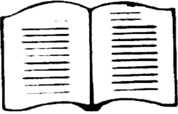
ধান গাছের টুংরো ভাইরাস রোগ ছড়িয়ে এ পোকা আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে।

**প্রতিকার**

১. বীজতলায় যাতে এ রোগ না ছড়ায় তার জন্য বীজতলাকে কয়েকদিন ঢেকে রাখতে হবে।
২. টুংরো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত চাষ করতে হবে।
৩. জমিতে বা তার আশে পাশে টুংরো আক্রান্ত গাছ থাকলে সেগুলোকে নষ্ট করে ফেলতে হবে।
৪. আক্রমণ তীব্র হলে কীটনাশক বাবহার করতে হবে।



***অনুশীলন (Activity) :*** *বাংলাদেশে বাদামী গাছ ফড়িং ও সবুজ পাতা ফড়িং এর কয়টি প্রজাতি পাওয়া যায়? তাদের নাম লিখুন। আপনার এলাকায় বাদামী গাছ ফড়িংয়ের প্রার্দুভাব কেমন? বাদামী গাছ ফড়িংয়ের ক্ষতির ধরন বর্ণনা করুন।*



**সারমর্ম ঃ** বাদামী গাছ ফড়িং, সাদা পিঠ গাছ ফড়িং এবং সবুজ পাতা ফড়িং বাংলাদেশে ধানের প্রধান অনিষ্টকারী পোকা। তিনটি প্রজাতির পোকাই গাছ ও পাতা থেকে রস শোষণ করে খায়। বাদামী গাছ ফড়িংয়ের আক্রমণের ফলে গাছের পাতা শুকিয়ে যায় এবং পুড়ে যাওয়ার মত দেখায়। এ ধরনের ক্ষতিকে ফড়িং পোড়া বলে। বাদামী গাছ ফড়িং ধান গাছের গ্রাসিষ্টান্ট রোগ বিস্তার করে। সাদা পিঠ গাছ ফড়িংয়ের আক্রমণেও ফড়িং পোড়া লক্ষণ দেখা যায়। সবুজ পাতা ফড়িং রস শুষে খায়। তবে টুংরো ভাইরাস রোগ বিস্তারের মাধ্যমে এরা সব চেয়ে বেশি ক্ষতি করে।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

ক. ধান গাছে কোন্ পোকার আক্রমণে ফড়িং পোড়া সৃষ্টি হয়?

i) বাদামী গাছ ফড়িং　　ii) সবুজ পাতা ফড়িং

iii) গান্ধী পোকা　　iv) পামরী পোকা

খ. সবুজ পাতা ফড়িং ধানের কোন্ রোগ বিস্তার করে?

i) টুংরো ভাইরাস　　ii) গ্রাসি স্টান্ট

iii) ইয়োলো ডোয়ার্ফ　　iv) রেগড স্টান্ট

**২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।**

ক. বাদামী গাছ ফড়িং গাছের টুংরো ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

খ. সবুজ পাতা ফড়িং বছরে ১০টি প্রজন্ম তৈরি করে।

**৩। শূনস্থান পূরণ করুন।**

ক. ...... ও ......... ধানে বাদামী গাছ ফড়িংয়ের আক্রমণ বেশি হয়।

খ. সবুজ পাতা ফড়িং দ্বারা রস শোষনের ফলে গাছের ........... কমে যায়।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. বাদামী গাছ ফড়িং আক্রমণ তীব্র হলে শতকরা কত ভাগ ফসল নষ্ট হতে পারে?

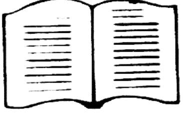
খ. কোন্ ধরনের আবহাওয়ায় সবুজ পাতা ফড়িং এর আক্রমণ বেশি হয়?

## পাঠ ৩.৪ পাটের ক্ষতিকর পোকার বর্ণনা ও দমন



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- পাটের প্রধান কয়েকটি ক্ষতিকারক পোকার নাম বলতে ও লিখতে পারবেন।
- পাটের বিছা পোকার জীবনচক্র ও ক্ষতির ধরন বর্ণনা করতে পারবেন।
- পাটের ঘোড়া পোকার বর্ণনা লিখতে পারবেন এবং এর জীবনচক্র, ক্ষতির ধরন এবং দমন বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন।
- পাটের চেলে পোকার জীবনচক্র, ক্ষতির ধরন এবং প্রতিকার সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।



পাট বাংলাদেশের একটি প্রধান অর্থকরী ফসল। অনেকগুলো প্রজাতির পোকা মাঠে পাট আক্রমণ করে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। এর মধ্যে কয়েকটি প্রধান অনিষ্টকারী পোকা-মাকড়ের একটি তালিকা ২ নং সারণিতে দেয়া হলো।

সারণি ২ ঃ পাটের প্রধান অনিষ্টকারী কয়েকটি কীট-পতঙ্গ।

| বাংলা ও ইংরেজি নাম | বৈজ্ঞানিক নাম | বর্গ |
|---|---|---|
| ১। পাটের বিছা পোকা<br>Jute hairy caterpillar | *Spilosoma obliqua* W. | লেপিডোপ্টেরা<br>(Lepidoptera) |
| ২। পাটের ঘোড়া পোকা<br>Jute semilooper | *Anomis sabulifera* G. | লেপিডোপ্টেরা |
| ৩। পাটের চেলে পোকা<br>Jute stem weevil ev Jute apion. | *Apion chorchori M.* | কলিওপ্টেরা<br>(Coleoptera) |
| ৪। পাটের সাদা মাকড়<br>Jute white mite or yellow mite | *Polyphagotarsonemus latus Banks.* | একারিনা<br>(Acarina) |
| ৫। পাটের লাল মাকড়<br>Jute red mite | *Tetranychus bioculatus W.-M.* | একারিনা |
| ৬। পাটের কাতরী পোকা<br>Jute indigo caterpillar | *Spodoptera exigua* H. | লেপিডোপ্টেরা |
| ৭। পাটের উড়চুঙ্গা পোকা<br>Jute field cricket | *Brachytrypes portentosus* L. | অর্থোপ্টেরা<br>(Orthoptera) |

### পাটের বিছাপোকা (Jute hairy caterpillar)

পাটের অনিষ্টকারী পোকাগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম।এটি শুয়া পোকা নামেও পরিচিত। কোনো কোনো অঞ্চলে এ পোকাকে ‘‘ছেংগা’’ নামেও অভিহিত করা হয়। এটি একটি বহুভোজী পতঙ্গ।

### বর্ণনা ও জীবন চক্র

পূর্ণ বয়স্ক বিছা পোকা একটি মথ। এদের গায়ের রং বিস্কুটের ন্যায়। এদের পাখায় ও দেহে কালো ফোঁটা আছে। পুরুষ মথের চেয়ে স্ত্রী মথ আকারে বড়। স্ত্রী মথের শুঙ্গ সূত্রাকার (filiform) আর পুরুষ মথের শুঙ্গ দ্বি- পল্লব যুক্ত (Bipectinate) । স্ত্রী মথ পাতার উল্টোদিকে গাদা করে ডিম পাড়ে। একটি স্ত্রী মথ ৪০০-১০০০টি ডিম পাড়ে। ডিমগুলো প্রথমে চকচকে সবুজ রংয়ের থাকে। কিন্তু পরে কালো হয়ে যায়। ডিম ফুটতে পাটের মৌসুমে ৫-৭ দিন এবং শীতকালে ১৩-১৪ দিন সময় লাগে। সদ্যজাত কীড়ার রং থাকে সবুজ। এ সময় এরা যে পাতায় ডিম থাকে সে পাতার উল্টোদিকে দলবদ্ধভাবে থাকে। শূককীট কালের মেয়াদ পাটের মৌসুমে ১৮-২১ দিন। কীড়ার দেহ লম্বা লোম দ্বারা আবৃত থাকে। বর্ষাকালে বিছাপোকার রং থাকে কমলা। পূর্ণতাপ্রাপ্ত শূককীট লম্বায় ৪.৫ সে. মি. হয়। শূককীট অবস্থা শেষে এরা পাতার নিচে বা মাটির ফাটলে মূককীটে পরিণত হয়। শূককীটগুলো দেহের চামড়া ও লোম দিয়ে গুটি তৈরি করে তার ভিতরে অবস্থান করে। ৯-১০ দিন পর মূককীট

শূককীটগুলো দেহের চামড়া ও লোম দিয়ে গুটি তৈরি করে তার ভিতরে অবস্থান করে।

গুলো পূর্ণাঙ্গ মথে পরিণত হয়। পুরুষ মথ ৩-৪ দিন এবং স্পী মথ ৫-৮ দিন বেঁচে থাকে। পাটের মৌসুমে এ পোকা ২-৩টি প্রজন্ম তৈরি করে।

**ক্ষতির ধরন**

পাটের বিছাপোকা পাতার সবুজ অংশ খেয়ে পাতাটিকে পাতলা পর্দার মত করে ফেলে।

এ পোকার কীড়া পাটগাছের চারা অবস্থা থেকে শুরু করে আগষ্ট মসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত পাতার ক্ষতি সাধন করে (চিত্র ৩.১০)। ডিম ফুটে বের হবার পর কীড়াগুলো ৫-৬ দিন পর্যন্ত একটি পাতায় দলবদ্ধ ভাবে থাকে। এ অবস্থায় এরা পাতার সবুজ অংশ খেয়ে পাতাটিকে পাতলা পর্দার মত করে ফেলে। তারপর কীড়াগুলো সমস্ত জমিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং পাতা খেতে শুরু করে। আক্রমণ তীব্র হলে এরা গাছের ডগা পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। বিছা পোকার আক্রমণে গাছের বৃদ্ধি কমে যায় এবং ফলন কম হয়। এ পোকার আক্রমণে প্রতি হেক্টরে ১৮৫-৬৫০ কেজি পর্যন্ত ফলন কম হতে পারে।

চিত্র ৩.১০ পাটের বিছা পোকা দ্বারা ক্ষতির ধরন

**প্রতিকার**

কীড়াগুলো যখন দলবদ্ধ অবস্থায় থাকে তখন এগুলোকে সংগ্রহ করে কেরোসিন মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে অথবা পায়ে মাড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।

১। কীড়াগুলো যখন দলবদ্ধ অবস্থায় থাকে তখন এগুলোকে সংগ্রহ করে কেরোসিন মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে অথবা পায়ে মাড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।

২। ডায়াজিনন ৬০ ই,সি বা ন ভাক্রন ৪০ ই,সি বা ইকালাক্স ৫০ ই,সি প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মি. লি. কীটনাশক মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। অথবা নগস ১০০ ই,সি প্রতি হেক্টর জমিতে ৫৬০ মি. লি. হিসাবে স্প্রে করতে হবে।

## পাটের ঘোড়া পোকা

### বর্ণনা ও জীবন চক্র

পূর্ণ বয়স্ক ঘোড়া পোকা একটি মথ। মথের রং মেটে বাদামী। সামনের পাখায় গাঢ় ফোঁটা এবং আঁকা-বাঁকা দাগ আছে। স্পী মথ বাড়ন্ত পাট গাছের কচি পাতার উল্টো দিকে ভোর রাতে বা সকালে একটি একটি করে ১৪০-৬৩৫ টি ডিম পাড়ে। কিন্তু এরা সমস্ত ডিম এক গাছে পাড়ে না। ডিমের রং সবুজ। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে ৪-৫ দিন সময় লাগে। শূককীট কাল ১৫-১৮ দিন স্থায়ী হয়। পূর্ণতা প্রাপ্ত কীড়া প্রায় ৪ সে. মি. লম্বা হয়। দেহ উজ্জ্বল সবুজ রঙের হয়। এদের শরীর নরম এবং গায়ে সবুজের সাথে কালো ফোঁটা থাকে। এদের রং বাদামীও হতে পারে। এরা ঘোড়ার মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। চলার সময় দেহের মধ্যবর্তী স্থানে ভাঁজ পড়ে। শূককীট অবস্থায় এরা ৫-৬ দিন থাকে। পাট মৌসুমে এরা ৩টি প্রজন্ম তৈরি করে।

চিত্র ৩.১১ পাটের ঘোড়া পোকার শূককীট ও ক্ষতির নমূনা

**ক্ষতির ধরন**

সদ্যজাত কীড়াগুলো ডগার কচি পাতা খেতে আরম্ভ করে (চিত্র ৩.১১)। কীড়াগুলো প্রথম প্রথম পাতা ছিদ্র করে খায় এবং বড় হতে থাকলে পুরো পাতা খেয়ে ফেলে। কোনো কোনো সময় এরা গাছের অগ্রভাগের কুঁড়ি এবং ডগা খেয়ে নষ্ট করে দেয়। এর ফলে গাছে শাখা-প্রশাখা বের হয়। এ পোকা দ্বারা ৭০-৯০% গাছ আক্রান্ত হলে পাটের ফলন ১৯% কম হয়। এ পোকা দেশী পাটের চেয়ে তোষা পাট আক্রমণ করতে বেশি পছন্দ করে।

পাটের ঘোড়া পোকা দ্বারা ৭০-৯০% গাছ আক্রান্ত হলে পাটের ফলন ১৯% কম হয়।

**প্রতিকার**

১। কেরোসিন ভেজানো রশি গাছের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে এ পোকা আংশিক ভাবে দমন করা সম্ভব

২। শালিক ময়না, ফিংগে, দোয়েল প্রভৃতি পাখী ঘোড়া পোকা খেতে খুব পছন্দ করে। পাট ক্ষেতের স্থানে স্থানে বাঁশের লাঠি বা ডালপালা পুতে দিয়ে এ সব পাখির বসার ব্যবস্থা করে দিলে এরা পোকা খেয়ে এ পোকার সংখ্যা কমাতে পারে।

৩। পাট কাটার পর পাটের জমিকে ভালোভাবে চাষ দিলে এ পোকার মূককীট উপরে চলে আসে। তখন বিভিন্ন প্রকার পাখী মূককীট খেয়ে এ পোকার সংখ্যা কমতে পারে।

৪। আক্রমণ তীব্র হলে ডায়াজিনন ৬০ ই,সি বা ইকালাক্স ৫০ ই,সি প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মি. লি. মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

## পাটের চেলে পোকা

পাটের ক্ষতিকর পোকাগুলোর মধ্যে চেলে পোকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ পোকা পাটের আঁশের মারাত্মক ক্ষতি করে।

## বর্ণনা ও জীবন চক্র

পূর্ণাঙ্গ চেলে পোকা একটি উইভিল। এর রং ধূসর কালো। এরা আকারে অত্যন্ত ছোট, লম্বায় প্রায় ২.০ মি. মি.। এ পোকার সম্মুখে বাঁকা শুঁড় (snout) আছে (চিত্র ৩.১২)। স্পী উইভিল তার শুঁড়ের সাহায্যে পাটগাছের পর্বে বা গাঁটে ছিদ্র করে সেখানে একটি করে ডিম পাড়ে। একটি স্পী পোকা ১২০ দিনে ৩৮২টি ডিম পেড়ে থাকে। ৩-৪ দিন পর ডিম ফুটে বাঁচ্চা (Grub) বের হয়। সদ্যজাত গ্রাবের রং থাকে সাদা। গ্রাবগুলি কান্ডের আভ্যন্তরীন কলা খেতে শুরু করে। গ্রাব বা শুককীট দেখতে ইংরেজি ÕÕCÕÕ অক্ষরের মত বাঁকা। গ্রাবের কোনো পা নেই। শূককীট বা গ্রাব অবস্থায় এরা ১০-১৩ দিন কাটায়। গ্রাবগুলো গাছের কান্ডের অভ্যন্তরে মূককীটে পরিণত হয়। মূককীট কাল ৪-৫ দিন। এরপর পূর্ণাঙ্গ পোকায় পরিণত হয়। একটি পূর্ণ বয়স্ক পোকা সর্বোচ্চ ২০৯ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। গাছের চারা অবস্থা থেকে শুরু করে পাটগাছ কাটা পর্যন্ত এরা আক্রমণ করে। এ পোকা পাট মৌসুমে ৬ বার বংশ বিস্তার করে।

স্পী উইভিল তার শুঁড়ের সাহায্যে পাটগাছের পর্বে বা গাঁটে ছিদ্র করে সেখানে একটি করে ডিম পাড়ে।



চিত্র ৩.১২ পাটের চেলে পোকাঃ (ক) পূর্ণ বয়স্ক পোকা, (খ) গ্রাব বা শূককীট, (গ) ক্ষতিগ্রস্ত ডগা (আহমেদ ও জলিল, ১৯৯৩ থেকে নেয়া হয়েছে।

**ক্ষতির ধরন**

পূর্ণ বয়স্ক পোকা পাট গাছের পাতায় ছোট ছোট ছিদ্র করে পাটের পাতা খায়। ডিম ফুটে বের হবার পর গ্রাবগুলো কান্ডের ভিতরে খাদ্যগ্রহণ করে এবং এক প্রকার পিচ্ছিল ও আঠালো পদার্থ নিঃসরণ করে। এর ফলে ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায় এবং কন্ডের এ অংশ গিঁটের মত ফুলে যায়। এতে আঁশের গুনাগুন নষ্ট হয়ে যায়। আক্রমণের স্থান পঁচে না কিন্তু শক্ত হয়ে যায়। এ স্থানে কালো দাগ পড়ে এবং এখানে আঁশ ছিড়ে যায়। এতে পাটের বাজার দর কমে যায়। একটি পাটের আঁশে ২-৩ টি কালো দাগ থাকলে তাকে ''সি-বটম'' এবং চার ও তার অধিক কাল দাগ থাকলে তাকে ''ক্রস বটম'' (X-বটম) হিসাবে গণ্য করা হয়। বর্ধনশীল পাট গাছে আক্রান্ত স্থানের উপরের অংশের ডগা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় এবং এ স্থানে পার্শ্ব শাখা-প্রশাখা বের হতে থাকে। অত্যন্ত ছোট অবস্থায় আক্রান্ত হলে পাটের চারা মারা যায়।

এ পোকা তোষা পাটের চেয়ে দেশী পাটে বেশি আক্রমণ করে। চেলে পোকা পাটগাছের ফলেও আক্রমণ করে। পাট ক্ষেতের আশে পাশে ঝোপ ঝাড় থাকলে চেলে পোকা বেশি পাওয়া যায়।

একটি পাটের আঁশে ২-৩ টি কালো দাগ থাকলে তাকে ''সি-বটম'' এবং চার ও তার অধিক কাল দাগ থাকলে তাকে ''ক্রস বটম'' (X-বটম) হিসাবে গণ্য করা হয়।

**প্রতিকার**

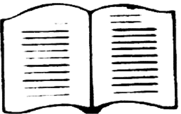
১। পাট ক্ষেতের আশে পাশের ঝোপ ঝাড় পরিষ্কার রাখতে হবে।

২। মৌসুমের প্রথম দিকে চেলে পোকা দ্বারা আক্রান্ত চারাগাছগুলো তুলে নষ্ট করে ফেললে এ পোকার পরবর্তী আক্রমণ অনেকটা কমানো যায়।

৩। পাটগাছের চারা অবস্থায় (১২-১৫ মি. লম্বা) মেটাসিস্টক্স ৫০ ই,সি প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মি. লি. বা বাইড্রিন ৮৫% তরল প্রতি লিটার পানিতে ১.০ মি. লি. হিসেবে স্প্রে করতে হবে। চেলে পোকার ক্ষতির নমূনা বর্ণনা করুন।



***অনুশীলন (Activity) :*** *বাংলাদেশে পাটের অনিষ্টকারী কয়েকটি পোকার নাম লিখুন। আপনার এলাকার কোন্ পোকার প্রাদ র্ভাব বেশি বর্ণনা করুন। চেলে পোকার ক্ষতির নম না লিখুন।*



**সারমর্ম ঃ** পাটের বিছাপোকা, ঘোড়া পোকা এবং চেলে পোকা বাংলাদেশে পাটের প্রধান ক্ষতিকর পোকা হিসাবে চিহ্নিত। এ সব পোকার আক্রমণে পাটের মারাত্বক ক্ষতি হয়। বিছাপোকা পাট গাছের পাতা খেয়ে নষ্ট করে। এ পোকার আক্রমণে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। বিছাপোকার আক্রমণে

হেক্টর প্রতি পাটের ফলন ১৮৫-৬৫০ কেজি পর্যন্ত কম হতে পারে। ঘোড়া পোকা পাট গাছের কচি পাতা ছিদ্র করে খাওয়া শুরু করে এবং আস্তে আস্তে পুরো পাতা পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। এ পোকা দ্বারা ৭০-৯০% গাছ আক্রান্ত হলে পাটের ফলন ১৯% কম হয়। পাটের চেলে পোকার গ্রাব কান্ডের অভ্যন্তরে খায়। এ পোকার আক্রমণে পাটের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায়। কান্ডের যে জায়গা দিয়ে এ পোকা ছিদ্র করে সে জায়গা কালো হয়ে যায় এবং সে জায়গার আঁশ ছিড়ে যায়। একটি আঁশে ৪ বা তার বেশি কলো দাগ থাকলে সে আঁশকে X- বটম হিসাবে গ্রেডভূক্ত করা হয়।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√ ) চিহ্ন দিন।**

ক. কোন্ পোকার শূককীটকে গ্রাব বলে?

i) পাটের বিছা পোকার শূককীটে ii) পাটের চেলে পোকার শূককীটে
iii) পাটের ঘোড়া পোকার শূককীটে iv) পাটের উড়চুঙ্গার শূককীটে

খ. কোন্ পোকার আক্রমণে পাটের গুণগত মান নষ্ট হয়?

i) পাটের বিছাপোকা ii) চেলে পোকা
iii) ঘোড়া পোকা iv) কোনোটাই নয়।

**২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন**

ক. পাটের ঘোড়া পোকা দেশী পাটের চেয়ে তোষা পাটে আক্রমণ করতে বেশি পছন্দ করে।
খ. চেলে পোকার গ্রাব দেখতে অনেকটা ইংরেজি "C" অক্ষরের মত বাঁকা।

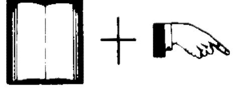
**৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

খ. ডিম ফুটে বের হবার পর ............ কীড়াগুলো একটি পাতায় দলবদ্ধভাবে থাকে।
খ. প্রতি পাটের আঁশে ৪ বা তার অধিক কালো দাগ থাকলে তাকে ........... হিসেবে গণ্য করা হয়।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

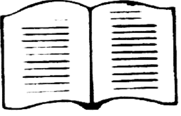
ক. কোন্ পোকার শূককীট ঘোড়ার মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলে?
খ. কোন্ পোকার শূককীট দেহের চামড়া ও লোম দ্বারা গুটি তৈরি করে তার ভিতরে মূককীটে পরিণত হয়?

## পাঠ ৩.৫ আখের ক্ষতিকর পোকার বর্ণনা ও দমন



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- আখের প্রধান ক্ষতিকারক কয়েকটি পোকার নাম লিখতে ও বলতে পারবেন।
- আখের শক্ত কান্ডের মাজরা পোকার জীবনচক্র, ক্ষতির ধরন এবং দমন সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- ডগার সাদা মাজরা পোকার জীবনচক্র, ক্ষতির নম না এবং প্রতিকার বর্ণনা করতে পারবেন।
- আখের পাতা শোষক পোকার জীবনচক্র, ক্ষতির নম না এবং দমন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।



আখ বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশে চিনি উৎপাদনের একমাত্র কাঁচামাল হলো আখ। আখে প্রায় ১৫০টি প্রজাতির পোকা আক্রমণ করে। তার মধ্যে ১০-১২টি প্রজাতির পোকাকে প্রধান অনিষ্টকারী হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। প্রধান অনিষ্টকারী পোকাদের মধ্যে কান্ডের মাজরা পোকা প্রধান শিকড়ের মাজরা পোকা, চারার মাজরা পোকা, ডগার সাদা মাজরা পোকা, উই পোকা, পাতা শোষক পোকা এবং মিলি বাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্যযোগ্য পোকাগুলির মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হলো।

### কান্ডের মাজরা পোকা (Stem borer)

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Chilo tumidiocostalis* H.
বর্গ ঃ লেপিডোপ্টেরা

বাংলাদেশে এ পোকা আখের ভীষন ক্ষতি করে থাকে। এ পোকার শূককীট আখের ক্ষতি করে।

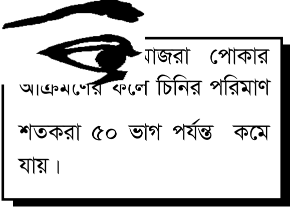
### বর্ণনা জীবনচক্র

পূর্ণাঙ্গ মথের রং একটু লালচে বাদামী। সামনের পাখায় অগ্রভাগের দিকে একসারি ছোট কালো দাগ থাকে। স্ত্রী পোকা পাতার নিচের প্রান্তে লম্বা গাদা করে পিঠা পিঠি ৩-৪ সারিতে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে শূককীট বের হতে এক সপ্তাহ সময় লাগে। শূককীটগুলো গাঢ় পিংগল। শূককীটের গায়ে চারটি লম্বালম্বি সমান্তরাল ডোবা রেখা থাকে। শূককীটগুলো কান্ডের ভিতরে ঢুকে খেতে থাকে। শূককীট কাল ৩০-৪০ দিন স্থায়ী হয়। মূককীট অবস্থায় ৭-১৪ দিন কাটানোর পর এরা পূর্ণাঙ্গা পোকায় পরিণত হয়।

### ক্ষতির ধরন

এ পোকার কীড়া বাড়ন্ত কান্ডের অভ্যন্তরে ছিদ্র করে ঢুকে সেখানে খেতে থাকে (চিত্র ৩.১৩)। এর ফলে আখ গাছের মাথা শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত গাছের কান্ডে অনেকগুলো ছিদ্র দেখা যায়। ছিদ্র দিয়ে কাঠের গুড়ার মত বস্তু ও পোকার মল বের হয়। মলগুলো হলুদ রঙের। একটি গাছে এক সাথে অনেকগুলো শূককীট আক্রমণ করতে পারে। কান্ডের অভ্যন্তরে খাওয়ার ফলে গাছের আগা হতে ১-১.২ মিটার নিচে সুড়ঙ্গ তৈরি হয়। শূককীটগুলো একটি গাছ ধ্বংস করার পর অন্য গাছে আক্রমণ করে। একটি কীড়া অনেকগুলো আখ গাছের ক্ষতি করে। এ পোকা দ্বারা বড় আখ গাছ (Old plant) আক্রান্ত হলে আখের মান কমে যায় এবং রসের পরিমাণ কম হয়।

> আক্রান্ত গাছের কান্ডে অনেকগুলো ছিদ্র দেখা যায়। ছিদ্র দিয়ে কাঠের গুড়ার মত বস্তু ও পোকার মল বের হয়।



মাজরা পোকার আক্রমণের ফলে চিনির পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত কমে যায়।

চিত্র ৩.১৩ কান্ডের মাজরা পোকার ক্ষতির নমূনা

**প্রতিকার**

১। মে,জুন, জুলাই মাসে আক্রান্ত গাছ গুলোকে কেটে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

২। আক্রান্ত গাছগুলোকে টুকরো করে কেটে ড্রামের ভিতর রেখে একটি পাতলা মশারির কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এতে এদের পরজীবি পোকাগুলো নষ্ট হবেনা।

৩। আখ কাটার পর অবশিষ্টাংশ ধ্বংস করে ফেলতে হবে এবং পোকামুক্ত বীজখন্ড রোপণ করতে হবে।

৪। মে জুন মাসে পাদান ১০ জি প্রতি হেক্টরে ৩০ কেজি নালার মাটির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

৫। নুভাক্রন ১২৫০মি. লি. কীটনাশক ১১১২ লিটার পানিতে মিশিয়ে এক হেক্টর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

আক্রান্ত গাছগুলোকে টুকরো করে কেটে ড্রামের ভিতর রেখে একটি পাতলা মশারির কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এতে এদের পরজীবি পোকাগুলো নষ্ট হবেনা।

### ডগার সাদা মাজরা পোকা (Top shoot borer)

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Scirpophaga excrptalis* W.
বর্গ ঃ লেপিডোপ্টেরা

এটি বাংলাদেশে আখের একটি মারাত্বক ক্ষতিকারক পোকা। এ পোকার শূককীট বা কীড়া আখ গাছের ক্ষতি করে।

**বর্ণনা ও জীবন চক্র**

পূর্ণাঙ্গ স্পী মথ দেখতে দুধের ন্যায় সাদা। মথের সামনের পাখায় কখনও কখনও একটি করে ফোঁটা থাকে। স্পী পোকা পাতার উল্টোদিকে ডিম পাড়ে। ডিমগুলো চ্যাপ্টাকৃতির এবং পীত বর্ণের শুয়া অথবা রেশম (Wool) দ্বারা আবৃত থাকে। একটি স্পী পোকা মোট ১৫০ টি পর্যন্ত ডিম পেড়ে থাকে। ডিম ফুটে শুককীট বের হতে ৭-৮ দিন সময় লাগে। শূককীট কাল ১৫-২২ দিন স্থায়ী হয়। বাড়ন্ত অবস্থায় কীড়া সাদাটে হলুদাভ হয় এবং এদের গায়ে কোনো ডোরা নেই। এরপর এরা মূককীটে পরিণত হয়। মূককীট অবস্থায় ১০-১২ দিন কাটানোর পর পূর্ণাঙ্গ মথ হিসাবে বের হয়ে আসে। পূর্ণাঙ্গ মথ ২-৫ দিন বাঁচে। এদের জীবন চক্র শেষ করতে ৬-৮ সপ্তাহ সময় লাগে।

**ক্ষতির ধরন**

স্ত্রী পোকার পিছনে তূলার ন্যায় বস্তু দেখা যায়। স্ত্রী পোকা পত্রখোলে গুচ্ছাকারে ডিম পাড়ে।

আখের চারার ২-৩ মাস বয়স হতেই এ পোকার আক্রমণ শুরু হয় এবং পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত চলতে থাকে। ডিম থেকে বের হবার পর কীড়াগুলো পাতার মধ্যশিরা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে। এভাবে এরা আস্তে আস্তে নিচের দিকে যেতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে পৌছে (চিত্র ৩.১৪) খেতে শুরু করে ফলে পাতার মধ্য শিড়ার পার্শ্ব বরাবর সূতার মত লম্বালম্বি দাগ দেখা যায়। পাতায় প্রায় সমান্তরাল ছোট ছোট ছিদ্র দেখা যায় (Short holes) এবং একপাশ পুড়ে কুকড়ে যায়। আখের মাইজ মারা যায় (Burnt dead heart)। একটি আক্রান্ত গাছের ভিতর একটি শুককীট পাওয়া যায়।



চিত্র ৩.১৪ ডগার সাদা মাজরা পোকার ক্ষতির নমূনা

মরাডগা টান দিলে সহজে উঠে আসে না। মরাডগা সৃষ্টি হলে সবচেয়ে উপরের পর্বসন্ধি হতে গুচ্ছাকারে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বের হয়। এতে করে আখ গাছের বৃদ্ধি হয় না। এ পোকার আক্রমণের ফলে চিনির পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত কমে যায়। এ পোকা দ্বারা ৫০-১০০% গাছ আক্রান্ত হয় এবং ওজনে ৮-১৫% ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ডগার সাদা মাজরা পোকার আক্রমনের ফলে পাতায় প্রায় সমান্তরাল ছোট ছোট ছিদ্র দেখা যায় (Short holes) এবং একপাশ পুড়ে কুকড়ে যায়।

**প্রতিকার**

১। পোকা যাতে পুরানো আখ হতে নতুন আখের জমিতে যেতে না পারে সেজন্য অক্টোবর হতে ফেব্রয়ারি মাসের মধ্যে আখ লাগাতে এবং কাটার ব্যবস্থা করতে হবে।

২। মরাডগা শনাক্ত করে সেগুলো সংগ্রহ করে কীড়া ও পুত্তলীসহ কেটে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

৩। ডিমের গাদা সংগ্রহ করে সরাসরি ধ্বংস না করে বাঁশের তৈরি প্যারাসাইট বুষ্টারে সংরক্ষণ করতে পারে। এই পদ্ধতিতে ডগার মাজরা পোকার কীড়া ধ্বংস হবে কিন্তু উপকারী ডিমের উপর পরজীবি পোকা প্রকৃতিতে সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি পাবে।

৪। মথ সহজেই চোখে পড়ে ও ধরা যায়। সংগৃহীত মথগুলো মেরে ফেলতে হবে।

৫। আগের সারির দু'পাশে মাথা কেটে নালায় মার্চ ও এপ্রিলে প্রতিবার হেক্টর প্রতি ৪০ গ্রাম হারে ফুরাডান ৫জি অথবা কুরাটার ৫জি (২ কেজি এ.আই./হেক্টর) অথবা অন্যান্য অনুমোদিত কার্বোফুরান জাতীয় কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে সেচ দিতে হবে।

## আখের পাতা শোষক পোকা (Leaf hopper)

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Pyrilla perpusilla* W.
বর্গঃ হেমিপ্টেরা

এটি আখের প্রধান অনিষ্টকারী পোকাগুলির মধ্যে অন্যতম। এ পোকা নিম্ফ ও পূর্ণ বয়স্ক উভয় অবস্থাই আখ গাছ হতে রস শোষণ করে গাছের ক্ষতি করে।

**বর্ণনা ও জীবনচক্র**

পূর্ণাঙ্গ পোকা দেখতে বাদামী রংয়ের। এদের মাথায় একটি লম্বা রোস্ট্রাম থাকে যা সামনের দিকে বাড়ানো থাকে। স্ত্রী পোকার পিছনে তূলার ন্যায় বস্তু দেখা যায়। স্ত্রী পোকা পত্রখোলে গুচ্ছাকারে ডিম পাড়ে। ডিম গুলো ফ্যাকাসে সবুজাভ– হলুদ (Pale greenish-yellow) এবং সাদা রঙের সূতা

দ্বারা আবৃত থাকে। ডিম ফুটে দু'সপ্তাহ পরে নিম্ফ বের হয়। নিম্ফগুলো অত্যন্ত সক্রিয় থাকে এবং পাতার নিচে অবস্থান করে। এদের রং থাকে হালকা বাদামী । নিম্ফের পিছন দিকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত দু'টি লম্বা লেজের আকৃতির মোমাবৃত জিনিস থাকে। নিম্ফ অবস্থায় এরা ৫-৬ সপ্তাহ থাকে এবং এরপর পূর্ণাঙ্গ পোকায় পরিণত হয়। একবার জীবন চক্র শেষ করতে প্রায় দু'মাস সময় লাগে।

**ক্ষতির ধরন**

নিম্ফ ও পূর্ণ বয়স্ক পোকা পাতা হতে রস শোষণ করে খায়। পাতা হতে রস শোষণের ফলে পাতা ফ্যাকাশে বা হলুদ হয়ে যায় ও শুকিয়ে যায়। পাতা পুড়ে যাওয়ার মত দেখায়। এ ধরনের গাছকে নাড়া দিলে শত শত পোকা চারিদিকে লাগিয়ে পড়ে। এ পোকা আখের পাতায় মধু বিন্দু (Honey dew) নামক এক প্রকার মিষ্টি রস নিঃসরণ করে। ফলে আখের পাতায় সুটি মোল্ড ছত্রাক (Sooty mould fungus) নামক এক প্রকার ছত্রাক জন্মে। এতে পাতার রং কালো হয়ে যায় যা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বাধা দান করে। আক্রমণের মাত্রা অধিক হলে সুক্রোজের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস পেতে পারে।

আখের পাতা শোষক পোকা আখের পাতায় মধু বিন্দু নামক এক প্রকার মিষ্টি রস নিঃসরণ করে। ফলে আখের পাতায় সুটি মোল্ড ছত্রাক নামক এক প্রকার ছত্রাক জন্মে।

**প্রতিকার**

১। আখ কাটার পর অবশিষ্টাংশ এক সাথে জড়ো করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

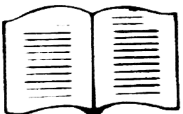
২। হাতজাল দ্বারা পুর্ণ বয়স্ক পোকাগুলোকে সংগ্রহ করে কেরোসিন পানিতে চুবিয়ে মেরে ফেলতে হবে। পোকা সংগ্রহের সর্বোত্তম সময় হলো ভোরবেলা অথবা বিকাল। সবচেয়ে ভালো হয় যদি এলাকার সমস্ত আখচাষী এ ব্যাপারে সম্মিলিত ভাবে উদ্যোগ নেয়।

৩। ডিমের গাদা সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে অথবা ছোট পাত্রে রেখে দিতে হবে পরজীবি পোকা বের হবার জন্য। এ সব ডিম হতে নিম্ফ বের হলে সংগে সংগে মেরে ফেলতে হবে।

৪। প্রতি গাছে ৫ অথবা ১০টির বেশি স্পী পোকা দেখা গেলে এপ্রিল হতে জুন পর্যন্ত প্রবহমান কীটনাশক এক অথবা দু'বার প্রয়োগ করতে হবে(১ পা. কীটনাশক/৫০ গ্যালন পানি)।



***অনুশীলন (Activity)ঃ** আখের প্রধান অনিষ্টকারী কয়েকটি পোকার নাম লিখুন। আপনার এলাকায় পাতাশোষক পোকার আক্রমণ কেমন হয়? কান্ডের মাজরা পোকার ক্ষতির নমুনা বর্ণনা করুন।*



**সারমর্মঃ** আখের প্রধান অনিষ্টকারী পোকা হিসাবে প্রায় ১০-১২ টি প্রজাতির পোকা পাওয়া যায়।

কান্ডের মাজরা পোকার কীড়া কান্ডের অভ্যন্তরে ঢুকে খায়। এরা আখ গাছের কান্ডের ভিতরে সুড়ঙ্গের সৃষ্টি করে। এ পোকার আক্রমণের ফলে আখ গাছের মাথা মরে যায়। ডগার সাদা মাজরা পোকার কীড়া আখ গাছের ২-৩ মাস বয়সেই আক্রমণ শুরু করে। এ পোকা পাতার মধ্য শিরা দিয়ে ভিতরে ঢুকে এবং আস্তে আস্তে নিচের দিকে যেতে থাকে। এ পোকার খাওয়ার ফলে গাছের কেন্দ্রের পাতাটি মরে যায়। আক্রান্ত গাছের সবচেয়ে উপরের পর্বসন্ধি হতে গুচ্ছাকারে শাখা প্রশাখা বের হয়। আখের পাতা শোষক পোকা নিম্ফ ও পুর্ণাঙ্গ অবস্থায় গাছের পাতা হতে রস শোষন করে খায়। এর ফলে পাতা হলুদ হয় এবং শুকিয়ে যায়। এরা গাছের পাতায় মধুবিন্দু নিঃসরণ করে। এর ফলে গাছের পাতা কালো হয়ে যায় এবং গাছের সালোকসংশ্লেষণ বাঁধার সৃষ্টি হয়।



## পাঠোত্তর মুল্যায়ন ৩.৫

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

ক. কোন্ পোকার আক্রমণে গাছের মাথা শুকিয়ে যায়?

i) কান্ডের মাজরা পোকা ii) ডগার সাদা মাজরা পোকা
iii) পাতা শোষক পোকা iv) চারার মাজরা পোকা

গ. ডগার সাদা মাজরা পোকার আক্রমণের ফলে গাছের কি ক্ষতি হয়?

i) গাছের কেন্দ্রের পাতাটি মরে যায় ii) পুরো গাছটি মরে যায়
iii)গাছের মাথা মরে যায় iv) গাছের পাতা ঝরে যায়

**২। সত্য হলে ‘‘স’’ এবং মিথ্যা হলে ‘‘মি’’ লিখুন।**

ক. আখের কান্ডের মাজরা পোকার শুক্রকীট কাল ৩০-৪০ দিন স্থায়ী হয়।
খ. আখের পাতা শোষক পোকার মাথায় একটা লম্বা রোষ্ট্রাম থাকে।

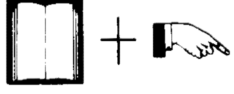
**৩। শ ন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. বাংলাদেশের .......... টি প্রজাতির পোকা আখের প্রধান অনিষ্টকারী হিসেবে বিবেচিত।
খ. কান্ডের মাজরা পোকার কীড়া গাছের ............মিটার নিচে একটি সুড়ঙ্গ তৈরি করে।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. কান্ডের মাজরা পোকা দমনের জন্য প্রতি হেক্টরে কত কেজি পাদান ১০ জি ব্যবহার করতে হবে?
খ. পাতা শোষক পোকার আক্রমণের ফলে আখের রসে সুক্রোজের পরিমাণ কত ভাগ হ্রাস পেতে পারে?

## পাঠ ৩.৬ ডাল ও তৈল ফসলের ক্ষতিকর পোকার বর্ণনা ও দমন



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- ছোলার ফল ছেদক পোকার জীবনচক্র, ক্ষতির ধরন ও দমন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- সরিষার জাবপোকার জীবনচক্র, ক্ষতির ধরন ও দমন সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- চীনাবাদামের শুয়াপোকার ক্ষতির ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- তিলের হক মথের জীবনচক্র, ক্ষতির ধরন এবং প্রতিকার বর্ণনা করতে পারবেন।



ডাল ও তৈলবীজ ফসল বাংলাদেশের অতি গুরুত্ব পূর্ণ দু'টি ফসল। ডাল আমাদের খাদ্য তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। তেমনিভাবে তৈলবীজ শস্যও আমাদের পুষ্টির জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশের ডাল ও তৈলবীজ ফসলে অনেক প্রজাতির পোকা আক্রমণ করে। পোকার আক্রমণে এ সব শস্যের ফলন বেশ কমে যায়। নিম্নে ডাল ও তৈল বীজ শস্যে আক্রমণকারী উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পোকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

### ছোলার ফল ছেদক পোকা (Gram pod borer)

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Helicoverpa armigera* (Hiibner)
বর্গঃ লেপিডোপ্টেরা

ছোলার ফল ছেদক পোকা বাংলাদেশে ছোলার প্রধান বা মুখ্য অনিষ্টকারী পোকা। এ পোকার কীড়া ছোলার দানা খেয়ে বিশেষ ক্ষতি সাধন করে। মুলতঃ এটি একটি বহুভোজী (Polyphagous) পতঙ্গ। ছোলা ছাড়াও এ পোকা টমেটো, তুলা ইত্যাদি ফসলে আক্রমণ করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ পোকাকে আমেরিকান বোল ওয়ার্ম (American boll worm) নামে অভিহিত করা হয়।

### বর্ণনা ও জীবনচক্র

পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় এ পোকা একটি মথ। পূর্ণাঙ্গ মথের রং হলুদ বাদামী। স্পী পোকা গাছের নরম অংশের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে একটি একটি করে ডিম পাড়ে। এরা ৪ দিনে ডিম পাড়া সম্পন্ন করে। একটি স্পী পোকা মোট ৭৪০টি পর্যন্ত ডিম পাড়তে পারে। ডিমের রং চকচকে সবুজ । ডিম ফুটে কীড়া বের হতে ৪-৫ দিন সময় লাগে। ডিম থেকে বের হবার পর কীড়া বা শূককীটগুলো গাছের নরম অংশ খেতে থাকে। শূককীট অবস্থায় এরা ২১ দিন কাটায় । কীড়াকাল শেষে এরা মাটিতে মূককীটে পরিণত হয়। মূককীটের রং গাঢ় বাদামী। প্রায় এক সপ্তাহ পর মূককীট থেকে পুর্ণাঙ্গ পোকা বেরিয়ে আসে। বৎসরে এ পোকা মোট ৮ টি প্রজন্ম তৈরি করতে পারে।

### ক্ষতির ধরন

ফলছেদক পোকা শূককীট বা কীড়া অবস্থায় ছোলার ক্ষতি করে থাকে। ছোলা ক্ষেতে সীম (Pod) হওয়ার পূর্বে এরা ছোলা গাছের পাতা খায় এবং কচি মুকুল ও ডগা খায়।

> ছোলার ফল ছেদক পোকা সীমের গায়ে ছিদ্র করে দেহের অর্ধেক বাইরে রেখে মাথাটা সীমের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে সীমের ভিতরের বীজ খেয়ে ফেলে।

এ পোকার আক্রমণে গাছ কোনো কোনো সময় পাতাশুন্য হয়ে পড়ে। গাছে সীম বা পড হওয়ার পর এরা সীমের অভ্যন্তরে বীজ খায়। ডিম থেকে বের হওয়ার পর কীড়াগুলো প্রথমে গাছের নরম অংশ খায় এবং পরে সীমে আক্রমণ করে। এরা সীমের গায়ে ছিদ্র করে দেহের অর্ধেক বাইরে রেখে মাথাটা সীমের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে সীমের ভিতরের বীজ খেয়ে ফেলে। একটি শূককীট পুর্ণাঙ্গ হওয়ার পূর্বে ৩০-৪০ টি পর্যন্ত সীম নষ্ট করতে পারে। এদের আক্রমণে ফলন বেশ কমে যায়। আক্রমণ ব্যাপক হলে ২০-২৫% সীম পোকা দ্বারা নষ্ট হতে পারে।

### প্রতিকার

১। এ পোকা দমনের জন্য ডায়াজিনন ৬০ ই,সি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫৭ ই,সি ০.০৫% হিসাবে স্প্রে করতে হবে।

## সরিষার জাবপোকা (Mustard aphid)

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Lipaphis erysimi* (Kalt.)
বর্গঃ হেমিপ্টেরা

জাবপোকা সরিষার একটি মারাত্নক অনষ্টিকারী পোকা। এ পোকার দ্বারা রস শোষণের ফলে গাছের মারাত্নক ক্ষতি হয় ও ফলন কমে যায়।

### বর্ণনা ও জীবনচক্র

এ পোকা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। পাখাওয়ালা এবং পাখাবিহীন-এ দু'ধরনের জাবপোকাই থাকতে পারে (চিত্র ৩.১৫)। এদের গায়ের রং হালকা হলুদ। এ পোকা



চিত্র ৩.১৫ সরিষার জাবপোকা (ক) পাখাবিহীন স্পী পোকা, (খ) পাখাওয়ালা স্পী পোকা, (গ) জাবপোকা সহ সরিষা গাছ (Alam, ১৯৬৫ থেকে নেয়া হয়েছে)।

অনুংজনিতভাবে (Parthenogeneticall) অর্থাৎ পুরুষ পোকার সাথে যৌনমিলন ছাড়াই বংশ বিস্তার করে। সরিষার ক্ষেত পাখাওয়ালা জাব পোকারা উড়ে এসে প্রথম আক্রমণ করে। একটি স্পী জাব পোকা ২৬-১৩৩টি নিম্ফের জন্ম দেয়। নিম্ফগুলো ৭-১০ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ জাব পোকায় পরিণত হয়। বৎসরে এরা ৪৫টি প্রজন্ম তৈরি করতে পারে।

### ক্ষতির ধরন

পূর্ণবয়স্ক জাবপোকা এবং নিম্ফ উভয়েই সরিষা গাছের বিভিন্ন অংশ যেমন, পাতা, কান্ড, পুস্পমঞ্জুরী এবং পড ইত্যাদি হতে রস শোষণ করে খায়। রস শোষণের ফলে গাছ দূর্বল হয়ে পড়ে। আক্রান্ত গাছের পাতা কুঁচকে যায় এবং বৃদ্ধি থেমে যায়। ফলে গাছ শুকিয়ে যায়। ফুল আসার সময় গাছ আক্রান্ত হলে আক্রান্ত গাছে পড হয় না। পডের ছোট অবস্থায় আক্রমণ হলে পডগুলো বাঁকা হয়ে যায়, কুঁচকে যায় এবং এসব পডে বীজ হয় না এবং পডগুলো শুকিয়ে যায়। অনেক সময়

পূর্ণবয়স্ক জাবপোকা এবং নিম্ফ উভয়েই সরিষা গাছের বিভিন্ন অংশ যেমন, পাতা, কান্ড, পুস্পমঞ্জুরী এবং পড ইত্যাদি হতে রস শোষণ করে

আক্রান্ত পডের বীজগুলো আকারে ছোট হয় এবং এগুলোতে তেলের পরিমাণ কম হয়। আক্রমণ ব্যাপক হলে এ পোকা দ্বারা সম্পর্ণ ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ভারতে এ পোকার আক্রমণে শতকরা ৯৬ ভাগ পর্যন্ত ফসল নষ্ট হতে পারে বলে রিপোর্ট পাওয়া যায়।

**প্রতিকার**

১। সরিষার বীজ আগাম বপন করলে এ পোকার আক্রমণ কমানো যায়।

২। আক্রান্ত জমিতে ডায়াজিনন ৬০ ইসি বা যিথিওল ৫৭ ইসি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৮-১০ মি. লি. হিসাবে মিশিয়ে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

**চীনা বাদামের শুয়া পোকা** (Ground nut hairy caterpillar)

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Spilosoma obliqua* (W.)

এ পোকা সম্বন্ধে ইউনিট-৩ এর পাঠ ৩.৪ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এটি একটি বহুভোজী পতঙ্গ। এরা চীনা বাদামেরও ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। এখানে শুধু চীনা বাদামের কি ধরনের ক্ষতি করে তাই আলোচনা করা হলো।

**ক্ষতির ধরন**

চীনা বাদামের শুয়া পোকা পোকার শূককীট চীনা বাদাম গাছের পাতা খেয়ে নষ্ট করে।

অত্যন্ত চারা অবস্থায় এরা চীনাবাদাম গাছের ক্ষতি করে।

এ পোকার শূককীট চীনা বাদাম গাছের পাতা খেয়ে নষ্ট করে। অত্যন্ত চারা অবস্থায় এরা চীনাবাদাম গাছের ক্ষতি করে। বীজ থেকে চারা বের হবার ১০-১৫ দিনের মধ্যেই এরা বাদাম গাছে আক্রমণ করে এবং পাতা খায়। ক্ষতির প্রকৃতি পাট গাছের অনুরূপ। আক্রমণ ব্যাপক হলে ডগা পর্যন্ত খেয়ে ফেলে । এদের আক্রমণের ফলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায় এবং ফলন কম হয়।

**প্রতিকার**

ইউনিট ৩.৪ এ দেয়া দমন ব্যবস্থা অনুরূপ।

**তিলের হক মথ (Till hawk moth)**

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Acherontia styx* Westwood

বর্গঃ লেডিপোপ্টেরা

বাংলাদেশের এটি তিলের একটি প্রধান অনষ্টিকারী পতঙ্গ হিসাবে বিবেচিত।

**বর্ণনা জীবনচক্র**

শূককীটের এবং মথের রং পরি-বর্তন হয় বলে পরভোজী প্রাণী সহজে দেখতে পায় না।

পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এটি একটি মথ। মথ আকারে বেশ বড় এবং রং লালচে বাদামী। সামনের পাখা জোড়া বাদামী রঙের। সামনের পাখায় গাঢ় অথবা কালো রঙের ঢেউ খেলানো চিহ্ন থাকে (চিত্র ৩.১৬)। স্ত্রী মথ পাতার উল্টোদিকে একটি একটি করে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা বের হতে ২-৫ দিন সময় লাগে। শূককীট গুলো প্রথমবস্থায় ফ্যাকাশে হলুদ হয়। শূককীটকাল গ্রীষ্মকালে ২-৩ সপ্তাহ এবং শীতকালে প্রায় সাত সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। শূককীটের এবং মথের রং পরিবর্তন হয় বলে পরভোজী প্রাণী সহজে এদের দেখতে পায় না। এরা বছরে তিনবার বংশ বিস্তার করে। শীতকালটা মূককীট অবস্থায় মাটিতে থেকে অতিবাহিত করে এবং পরবর্তী বছরে নতুন করে আক্রমণ শুরু হয়।



চিত্র ৩.১৬ তিলের হক মথ-(ক) শূককীট, (খ) শূককীট পাতা খাচ্ছে, (গ) পূর্ণ বয়স্ক মথ (Alam, ১৯৬৫ থেকে নেয়া হয়েছে)।

**ক্ষতির ধরন**

এ পোকার শূককীট অত্যন্ত  পেটুক (Voracious) স্বভাবের। এরা তিল গাছের পাতা খায়। ফলে গাছ পাতা শুন্য হয়ে যায়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এদের আক্রমণ মারাত্বক আকার ধারন করতে পারে।

**প্রতিকার**

১। আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় হাত দিয়ে ডিম বা শুককীট সংগ্রহ করে মেরে ফেললে  এদের সংখ্যা কমানো যায়।

২। ফসল সংগ্রহের পর জমিতে ভালোভাবে চাষ দিতে হবে। এর ফলে মাটিতে থাকা মূককীট উপরে চলে আসে এবং বিভিন্ন পাখী এদের খেয়ে নষ্ট করে।

৩। প্রতি হেক্টর জমিতে ১২-১৫ মি. লি. ডায়াজিনন ৬০ ইসি অথবা সুমিথিয়ন ৫০ ইসি ৫৭০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় হাত দিয়ে ডিম বা শুককীট সংগ্রহ করে মেরে ফেললে পোকার সংখ্যা কমানো যায়।

***অনুশীলন* (Activity)ঃ ডাল ও সরিষার একটি করে অনিষ্টকারী পোকার নাম লিখুন। আপনার এলাকার জাবপোকার আক্রমণ কেমন হয়? ছোলার ফল ছেদক পোকা ও সরিষার জাবপোকার ক্ষতির ধরন বর্ণনা করুন।**



**সারমর্মঃ** ছোলার ফলছেদক পোকা বাংলাদেশে একটি মূখ্য অনিষ্টকারী পোকা হিসাবে বিবেচিত। গাছের ফল ধরার পুর্বে পোকার কীড়া গাছের পাতা খায়। এরা ছোলার পড ছিদ্র করে ভিতর থেকে বীজ খেয়ে নষ্ট করে। এর ফলে ছোলার ফলন কমে যায়। আক্রমণ ব্যাপক হলে এ পোকা দ্বারা ২০-২৫% পড ধ্বংস হতে পারে। জাব পোকা সরিষার একটি মারাত্বক ক্ষতিকারক পোকা। এ পোকা নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় সরিষার পাতা, কান্ড, পড ইত্যাদি হতে রস শোষণ করে খায়। এ পোকার আক্রমণে  জমির ফসল সম্পর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। তিলের অনিষ্টকারী পোকাদের মধ্যে তিল হক মথ অন্যতম। এ পোকার কীড়া  গাছের পাতা খেয়ে গাছকে পাতাশুন্য করে ফেলতে পারে।



## পাঠোত্তর মুল্যায়ন ৩.৬

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

ক. ছোলার ফলছেদক পোকা গাছে সীম বা পড হওয়ার পর কী খায়?

i) গাছের পাতা
ii) গাছের ডগা
iii) গাছের কচিঁপাতা ও ডগা
iv) ছোলার বীজ

খ. সরিষার জাবপোকা কীভাবে গাছের ক্ষতি করে?

i) সরিষা গাছের পাতা খেয়ে
ii) সরিষা গাছের গোড়া কেটে দিয়ে
iii) গাছের বিভিন্ন অংশ হতে রস শোষন করে
iv) গাছের ফুল খেয়ে

**২। সত্য হলে ‘‘স’’ এবং মিথ্যা হলে ‘‘মি’’ লিখুন।**

ক. ছোলার ফল ছেদক পোকা একটি বহুভোজী পতঙ্গ।
খ. সরিষার জাবপোকা শুধুমাত্র পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় গাছের রস শোষণ করে।

**৩। শুন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. তিলের হক মথ মুককীট কাল ............ কাটায়।
খ. জাবপোকা............... ভাবে বংশ বিস্তার করে।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. কোন্ পোকাকে আমেরিকান বল ওয়ার্ম বলে?

খ. জাবপোকার নিম্ফ কতদিনে পূর্ণাঙ্গ জাবপোকায় পরিণত হয়?

# ব্যবহারিক

## পাঠ ৩.৭ ধানের ক্ষতিকর পোকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- ধানের প্রধান ক্ষতিকারক কয়েকটি পোকা, যেমন- মাজরা পোকা, পামরী পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং, গান্ধী পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা এবং বাদামী গাছ ফড়িং সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
- ধানের জমি থেকে ঐ সব পোকা সংগ্রহ করতে পারবেন।
- ধানের ক্ষতিকর ঐ সব পোকা শনাক্ত করতে পারবেন।
- উপরোল্লিখিত পোকাগুলো সংরক্ষণের জন্য প্রযোজনীয় জিনিষপত্রের তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
- এসব পোকা সংরক্ষণ করতে পারবেন।



### ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ সংগ্রহের কারণ

কীটপতঙ্গ আমাদের ধান ফসলের প্রভূত ক্ষতি করে থাকে। এসব পোকা দমন করতে হলে এদেরকে সঠিকভাবে শনাক্ত করে সংরক্ষণ করতে হবে। পোকা সঠিকভাবে শনাক্ত করতে না পারলে অনেক সময় সঠিক দমন ব্যবস্থা নেয়া যায় না বা সঠিক কীটনাশক প্রয়োগ করা যায় না।

### কীটপতঙ্গ সংগ্রহের উপকরণ সমূহ

১। হাতজাল (Hand net)

২। কিলিং জার (Killing jar)

৩। পেট্রিডিস (Petridish) অথবা ছোট প্লাস্টিক কৌটা



চিত্র ৩.১৭ (ক) হাতজাল তৈরির পদ্ধতি, (খ) কিলিং জার, (গ) হাতজাল

৪। ছুরি (Knite)

৫। তূলি

৬। কেচার (Catcher)

৭। সাকসান সংগ্রাহক (Suction collector)

**কীভাবে মাঠ থেকে পোকা সংগ্রহ করবেন**

**কাজের ধাপ**

ধানের পোকা সংগ্রহ করতে হলে আপনাকে প্রয়োজনীয় উপকরণসহ মাঠে যেতে হবে। কী পোকা সংগ্রহ করবেন সে অনুযায়ী আপনাকে অগ্রসর হতে হবে। ধানের সবপোকা একই পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। ধানের মাজরা পোকার মথ আলোতে আকৃষ্ট হয়। এ পোকা সংগ্রহের জন্য মাঠে আলোর ফাঁদ ব্যবহার করুন। আলোর ফাঁদ হিসাবে হ্যাজাক ব্যবহার  করা যেতে পারে। অনেক সময় ধান ক্ষেতের পাশে লাইট পোষ্ট থাকে। সন্ধ্যাবেলায় লাইটপোষ্টের নিচে খোঁজ করলে মাজরা পোকা পাবেন। মথ পেলে সেটিকে কিলিং জারে রাখুন। এ পোকার কীড়া সংগ্রহের জন্য জমিতে মাজরা পোকার ক্ষতি (মরাডিগ বা সাদা শীষ) শনাক্ত করুন। মরাডিগ ধরে টান দিলে সেটি উঠে আসবে। মরাডিগের গোড়ায় মাজরা পোকার কীড়া থাকে। মরাডিগকে হাত দিয়ে চিঁড়ে ফেলুন। মাজরা পোকার কীড়া পেয়ে যাবেন। অথবা মাঠ থেকে মরাডিগযুক্ত কয়েকটি গাছ সংগ্রহ করুন। মরাডিগগুলোকে ছুরি দিয়ে সাবধানে লম্বালম্বিভাবে চিঁড়ে ফেলুন। ভিতরে মাজরা পোকার শূককীট পাবেন। সংগ্রহ করার পর কীড়াকে একটি পেট্রিডিসে রাখুন।

পামরী পোকা সংগ্রহের জন্য পামরী পোকা দ্বারা আক্রান্ত জমিতে যেতে হবে। সেখানে হাতজাল দিলে ঝবিবঢ় করে পূর্ণবয়স্ক পোকা সংগ্রহ করুন। সংগৃহীত পোকাকে কিলিং জারে রাখুন। আক্রান্ত পাতার ভিতরে এ পোকার গ্রাব থাকে। আক্রান্ত কয়েকটি পাতা চিড়ে তার ভিতর থেকে গ্রাব সংগ্রহ করুন। লেদা পোকা সংগ্রহ করার জন্য মাটিতে অথবা গাছের আড়ালে খোঁজ করুন। সংগৃহীত শূককীটকে পোট্রিডিস বা অন্য কোনো কৌটায় রাখুন।

হাতজাল দিয়ে সুইপিং (Sweeping) করে সবুজ পাতা ফড়িং, গান্ধী পোকা এবং অন্যান্য পোকার মথ সংগ্রহ করুন এবং কিলিং জারে রাখুন। পেঁয়াজ পাতা বিশিষ্ট গাছ চিড়ে তার ভিতর থেকে গল মাছির কীড়া সংগ্রহ করুন। সবুজ পাতা ফড়িং, বাদামী গাছ ফড়িং ইত্যাদির নিম্ফ সাকশান সংগ্রাহক দিয়ে ধরা সহজ।

পাতা মোড়ানো পোকার শূককীট সংগ্রহ করতে হলে এ পোকা দ্বারা মোড়ানো পাতা  সংগ্রহ করুন। তারপর পাতার ভিতর থেকে শূককীট সংগ্রহ করুন।

গাছের গোড়ার দিকে খোঁজ করলে বাদামী গাছ ফড়িং পাওয়া যাবে। বাদামী গাছ ফড়িংকে সাকশান সংগ্রাহক দ্বারা সংগ্রহ করে প্রেট্রিডিসে রাখুন।

**পোকা শনাক্তকরণ।**

সংগৃহীত পোকা গুলোকে বইয়ে দেয়া বর্ণনার সাথে মিলিয়ে কোন্‌টি কী পোকা তা শনাক্ত করুন।

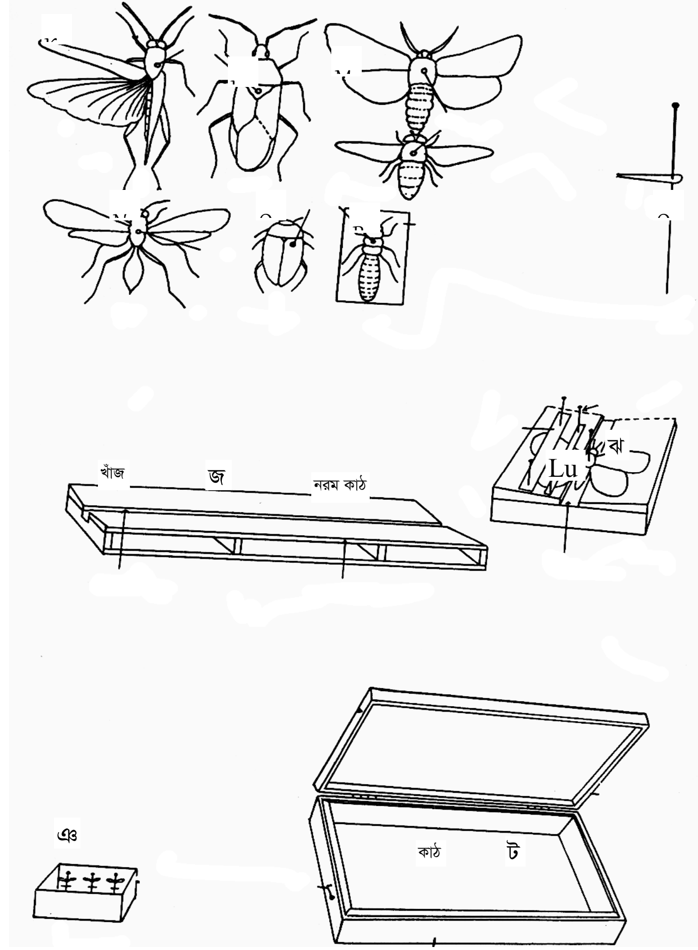
**সংগৃহীত পোকা সংরক্ষণ পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ**

১। ষ্ট্রেচিং বোর্ড (Stretching boord)



২। পিন বোর্ড (Pin boord)

৩। একটি কাঠের বাক্স (আকার 2"x 5"x 9"x 13")




চিত্র ৩.১৮ পোকা সংরক্ষণের উপকরণ সমূহ (ক-চ) পোকা পিনে গাঁথার পদ্ধতি, (ছ) পেপার কোণ ও পিন, (জ ও ঝ) স্ট্রেচিং বোর্ড, (ঞ) পিনে গাঁথা পোকা, (ট) কাঠের বাক্স।

৪। পিন

৫। অ্যালকোহল

৬। নেফথালিন বল

৭। কাগজের ট্যাগ বা লেবেল

৮। কর্কযুক্ত শিশি (Vial)

৯। ত্রিকোণাকৃতির কাগজ (ছোট ছোট পোকা সংরক্ষনের জন্য)

**কাজের ধাপ**

১। শূককীট ও নরম পোকাগুলোকে ৯৫% অ্যালকোহলে শিশির মধ্যে সংরক্ষণ করুন।

২। শক্ত এবং পূর্ণাঙ্গ পোকাকে পিন দিয়ে গেঁথে কাঠের বাক্সের ভিতরে রাখুন। কাঠের বাক্সের তলা কর্কযুক্ত হবে।

৩। মথ এবং প্রজাপতিকে সংরক্ষণের পূর্বে তাদের পাখাগুলোকে স্ট্রেচিং বোর্ডের মাধ্যমে ছড়িয়ে নিতে হবে।

৪। তারপর পোকাগুলোকে পিন দিয়ে আটকিয়ে বাক্সের মধ্যে রেখে দিন।

৫। প্রত্যেক পোকার সাথে একটি ট্যাগ দিন।

৬। বাক্সের এক কোণে কয়েকটি নেফথালিন বল রেখে দিন।

৮। একই বর্গের পোকাকে এক সাথে রাখুন।

৯। বাক্সটির মুখ বন্ধ করে দিন।

**লেবেল ঃ**

লেবেলের নমুনা ও আকার

| | |
|---|---|
| সংগ্রহের তারিখ | ঃ |
| স্থান | ঃ |
| কী শস্য হতে | ঃ |
| সংগৃহীত হয়েছে | ঃ |
| সংগ্রহকারীর নাম | ঃ |

পোকার বৈজ্ঞানিক নাম একটি আলাদা লেবেল দেয়া যেতে পারে।

## কিলিং জার তৈরি ঃ

**কিলিং জার তৈরির জন্য উপকরণ সমূহ ঃ**

১। সোডিয়াম সায়ানাইড অথবা পটাশিয়াম সায়ানাইড

২। একটি বায়ুরোধী পাত্র

৩। করাতের গুড়া

৪। প্লাষ্টার অব পেরিস

## তৈরির পদ্ধতি

একটি বায়ুরোধী পাত্রে সামান্য পরিমাণ পটাশিয়াম অথবা সোডিয়াম সায়ানাইড রাখুন। এরপর তার উপরে করাতের গুড়া দিন। করাতের গুড়ার উপরে প্লাষ্টার অব পেরিস গরম করে ঢেলে দিন। ঠান্ডা হওয়ার পর প্লাষ্টার অব পেরিসে সূঁচ দিয়ে কয়েকটি ছিদ্র করে দিন। প্লাষ্টার অব পেরিসের উপরে একটি ফিল্টার পেপার সাইজ মত কেটে বসিয়ে দিন।

**পোকা পিন দিয়ে গাঁথার পদ্ধতি ঃ**

১। লেপিডোপ্টেরা, অর্থোপ্টেরা ও ডিপ্টেরা ঃ মধ্যবক্ষে

২। হেমিপ্টেরা ঃ প্রোনোটামে

৩। কলিওপ্টেরা ঃ ডান পাশের ইলাইট্রোতে

**সাবধানতা**

১। সোডিয়াম সায়ানাইড বা পটাশিয়াম সায়ানাইড খুব মারাত্বক বিষ। এগুলো নিয়ে নাড়া চাড়া করার সময় খুব সাবধানে থাকতে হবে। কোনোক্রমেই যেন এগুলো শরীরের সংস্পের্শে না আসে। এ সব দ্রব্যের গন্ধ শুঁকা নিষেধ।

২। পোকার শরীরের কোনো অংশ যাতে ভেঙ্গে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৩। কিলিং জার নিরাপদ জায়গায় এবং শিশুদের বা অন্যান্য লোকের নাগালের বাইরে রাখতে হবে। বাড়ীতে এগুলো না রাখাই শ্রেয়।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক পোকা ও নরম দেহ সম্পন্ন পোকাকে ৯৫% অ্যালকোহলে সংরক্ষণ করার পূর্বে অন্য একটি দ্রবনে দিয়ে মেরে ফেলতে হবে। তারপর তাকে আসল তরলে সংরক্ষণ করতে হবে। দ্রবনটি নিম্নরূপ ঃ

| | |
|---|---|
| কেরোসিন | ১ ভাগ |
| ৯৫% ইথাইল অ্যালকোহল | ১০ ভাগ |
| অ্যাসেটিক এসিড (গ্লাসিয়েল) | ২ ভাগ |

অথবা, জাইলিন এবং ৯৫% ইথাইল অ্যালকোহল ১ঃ১ অনুপাত।

## পাঠ ৩.৮ পাটের প্রধান প্রধান পোকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- পাটের বিছা পোকা, ঘোড়া পোকা এবং চেলে পোকা সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
- উপরোল্লিখিত পোকাগুলোকে সংগ্রহ করতে পারবেন।
- ঐ সব পোকা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
- উপরোল্লিখিত পোকাগুলোকে সংরক্ষণ করতে পারবেন।



### ক. পাটের ক্ষতিকর পোকা সংগ্রহের কারণ

পাটের পোকা সংগ্রহের মাধ্যমে আপনি পাটের পোকা চিনতে বা শনাক্ত করতে সমর্থ হবেন। এতে পাটের ক্ষতিকর পোকা দমনে সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারবেন।

### পোকা সংগ্রহের উপকরণ সমূহ

১। হাতজাল

২। কিলিং জার

৩। পেট্রিডিস

৪। ছুরি

৫। দস্তানা (Gloves)

### কীভাবে মাঠ থেকে পোকা সংগ্রহ করবেন

#### কাজের ধাপ

পাটের পোকা সংগ্রহের জন্য আপনাকে পোকা দ্বারা আক্রান্ত মাঠে যেতে হবে।
পাটের বিছাপোকার মথ আলোতে আকৃষ্ট হয়। তাই আলোর ফাঁদ পেতে রাতের বেলা এদের ধরতে পারবেন। ধরার পর কিলিং জারে রেখে এদের মেরে ফেলুন। বিছাপোকার কীড়া যখন দলবদ্ধ অবস্থায় একটি পাতায় অবস্থান করে তখন গাছের পাতাসহ উঠিয়ে নিয়ে আসুন। তারপর একটি পাত্রে বা পেট্রিডিসে রেখে দিন। কীড়াগুলো যখন সারা মাঠে ছড়িয়ে পড়ে তখন এদের হাত দিয়ে ধরতে পারেন। খালি হাত দিয়ে ধরতে না চাইলে হাতে দস্তানা ব্যবহার করতে পারেন। ধরে এদেরকে একটি কৌটায় রাখুন।

পাটের ঘোড়া পোকার মথ সুইপিং এর মাধ্যমে ধরতে পারেন। ঘোড়া পোকার কীড়া ধরার জন্য পাটগাছের আগার পাতাগুলোর দিকে ভালোভাবে লক্ষ্য করতে হবে। সবুজ রংয়ের কীড়া, যারা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে এদের দেখা মাত্রই ধরে ফেলুন। এরপর একটি পাত্রে বা পেট্রিডিসে করে ল্যাবটেরিতে নিয়ে আসুন।

পূর্ণ বয়স্ক চেলে পোকা হাতজাল দিয়ে ধরা যায়। এদেরকে পাতার উপরে বা নিচে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। ধরার পর কিলিং জারে রেখে দিয়ে মেরে ফেলুন। চেলে পোকা পাট গাছ কাটা পর্যন্তমাঠে থাকে। তাই এদের ধরার জন্য বেশ লম্বা সময় পাওয়া যায়।

চেলে পোকার কীড়া সংগ্রহ করার জন্য আক্রান্ত কয়েকটি পাট গাছ বেছে নিন। তারপর এগুলোকে লম্বালম্বি ভাবে চিড়ে ফেলুন। এর ভিতরে চেলে পোকার গ্রাব পেয়ে যাবেন। এভাবে কয়েকটি গ্রাব সংগ্রহ করুন।

**পোকা শনাক্তকরণ**
ইউনিট ৩.৪ এ দেয়া পাটের পোকার বর্ণনার সাথে মিলিয়ে এদেরকে শনাক্ত করুন।

খ) সংগৃহীত পোকা সংরক্ষণ পদ্ধতি

সংরক্ষণের উপকরণ সম হ ঃ
ইউনিট ৩.৭ এ দেয়া ধানের পোকার অনুরূপ।

**কাজের ধাপ**
ইউনিট ৩.৭ এ দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী কীড়াগুলোকে অ্যালকোহলে এবং পূর্ণ বয়স্ক পোকাগুলোকে কাঠের বাক্সে সংরক্ষণ করুন। পোকার কীড়াকে সংরক্ষণ করার পূর্বে অন্য একটি দ্রবনে দিয়ে মেরে ফেলতে হবে।

**সাবধানতা**
ইউনিট ৩.৭ এর অনুরূপ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

## পাঠ ৩.৯ আখের প্রধান প্রধান পোকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- আখের কান্ডের মাজরা পোকা, ডগার সাদা মাজরা পোকা এবং আখের পাতা শোষক পোকা সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
- ঐ সব পোকা সংগ্রহ করতে পারবেন।
- উপরোল্লিখিত পোকাগুলো সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
- ঐ সব পোকা সংরক্ষণ করতে পারবেন।



### ক. আখের ক্ষতিকর পোকা সংগ্রহের কারণ

আখের পোকা সংগ্রহের মাধ্যমে আপনি আখ গাছের পক্ষে অনিষ্টকর কয়েকটি প্রধান প্রধান পোকা শনাক্ত করতে পারবেন। এতে আখ গাছের ক্ষতিকর পোকা দমনে সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ আপনার পক্ষে সহজ হবে।

### পোকা সংগ্রহের উপকরণ সমূহ ঃ

১। কিলিং জার
২। হাতজাল
৩। পেট্রিডিস
৪। ছুরি

### সংগ্রহ পদ্ধতি

**কাজের ধাপ**

আখের পক্ষে ক্ষতিকর পোকা সংগ্রহের জন্য আপনাকে প্রয়োজনীয় উপকরণসহ আখের জমিতে যেতে হবে। আপনি কোন্ পোকা সংগ্রহ করবেন সে অনুযায়ী মাঠে উপযুক্ত ক্ষতির নমূনা খুঁজতে থাকুন। আখের কান্ডের মাজরা পোকার মথ আলোতে আসে। এদেরকে রাতের বেলা আলোতে সংগ্রহ করে কিলিং জারে রেখে মেরে ফেলুন। মাঠ থেকে হাত জালের মাধ্যমে আপনি মথ সংগ্রহ করে কিলিং জারে রাখুন। সুইপিং এর সাহায্যে আপনি বিভিন্ন প্রকার মথ সংগ্রহ করতে পারেন।

কান্ডের মাজরা পোকার কীড়া সংগ্রহের জন্য আপনি এ পোকা দ্বারা আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করুন। যে সব গাছের আগা মরে গিয়েছে সে সব গাছ সংগ্রহ করুন। তারপর সেগুলিকে চিড়ে তার ভিতর থেকে শূককীট সংগ্রহ করুন এবং পেট্রিডিস বা অন্যকোনো পাত্রে রেখে দিন এবং গবেষণাগারে নিয়ে আসুন।

আক্রান্ত গাছের মাথা হতে গুচ্ছাকারে অসংখ্য শাখা প্রশাখা বের হয়।

ডগার সাদা মাজরা পোকার কীড়া সংগ্রহের জন্য কয়েকটি আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করুন। এ পোকার দ্বারা আক্রান্ত গাছ আপনি সহজেই চিনতে পারবেন। আক্রান্তগাছের মাথা হতে গুচ্ছাকারে অসংখ্য শাখা প্রশাখা বের হয়। এ রকম দেখে কয়েকটি গাছ সংগ্রহ করে তার ভিতর থেকে পোকা বের করে আনুন।

আখের পাতা শোষক পোকা আখ পাতার নিচের দিকে থাকে। হাতজাল দ্বারা সুইপিং (Sweeping) করে আপনি অতি সহজেই এ পোকা সংগ্রহ করতে পারেন। সংগৃহীত পোকার নিম্ফকে আলাদা করে একটি পেট্রিডিসে রাখুন। পূর্ণ বয়স্ক পোকাগুলোকে ফিলিং জারে রেখে দিন।

**পোকা শনাক্তকরণ**

সংগৃহীত পোকাগুলোকে বইয়ের বর্ণনার সাথে মিলিয়ে শনাক্ত করুন।

খ. সংগৃহীত পোকা সংরক্ষণ পদ্ধতি

**পোকা সংরক্ষণের উপকরণ সমূহ**

পাঠ ৩.৭ এ বর্ণিত উপকরণগুলোই এখানে ব্যবহার করতে হবে। আখের পোকা সংরক্ষণের জন্য হুবহু একই পদ্ধতি অনুসরণ করুন। আগের মতই লেবেল ব্যবহার করুন এবং যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করুন। প্রত্যেক শস্যের পোকার জন্য আলাদা আলাদা কিলিং জারের দরকার নেই। একটি কিলিং জার হলেই সব ধরনের পোকা মারা যায়।

সারণি ৩ ঃ ধানের প্রধান প্রধান পোকা মাকড় দমনের জন্য কীটনাশকের নাম ও প্রয়োগ মাত্রা।

| কীটনাশকের বাণিজ্যিক নাম | প্রয়োগ মাত্রা প্রতি হেক্টরে |
|---|---|
| **মাজরা পোকা ও গলমাছি** | |
| বাইড্রিন ৮৫ তরল | ৮৪০ মি. লি. |
| ডাইমেক্রন ১০০ তরল | ৮৪০ মি. লি. |
| ডায়াজিনন ৬০০ তরল | ১.৬৮ লিটার |
| ডায়াজিনন ১৪ দানাদার | ১৩.৫ কেজি |
| বাসুডিন ১০ দানাদার | ১৬.৮ কেজি |
| এলসান ৫০ তরল | ১.৬৮ লিটার |
| লিবাসিড ৫০ তরল | ১.১২ লিটার |
| সুমিথিয়ন ৫০ তরল | ১.১২ লিটার |
| পাদান ৫০ গুড়া | ১.৪ কেজি |
| পাদান ১০ দানাদার | ১৬.৮ কেজি |
| এজোড্রিন ৪০ তরল | ১.৬৮ কেজি |
| ফুরাডান ৩ দানাদার | ১৬.৮ কেজি |
| কিউরেটার ৩ দানাদার | ১৬.৮ কেজি |
| ইকালাক্স ৫ দানাদার | ১৬.৮ কেজি |

| কীটনাশকের বাণিজ্যিক নাম | প্রয়োগমাত্রা প্রতি হেক্টরে |
|---|---|
| **বাদামী গাছ ফড়িং ও সাদাপিঠ গাছ ফড়িং** | |
| ডায়াজিনন ১৪ দানাদার | ১৫ কেজি |
| বাসুডিন ১০ দানাদার | ২০ কেজি |
| ডায়াজিনন ৬০ তরল | ২ লিটার |
| ফুরাডান ৩ দানাদার | ২০ কেজি |
| ডাইমেক্রন ১০০ তরল | ১ লিটার |
| লিবাসিড ৫০ তরল | ২ লিটার |
| সুমিথিয়ন ৫০ তরল | ২ লিটার |
| নগোস ১০০ তরল | ১ লিটার |
| বাইড্রিন ২৪ তরল | ১.২ লিটার |
| কারবিক্রন ৫০ তরল | ১.৬৮ লিটার |
| এজোড্রিন ৪০ তরল | ১.৬৮ লিটার |
| রিপকর্ড ১০ তরল | ৫৬০ মি .লি |
| মিপসিন ৭৫ পাউডার | ১.৬৮ কেজি |
| **লেদা পোকা** | |
| ডিডিভিপি ১০০ তরল | ৫৬০ মি. লি. |
| ডাইক্লোরোভস ১০০ তরল | ” |
| নগোস ১০০ তরল | ” |
| ভেপোনা ১০০ তরল | ” |
| সেভিন ৮৫ পাউডার | ১.৬৮ কেজি |

| কীটনাশকের বাণিজ্যিক নাম | প্রয়োগ মাত্রা প্রতি হেক্টরে |
|---|---|
| **পামরী পোকা, পাতার মোড়ানো, সবুজ পাতা ফড়িং, এবং গান্ধী পোকা** | |
| ম্যালাথিয়ন ৫৭ তরল | ১.১২ লিটার |
| যিথিওল ৫৭ তরল | ১.১২ লিটার |
| ফ্যাইকেনন ৫৭ তরল | ১.১২ লিটার |
| এরুমেল ৫৭ তরল | ১.১২ লিটার |
| সুমিথিয়ন ৫০ তরল | ১.১২ লিটার |
| পারফেকথিয়ন ৪০ তরল | ১.১২ লিটার |
| রকসিয়ন ২৫ তরল | ১.৬৮ লিটার |
| সেভিন ৮৫ পাউডার | ১.৬৮ কেজি |
| নাফটিল ৮৫ পাউডার | ১.৬৮ কেজি |

**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ** তরল ও পাউডার জাতীয় কীটনাশক গুলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী ৬০০ থেকে ১২০০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ভালোভাবে স্প্রে মেশিন দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। বাদামী গাছফড়িং এর জন্য গাছের গোড়ার দিকে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। দানাদার কীটনাশক সারের মত ছিটিয়ে দিতে হবে। দানাদার কীটনাশক ব্যবহার করতে হলে জমিতে ২-৪′′ পানি ৫-৭ দিন আটকে রাখতে হবে। ক্ষেতের পানি যেন উপচে চলে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

১ হেক্টর - প্রায় ৭.৫ বিঘা (২৪৭ শতাংশ)।
এক পূর্ণ চা চামচ = ৫ মিলি



## চূড়ান্ত মূল্যায়ন– ইউনিট ৩

**সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন।**

১। ধানের মাজরা পোকা কাকে বলে? বাংলাদেশে পাওয়া যায় এমন ৪টি মাজরা পোকার নাম লিখুন। সাদা মাজরা পোকার জীবন চক্র বর্ণনা করুন।

২। পামরী পোকার বৈজ্ঞানিক নাম কী? ধান গাছে পামরী পোকার ক্ষতির ধরন বর্ণনা করুন।

৩। ধানের লেদা পোকা কোন্ ধরনের জমিতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়? লেদা পোকা দমনের উপায় লিখুন।

৪। ফড়িং পোড়া কাকে বলে? বাদামী গাছ ফড়িং এর জীবন চক্র আলোচনা করুন।

৫। সবুজ পাতা ফড়িং কীভাবে গাছের ক্ষতি করে? এ পোকার ক্ষতির ধরন আলোচনা করুন।

৬। পেঁয়াজ পাতা গল কী? কোন্ পোকার আক্রমণে ধান গাছে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়? পেঁয়াজপাতা গল হলে গাছের কী ক্ষতি হয়?

৭। পাতা মোড়ানো পোকা পাতার কোন্ অংশ খায়? এ পোকার ক্ষতির ধরন সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৮। গান্ধী পোকা ধানের কোন্ অবস্থায় আক্রমণ করে। এ পোকার আক্রমণ হলে ধানের কী ক্ষতি হয়?

৯। বিছাপোকা পাট গাছের কী ক্ষতি করে? এ পোকা দমনের উপায়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১০। চেলে পোকার কীড়া গাছের কোন্ অংশ খায়? চেলে পোকার দ্বারা পাট গাছের ক্ষতির ধরন বর্ণনা করুন।

১১। পাটের ঘোড়া পোকার বৈজ্ঞানিক নাম কী? এ পোকা কীভাবে দমন করা যায় তা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১২। আখের অনিষ্টকারী ৪টি পোকার নাম লিখুন। ডগার সাদা মাজরা পোকার জীবন চক্র বর্ণনা করুন

১৩। কান্ডের মাজরা পোকা কী অবস্থায় গাছের ক্ষতি করে? এ পোকা দমনের উপায় গুলো লিখুন।

১৪। আখের পাতা শোষক পোকার ক্ষতির নম না বর্ণনা করুন।

১৫। ছোলার ফল ছেদক পোকার বৈজ্ঞানিক নাম কী? এ পোকার জীবন চক্র আলোচনা করুন।

১৬। সরিষার জাবপোকা কীভাবে গাছের ক্ষতি করে? এ পোকা আক্রমনের ফলে যে ধরনের ক্ষতি হয় তা বর্ণনা করুন।

১৭। তিলের হক মথ গাছের কোন্ অংশ খায়। এর জীবনচক্র আলোচনা করুন।

১৮। তিলের হক মথ প্রতিকারের উপায়গুলো লিখুন।



## উত্তরমালা– ইউনিট ৩

### পাঠ ৩.১

১। ক. iv খ. ii
২। ক. মি খ. মি
৩। ক. ১৭৫টি খ. ২০-৬০টি
৪। ক. মরাডিগ খ. জলাবদ্ধ জমি

### পাঠ ৩.২

১। ক. ii খ. iii
২। ক. স খ. মি
৩। ক. পাতামোড়ানো খ. দুধ

### পাঠ ৩.৩

১। ক. i খ. i
২। ক. মি খ. স
৩। ক. বোরো, রোপা আমন খ. শক্তি
৪। ক. ১০০ ভাগ খ. শুষ্ক ও গরম

### পাঠ ৩.৪

১। ক. ii খ. ii
২। ক. স খ. স
৩। ক. বিছাপোকার খ. × বটম (ক্রস বটম)
৪। ক. পাটের ঘোড়া পোকা খ. বিছা পোকার শুককীট

### পাঠ ৩.৫

১। ক. i খ. i
২। ক. স খ. স
৩। ক. ১০-১২ টি খ. ১-১.২
৪। ক. ৩০ কেজি খ. ৫০ ভাগ

### পাঠ ৩.৬

১। ক. iv খ. i
২। ক. স খ. মি
৩। ক. মাটিতে খ. অপুংজনিত
৪। ক. ছোলার ফল ছেদক পোকাকে খ. ৭-১০ দিনের মধ্যে

ইউনিট ৪
শাক সবজি ও ফলের পোকার বর্ণনা ও দমন

# ইউনিট ৪ শাক সবজি ও ফলের পোকার বর্ণনা ও দমন

আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় সবজি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশের আবহাওয়া সবজি চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। তাই এখানে সারা বছরই নানা জাতের সবজির চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সবজিগুলোর মধ্যে বেগুন, আলু, টমেটো, বাধা কপি, ফুল কপি, ডাটা, মূলা, সীম, পটল, চিচিঙ্গা, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, ইত্যাদি প্রধান। বাংলাদেশের মোট ৫.৫০ লক্ষ একর জমিতে সবজির চাষ হয়।

অন্যান্য ফসলের ন্যায় সবজিও বিভিন্ন প্রজাতির কীটপতঙ্গ দ্বারা মাঠে আক্রান্ত হয়। এ সব পোকার আক্রমণে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ সবজি নষ্ট হয়। আবহাওয়া অনুকূলে থাকার কারণে বাংলাদেশে কীটপতঙ্গ দ্রুত বংশ বিস্তার করে থাকে। বিভিন্ন প্রকার পোকা-মাকড় দ্বারা বাংলাদেশে শাক-সবজির ১২-৩০% ক্ষতি হয় বলে রিপোর্ট পাওয়া যায়। প্রতি বছর কীটপতঙ্গের আক্রমণের ফলে বাংলাদেশে প্রায় ২ লাখ টন সবজি নষ্ট হয়।

শাক সবজির ন্যায় ফলও আমাদের নিত্য দিনের খাদ্য তালিকায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ফল অত্যন্ত উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য। বাংলাদেশে ২.৫ লক্ষ একর জমিতে বিভিন্ন প্রকার ফলের চাষ হয়। আম, জাম, লিচু, কলা, আনারস, পেয়ারা, নারিকেল, পেঁপে, তরমুজ, ফুটি, কমলা ইত্যাদি প্রধান প্রধান ফলগুলির মধ্যে অন্যতম।

বাংলাদেশের ফলও বিভিন্ন প্রকার কীটপতঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হয়। বিভিন্ন প্রজাতির পোকা ফল গাছের বিভিন্ন স্তরে আক্রমণ করে। গাছের চারা অবস্থা থেকে শুরু করে বয়স্ক গাছ সবই পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ সব পোকা ফল গাছের পাতা, কান্ড, ডগা, কুঁড়ি, ফুল এবং ফল ইত্যাদি আক্রমণ করে। পোকার আক্রমণে বাংলাদেশে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ ফল নষ্ট হয়ে যায়।

এ ইউনিটে প্রধান প্রধান কয়েকটি সবজি ও ফলের কতিপয় ক্ষতিকারক পোকা, তাদের জীবনচক্র ক্ষতির ধরন ও দমন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

## পাঠ ৪.১ টমেটো, ফুলকপি ও বাধা কপির পোকার সংগ্রহ ও দমন

**এ পাঠ শেষে আপনি–**

- টমেটোর জাবপোকার জীবনচক্র, ক্ষতির ধরন এবং দমন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ফুলকপির বিছাপোকার জীবনচক্র, ক্ষতির ধরন এবং প্রতিকার সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- বাঁধা কপির সুরুই পোকা ও বাঁধা কপির প্রজাপতির জীবনচক্র, ক্ষতির ধরন এবং দমন বর্ণনা করতে পারবেন।

**টমেটোর পোকা**

বাংলাদেশের কয়েকটি প্রজাতির পোকা টমেটোকে আক্রমণ করে। এদের মধ্যে টমেটোর জাবপোকা, টমেটোর ফল ছেদক পোকা, টমেটোর ছাতরা পোকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

**টমেটোর জাবপোকা (Tomato aphid)**

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Aphis craccivora Koch*
বর্গঃ হেমিপ্টেরা

এটিকে বাংলাদেশে টমেটোর মুখ্য অনিষ্টকারী পোকা হিসাবে গণ্য করা হয়। এ ছাড়া আরও পাঁচটি প্রজাতির জাবপোকা, যেমন– *Geoica lucifugus* Z., *Rhopalosiphum maidis,* F., *Schizaphis minuta* Vd Qes, *Tetraneura hirsuta* (Baker), *Tetraneura nigriabdominalis* (Sas).

### বর্ণনা ও জীবনচক্র

পূর্ণাঙ্গ পোকা পাখাযুক্ত ও পাখাহীন- এ দুরকমেরই হতে পারে। এরা দেখতে ক্ষুদ্রাকৃতির। শরীরের রং গাঢ় সবুজ বা বাদামী। তবে পাখাযুক্ত পূর্ণাঙ্গ পোকার রং কখনও কখনও কালোও হতে পারে। স্ত্রী পোকা অপুংজনিতভাবে ১০-১২ দিনের মধ্যে ৮-৩০টি বাচ্চা প্রসব করতে পারে। অল্প বয়স্ক নিম্ফগুলো বাদামী রঙের থাকে। নিম্ফগুলো পূর্ণ বয়স্ক জাবপোকায় পরিণত হতে ৫-৮ দিন সময় লাগে। নিম্ফ অবস্থায় এরা ৪ বার খোলস বদলায়। পাখাহীন স্ত্রী জাবপোকা ২৪ ঘন্টার মধ্যে বাচ্চা প্রসব করতে শুরু করে দেয়। এরা সারা বছরই বংশ বৃদ্ধি করে।

### ক্ষতির ধরন

টমেটোর জাবপোকার নিম্ফ এবং পূর্ণবয়স্ক পোকা উভয়েই গাছের নরম অংশ, বিশেষ করে পাতা ও শাখা-প্রশাখা হতে রস শোষণ করে খায়।

এরা নিম্ফ এবং পূর্ণবয়স্ক পোকা উভয়েই গাছের নরম অংশ, বিশেষ করে পাতা ও শাখা-প্রশাখা হতে রস শোষণ করে খায়। এরা দলবদ্ধভাবে প্রচুর সংখ্যক পোকা এক সাথে থাকে এবং রস শোষণ করে। আক্রান্ত পাতাগুলি কুঁকড়ে যায় এবং বিবর্ণ হয়ে যায়। আক্রমনের মাত্রা খুব বেশি হলে গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং ডগার অংশ ব্লাইট রোগে আক্রান্ত হয়ে।

টমেটো ছাড়াও এ পোকা চীনা বাদাম গাছের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। তাই এটিকে চীনা বাদামের প্রধান অনিষ্টকারী পোকা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

### প্রতিকার

১। প্রতি হেক্টর জমিতে ৫০০ মি. লি. ডাইমেথোয়েট ৪০ ইসি অথবা পারফেকথিয়ন ৪০ ইসি অথবা রক্সিয়ণ ৪০ ইসি অথবা ডেফেন ৪০ ইসি, ২০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এ হিসাবে প্রতি লিটার পানিতে ২ মি. লি. কীটনাশক মিশাতে হবে।

২। প্রতি হেক্টর জমিতে ৪৫৪ মি. লি. এনথিওণল ২১৭ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

## ফুলকপির পোকা

### ফুলকপির বিছাপোকা (Couliflower caterpillar)

বৈজ্ঞানিক নামঃ *Spodoptera litura* Fabricius
বর্গঃ লেপিডোপ্টেরা

*Spodoptera litura* বাংলাদেশে ফুল কপির প্রধান অনিষ্টকারী পোকা হিসাবে গণ্য। এটি একটি বহুভোজী পতঙ্গ। ফুলকপি ছাড়া এ পোকা বাঁধা কপি, চীনাবাদাম, আলু, জোয়ার, চীনাবাদাম, তামাক, পাট ইত্যাদি ফসলেরও ক্ষতি করে থাকে।

### বর্ণনা ও জীবন চক্র

সামনের পাখা বাদামী এবং পিছনের পাখা কিছুটা সাদাটে। প্রতি পাখায় তিনটি কালো ছাপ ও কয়েকটি করে সাদা দাগ থাকে।

পূর্ণ বয়স্ক পোকা হলো একটি মথ। মথ বাদামী রঙের। সামনের পাখা বাদামী এবং পিছনের পাখা কিছুটা সাদাটে। প্রতি পাখায় তিনটি কালো ছাপ ও কয়েকটি করে সাদা দাগ থাকে ( চিত্র ৪.১)। স্ত্রী পোকা গাছের পাতার উল্টোদিকে ডিম পাড়ে। এরা গাঁদা করে ডিম পড়ে। প্রতিটি গাদায় ৩৫০ থেকে ৫৫০টি ডিম থাকতে পারে। ডিমগুলি সাদাটে রংয়ের। তাপমাত্রার তারতম্য ভেদে ৩-৭ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে শূককীট বের হয়ে আসে। শূককীটের উপরিভাগ কালচে রঙের। পূর্নতা প্রাপ্ত শূককীটগুলো

সবুজ রঙের। এরা লম্বায় প্রায় ৩৮ মি. মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। দেহের পার্শ্বদেশে দু'সারি সাদা ফোঁটা আছে। চলার সময় শূককীটগুলো তদের শরীরের সামনের অংশকে জোঁকের মত পরিচালিত করে। শূককীট অবস্থায় ৩-৬ সপ্তাহ কাটায়। এরপর এরা মাটিতে চলে যায় এবং সেখানে ঘর তৈরি করে তার মধ্যে মূককীটে পরিণত হয়। মূককীট অবস্থায় ৭ দিন কাটানোর পর পূর্ণ বয়স্ক মথ বের হয়ে আসে। পূর্ণ বয়স্ক মথ ৪-৬ দিন বেঁচে থাকে। বছরে এ পোকা ৪-৬ টি প্রজন্ম তৈরি করে।



চিত্র ৪.১ ফুলকপির বিছা পোকাঃ (ক) পাতায় ডিম, (খ) শূককীট, (গ) ও (ঘ) পূর্ণ বয়স্ক মথ।

**ক্ষতির ধরন**

এ পোকার কীড়া ফুলকপি গাছের কচি পাতা খেয়ে নষ্ট করে। কোনো কোনো সময় এরা গাছের কচি কান্ড ও ফুলে গর্ত করে খায়।

বিছা পোকার কীড়া ফুলকপি গাছের কচি পাতা খেয়ে নষ্ট করে।

**প্রতিকার**

১। আক্রমনের মাত্রা কম হলে ডিমের গাঁদা এবং কীড়া দ্বারা আক্রান্ত পাতা ও ডগা সংগ্রহ করে এগুলোকে নষ্ট করে ফেলতে হবে অথবা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

২। আক্রমনের মাত্রা অত্যন্ত বেশি হলে, রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ১ মি. লি. ডিপটেরেক্স ৫০ ইসি অথবা লিবাসিড ৫০ ইসি অথবা সুমিথিয়ন ৫০ ইসি, মিশিয়ে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

## বাঁধাকপির পোকা

### বাঁধাকপির সুরুই পোকা (Diamond back moth)

বৈজ্ঞানিক নামঃ *Plutella xylostella* L.
বর্গঃ লেডিডোপ্টেরা

এ পোকা বাংলদেশে বাঁধা কপি ও ফুলকপির পাতা খেয়ে নষ্ট করে। এ পোকা সারা পৃথিবীব্যাপি বিস্তৃত। এ ছাড়া এরা সরিষার পাতাও খেয়ে থাকে।

**বর্ণনা ও জীবন চক্র**

এরা আকারে অত্যন্ত ছোট। পোকার মথের রং ছাই অথবা বাদামী (চিত্র ৪.২)। সামনের পাখায় সাদা রঙের একটি ক্ষুদ্র দাগ আছে। স্ত্রী মথ পাতার নিচের দিকে গাঁদা করে অথবা একটি একটি করে ডিম পাড়ে। ডিমের রঙ হলুদ এবং এগুলো দেখতে পিনের মাথার মত। একটি স্ত্রী মথ মোট ১৮-৩৫৬ টি ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে ২.৫ দিন হতে ৯.০ দিন সময় লাগে। কীড়া অবস্থায় এদের ৪টি স্তর আছে। সদ্যজাত কীড়াগুলো পাতার নিচের দিকের কলার মধ্যে প্রবেশ করে এবং সুড়ঙ্গ করে খেতে থাকে। এ সময় কালো রঙের মল দেখে কীড়ার অবস্থান বের করা যায়। দ্বিতীয় স্তরের সময়

সুরুই পোকার সদ্যজাত কীড়াগুলো পাতার নিচের দিকের কলার মধ্যে প্রবেশ করে এবং সুড়ঙ্গ করে খেতে থাকে। এ সময় কালো রঙের মল দেখে কীড়ার অবস্থান বের করা যায়।

গর্তগুলো বেশ স্পষ্ট হয়। তৃতীয় স্তরে এরা সুড়ঙ্গের বাইরে এসে  খেতে থাকে এবং চতুর্থ স্তরে পাতা নিচের অংশ থেকে খায়। এ পোকার কীড়াগুলো অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ। বাইরের কোনো



চিত্র ৪.২ বাঁধা কপির সুরুই পোকাঃ (ক) শূককীট, (খে) পূর্ণ বয়স্ক মথ

কিছুর স্পর্শ পেলেই এরা মৃতবৎ ভান করে জমিতে পড়ে থাকে। শূককীট অবস্থা শেষে এরা কোকুন তৈরি করে তার ভিতরে মূককীটে পরিণত হয়। মূককীট কাল ১৭-২৫$^{o}$C তাপমাত্রায় ৪-৫ দিন স্থায়ী হয়। পূর্ণাঙ্গ মথ ২০ দিনের বেশি সময় বেঁচে থাকে। বছরে এরা কয়েকটি প্রজন্ম তৈরি করে।

**ক্ষতির ধরন**

সুরুই পোকার কীড়া বাঁধাকপি ও ফুলকপির পাতা খায়। এরা ফুলকপি ও বাঁধাকপির মধ্য অংশের পাতা ও অন্যান্য পাতা খায়। এদের খাওয়ার ফলে পাতা জালের মত ঝাঁঝরা হয়ে যায় এবং মানুষের খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। আগষ্ট সেপ্টেম্বরে বাঁধাকপি বা ফুলকপি লাগালে এ পোকার ব্যাপক আক্রমণ হতে পারে।

সুরুই পোকা ফুলকপি ও বাঁধাকপির মধ্য অংশের পাতা ও অন্যান্য পাতা খায়। এদের খাওয়ার ফলে পাতা জালের মত ঝাঁঝরা হয়ে যায়।

**প্রতিকার**

১। বাঁধাকপি ও ফুলকপি তুলে নেবার পর জমিতে পড়ে থাকা ডগা ও পঁচা পাতা গুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

২। জমিতে বা তার আশে পাশে ক্রুসিফেরি পরিবারের আগাছা থাকলে তা ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

৩। আক্রমণ ব্যাপক হলে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। এ পোকা মারার জন্য অনেক কীটনাশক সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতি হেক্টর জমিতে ১২৩৫ মি. লি. ডায়াজিনন ৬০ ই.সি. অথবা লিবাসিড ৫০ ইসি ১২৩৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে এ পোকা মারা যায়। অথবা সুমিথিয়ন, ম্যালাথিয়ন, ফলিথিয়ন এবং একোথিয়নের যে কোনো একটি কীটনাশক ১১৩৫ মি. লি. নিয়ে ১১৩৫ মি. লি. পানির সাথে মিশিয়ে প্রযোগ করতে হবে।

## বাঁধাকপির প্রজাপতি (Cabbage butter fly)

বৈজ্ঞানিক নামঃ *Pieris brassicae* L
বর্গঃ লেপিডোপ্টেরা

এটি বাংলাদেশের বাঁধাকপির প্রধান ক্ষতিকারক পোকা হিসাবে গণ্য। এছাড়াও এ পোকা ফুলকপি, ওলকপি, মূলা প্রভৃতির পাতা খায়।

**বর্ণনা ও জীবনচক্র**

পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় এ পোকা একটি প্রজাপতি (চিত্র ৪.৩)। স্ত্রী প্রজাপতি গাদা করে ডিম পাড়ে। একটি স্ত্রী প্রজাপতি মোট ১৬৫টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে।



চিত্র ৪.৩ বাঁধা কপির প্রজাপতি

প্রজাপতির আক্রমনে ফুলকপি ও বাধাকপির মাথা ছোট হয়ে যায় অথবা মাথা বাঁধেনা।

ডিমগুলো হলুদ রঙের। ডিমগুলো সাধারণত পাতার উপরে বা নিচের পৃষ্ঠে পাড়ে। ডিম ফুটে শূককীট বের হতে তাপমাত্রা ভেদে ৩-১৭ দিন সময় লাগে। কীড়াগুলো ৫টি ধাপ অতিক্রম করে ১৫-৪০ দিনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এরপর শূককীটগুলো মূককীটে পরিণত হয়। শূককীট অবস্থার মেয়াদ তাপমাত্রা ভেদে ৭-২৮ দিন স্থায়ী হয়। পূর্ণ বয়স্ক প্রজাপতি ৩-১৩ দিন বাঁচে। অক্টোবর মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত এ পোকা ৪টি প্রজন্ম তৈরি করে।

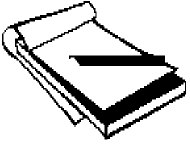
**ক্ষতির ধরন**

এ পোকার শূককীট পেটুকের মত বাধাকপি ও অন্যান্য সবজির পাতা ও ডগা খায়। এর ফলে গাছের বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ফুলকপি ও বাধাকপির মাথা ছোট হয়ে যায় অথবা মাথা বাঁধেনা।

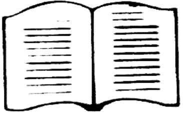
**প্রতিকার**

১। জমিকে আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

২। ফসল সংগ্রহের তিন সপ্তাহ পূর্বে প্রতি হেক্টর আক্রান্ত জমিতে ৭০০ মি. লি. ডায়াজিনন ৬০ ইসি কীটনাশক ১১২ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।



***অনুশীলন (Activity)*** *ঃ আপনার এলাকায় টমেটোর জাবপোকার আক্রমণ কেমন হয়? ফুলকপির বিছাপোকার এবং বাঁধাকপির সুরুই পোকার ক্ষতির ধরন বর্ণনা করুন।*



**সারমর্ম ঃ** টমেটো, ফুলকপি এবং বাঁধাকপিতে আক্রমণকারী পোকাগুলোর মধ্যে টমেটোর জাবপোকা, ফুলকপির বিছা পোকা এবং বাঁধাকপির সুরুই পোকা প্রধান অনিষ্টকারী পোকা হিসাবে বিবেচিত। টমেটোর আক্রমণকারী ৬টি প্রজাতির জাবপোকার মধ্যে *Aphis craccivora* K. বেশি ক্ষতিকর। এ পোকা গাছের বিভিন্ন নরম অংশ হতে রস শোষণ করে খায়। আক্রান্ত পাতা বিবর্ণ হয় ও কুঁচকে যায়। আক্রমণ তীব্র হলে গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। ফুলকপির বিছাপোকার কীড়া গাছের কচি পাতা খেয়ে ধবংস করে। বাঁধাকপির সুরুই পোকার কীড়া ফুলকপি ও বাঁধাকপির পাতা খায়। এ পোকায় খাওয়ার ফলে পাতা জালের মত ঝাঁঝরা হয়ে যায় ও মানুষের খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√ ) চিহ্ন দিন।**

ক) কীটপতঙ্গের আক্রমণে বাংলাদেশে শাক সবজির শতকরা কত ভাগ ক্ষতি হয়?

i) ৫-৬% ii) ৭-১০%
iii) ১০-১২% iv) ১২-৩০%

খ) কোন্ পোকাটি গাছের বিভিন্ন অংশ হতে রস শোষণ করে?

i) টমেটোর জাবপোকা ii) বাঁধাকপির সুরুই পোকা
iii) ফুলকপির বিছাপোকা iv) বাঁধাকপির প্রজাপতি

**২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।**

ক. টমেটোর জাবপোকার শরীরের রং গাঢ় সবুজ বা বাদামী।
খ. বাঁধাকপির সুরুই পোকার কীড়া ফুলকপির পাতা খায় না।

**৩। শুন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. বাংলাদেশে কীট পতঙ্গের আক্রমণে প্রতি বছর ...... টন সবজি নষ্ট হয়।
খ. ফুলকপির বিছাপোকার বৈজ্ঞানিক নাম ................ ।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

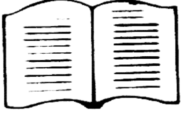
ক. কোন্ পোকাকে ইংরেজিতে ডায়মন্ড ব্যাক মথ বলে?
খ. কোন্ পোকার আক্রমণে গাছের পাতা জালের মত ঝাঁঝরা হয়ে যায়?

## পাঠ ৪.২ বেগুন ও সীমের ক্ষতিকর পোকার বর্ণনা ও দমন।



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- বেগুনের ডগা ও ফলের মাজরা পোকার জীবনচক্র, ক্ষতির ধরন এবং প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- কাটালে পোকার জীবন চক্র ও ক্ষতির নমূনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কাটালে পোকার দমন সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- সীমের জাবপোকার জীবন চক্র, ক্ষতির ধরন এবং প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- সীমের গান্ধী পোকার জীবনচক্র, ক্ষতির ধরন এবং দমন সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।



### বেগুনের পোকা

বেগুন বাংলাদেশের একটি উৎকৃষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ সবজি। মাঠে এ সবজি প্রায় ১৫-১৬টি প্রজাতির পোকা-মাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয়। বাংলাদশে বেগুন চাষের একটি প্রধান সমস্যা হলো পোকা-মাকড়। বেগুনে আক্রমণকারী পোকার মধ্যে বেগুনের ডগা ও ফলের মাজরা পোকা (Brinjal shoot and fruit borer), কাটালে পোকা (Epilachna beetle), পাতা মোড়ানো পোকা (Leaf roller), কাটুই পোকা (Cut worm) এবং উড়চুঙ্গা (Field cricket) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

### বেগুনের ডগা ও ফলের মাজরা পোকা (Brinjal shoot and fruit borer)

বৈজ্ঞানিক নামঃ *Leucinodes orbonalis*
বর্গঃ লেপিডোপ্টেরা

বাংলাদেশে এ পোকা বেগুনের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। এ পোকা বেগুন ছাড়াও সোলানেসি পরিবারভূক্ত অন্যান্য সবজি, যেমন– আলুরও ক্ষতি করে।

### বর্ণনা ও জীবনচক্র

পূর্ণবয়স্ক মথ ধূসর বাদামী। পাখার রং সাদাটে এবং পাখায় গোলাপী (Pinkish) দাগ আছে। স্ত্রী মথ গাছের বিভিন্ন অংশে যেমন, পাতার নিচে, ফুলের কুঁড়ি, ফলের বৃতি বা ডগায় ডিম পাড়ে। এরা ডিমগুলি একটি একটি করে অথবা গাঁদা করে পাড়ে। একটি মথ গড়ে ২৫০টি ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে শূককীট বের হতে গ্রীষ্মকালে ৩-৫ দিন এবং শীতকালে ৭-৮ দিন সময় লাগে। ডিম ফুটে বের হবার পর কীড়াগুলো ডগা, ফুল ও ফল ছিদ্র করে ভিতরে ঢোকে অভ্যন্তরীন অংশ খেয়ে বড় হতে থাকে। শূককীট অবস্থার মেয়াদ গ্রীষ্মকলে ১২-১৫ দিন এবং শীতকালে ২২ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। শূককীট ৮-৯ মি. মি. লম্বা হয়। এরা প্রাক মূককীট (Prepupal stage) অবস্থায় ৩-৪ দিন থাকে। এরা নৌকা আকৃতির (Boat shaped) কোকুন তৈরি করে তার ভিতরে মূককীটে পরিণত হয়। মূককীট অবস্থায় ৭-১৫ দিন কাটানোর পর পূর্ণবয়স্ক মথ বের হয়ে আসে। পূর্ণাঙ্গ পোকা ২-৫ দিন বাঁচে।

### ক্ষতির ধরন

> বেগুনের ডগা ও ফলের পোকার কীড়াগুলো ডগা ছিদ্র করে ভিতরের কলাসমূহ খায়। ফলে ডগার কলা নষ্ট হয়ে যায় এবং স্বাভাবিকভাবে গাছের খাদ্য চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

এ পোকার কীড়াগুলো ডগা ছিদ্র করে ভিতরের কলাসমূহ খায়। ফলে ডগার কলা নষ্ট হয়ে যায় এবং স্বাভাবিকভাবে গাছের খাদ্য চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে করে কিছুদিনের মধ্যে গাছের ডগা শুকিয়ে যায় এবং পার্শ্ব হতে নতুন শাখা-প্রশাখা গজায়। এ কারণে বেগুন গাছে সময়মত ফল ধরেনা। গাছে ফল ধরতে শুরু করলে এদের আক্রমণ ফলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। পোকার কীড়াগুলো ফল ছিদ্র করে ভিতরে ঢোকে। সেখানে এরা ফলের অভ্যন্তরীন কলা (tissue) খেয়ে বড় হতে থাকে (চিত্র ৪.৪)। এদের আক্রমণের ফলে ফল খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে যায় এবং বাজার দর মারাত্মকভাবে কমে যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে ফল ঝরে পড়ে। অনেক সময় গাছ মারা যায়। এ পোকার আক্রমণে

শতকার ১২-১৬ ভাগ ডগা এবং ২০-৬৪% বেগুন আক্রান্ত হয়। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে এদের আক্রমণ বেশি হয়।



চিত্র ৪.৪ বেগুনের ডগা ও ফলের মাজরা পোকা। (ক) পূর্ণ বয়স্ক মথ, (খ) শূককীট, (গ) আক্রান্ত বেগুন।

**প্রতিকার**

১। আক্রান্ত ডগা ও ফল দেখা গেলে তা ছিড়ে কীড়াগুলোকে মেরে ফেলতে হবে।

২। বেগুনের ক্ষেত সব সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে যাতে এ পোকা মরা ও শুকনো পাতায় আশ্রয় নিতে না পারে।

৩। গাছে ফল আসার পর প্রবহমান (systemic) কীটনাশক বাবহার না করাই উত্তম। প্রতি লিটার পানিতে ১ মি. লি. একটেলিক ৫০ ইসি বা ন ভাক্রন ৪০ এস,সি ডবি-উ মিশিয়ে স্প্রে করে এ পোকা মারা যায়। হেক্টর প্রতি ১০০০ লিটার কীটনাশক মিশ্রিত পানি ব্যবহার করতে হবে।

## কাটালে পোকা (Epilachna beetle)

বৈজ্ঞানিক নামঃ *Epilachna dodecastigma* M
*Epilachna vigintioctopuncta* F
বর্গঃ কলিওপ্টেরা

এ পোকার দু'টি প্রজাতি বাংলাদেশে বিভিন্ন সবজির ক্ষতি করে থাকে। ইংরেজিতে এ পোকা Hadda beetle নামে পরিচিত। উভয় পোকার জীবনচক্র, স্বভাব এবং ক্ষতির ধরন মোটামুটি একই রকম। এরা বহুভোজী পোকা।

**বর্ণনা ও জীবনচক্র**

*Epilachna dodecastigma* বিটলের প্রত্যেক ইলাইট্রাতে ৬টি করে কালো গোলাকার ফোঁটা আছে এবং উভয় ইলাইট্রাতে মোট ১২টি ফোঁটা আছে। এ জন্য এ পোকা *Epilachna 12-punctata* নামেও পরিচিত *Dodecastigama* অর্থ ১২ ফোঁটা। এ প্রজাতির রং গাঢ় তামাটে এবং ইলাইট্রার অগ্রভাগ গোলাকৃতির। *Epilachna vigintioctopuctata* এর প্রত্যেক ইলাইট্রাতে ১৪টি করে উভয় ইলাইট্রাতে মোট ২৮টি কালো গোলাকার ফোঁটা আছে। এজন্যই এ পোকাকে *Epilachna 28-punctata* বলা হয় (চিত্র ৪.৫)।

> *Epilachna dodecastigma* বিটলের প্রত্যেক ইলাইট্রাতে ৬টি করে কালো গোলাকার ফোঁটা আছে এবং উভয় ইলাই-ট্রাতে মোট ১২টি ফোঁটা আছে। এ জন্য এ পোকা *Epilachna 12-punctata* নামেও পরিচিত

স্ত্রী বিটল পাতার বিপরীত দিকে ডিম পাড়ে। ডিমগুলি হলুদ রঙের। একটি স্ত্রী পোকা তার সম্পূর্ণ জীবনে ১২০-১৮০টি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি দেখতে হলুদ রংঙের এবং ২-৫ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে শূককীট বা গ্রাব বের হয়। গ্রাবের রং হলুদ এবং দেহ ছোট ছোট কাঁটা (Spine) দ্বারা আবৃত থাকে। শুককীট অবস্থায় ১২-১৮ দিন কাটায়। মূককীট তার সম্পূর্ণ জীবন কাল পাতায় বা ডগার উপরের

অংশে সম্পন্ন করে। মূককীট কাল ৩-৬ দিন স্থায়ী হয়। এ পোকার জীবনচক্র সম্পন্ন হতে গ্রীষ্মকলে ১৮-২৫ দিন এবং শীতকালে ৫০ দিন লাগে। বছরে এরা ৭টি প্রজন্ম তৈরি করে।



চিত্র ৪.৫ কাটালে পোকা। (ক) ১২ ফোঁটা বিশিষ্ট কাটালে পোকা, (খ) ২৮ ফোঁটা বিশিষ্ট কাটালে পোকা।

**ক্ষতির ধরন**

কাটালে পোকা গাছের পাতার বহিঃত্বকের ক্লোরোফিল খায় এবং পাতাকে জালের ন্যায় ঝাঝরা করে ফেলে।

পূর্ণবয়স্ক পোকা এবং শূককীট, উভয় অবস্থাতেই এরা গাছের ক্ষতিকরে থাকে। এরা সোলানেসি পরিবারের বিভিন্ন সবজি, যেমন, বেগুন, টমেটো, গোলআলু, কিউকারবিটেসি পরিবারের কুমড়া, ঝিঙে, করলা এবং অন্যান্য সবজি যেমন সীম ও গোমেটর প্রভৃতির ক্ষতি সাধন করে। এ পোকা গাছের পাতার বহিঃত্বকের (Epidermis) ক্লোরোফিল খায় এবং পাতাকে জালের ন্যায় ঝাঝরা করে ফেলে। আক্রান্ত পাতা শুকিয়ে যায়। এতে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। আক্রমনের মাত্রা অধিক হলে গাছ মারা যেতে পারে।

**প্রতিকার**

১। আক্রমনের প্রাথমিক অবস্থায় পাতাসহ ডিমের গাদা বা পোকার গ্রাব হাত দিয়ে তুলে ধ্বংস করে ফেলা একটি উত্তম দমন ব্যবস্থা।

২। বেগুনের মাঠ সম্পূর্ণ পরিস্কার ও আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৩। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে নগস ১০০ ইসি ৫৬০ মি. লি. ১১১২ লিটার পানিতে মিশিয়ে অথবা ডায়াজিনন ৬০ ইসি ৯০০ মি. লি. ৫৭০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি হেক্টর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

## সীমের পোকা

সীম বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান সবজি। অন্যান্য সবজির ন্যায় সীমেও বিভিন্ন প্রকার পোকা আক্রমণ করে। সীমে আক্রমণকারী পোকার মধ্যে সীমের জাবপোকা, সীমের গান্ধী পোকা, সীমের পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা, সীমের ফল ছেদক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

## সীমের জাবপোকা (Bean aphid)

বৈজ্ঞানিক নামঃ *Aphis medicagenis* K
বর্গঃ হেমিপ্টেরা

বাংলাদেশে জাবপোকা সীমের একটি প্রধান অনিষ্টকারী পোকা হিসাবে গণ্য। এরা সীমের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। সীম ছাড়াও অন্যান্য ফসলে এ পোকা আক্রমণ করে। এটি একটি সর্বভূক (Omnivorous) পোকা।

**বর্ণনা ও জীবনচক্র**

এ পোকা ক্ষুদ্রাকৃতির এবং বাদামী অথবা বাদামী কালো রঙের হয়ে থাকে (চিত্র ৪.৬)। পাখাহীন স্ত্রী জাবপোকা লম্বায় প্রায় ২.৫ মি. মি. হয়। এ পোকার বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি । এদের প্রাথমিক ছোট কলোনী স্ত্রী পোকা দ্বারা গঠিত হয়। এরা অপূংজনিত ভাবে বংশ বিস্তার করে। এদের প্রজনন

কাল ৫-৮দিন এবং এ সময়ের মধ্যে এরা ১৪ বার বাচ্চা বা নিম্ফ প্রসব করে। প্রতিবারে ১৫-২০টি বাচ্চা দেয়। নিম্ফগুলো পূর্ণবয়স্ক পোকায় পরিণত হতে এক সপ্তাহ সময় লাগে। পূর্ণবয়স্ক পোকাগুলো অতিদ্রুত হারে বংশবৃদ্ধি শুরু করে। পাখাযুক্ত স্ত্রী পোকা উড়ে গিয়ে শীতকালে ভালো গাছে বংশবৃদ্ধি শুরু করে। এদের একটি প্রজন্ম শেষ করতে ৮-১২ দিন সময় লাগে। শীতকালে এরা বেশ কয়েকটি প্রজন্ম তৈরি করে। অতি দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করার কারণে এরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিরাট এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পারে।



চিত্র ৪.৬ সীমের জাবপোকা

**ক্ষতির ধরন**

জাবপোকা দলবদ্ধভাবে ফসলের বিভিন্ন কচি অংশ যেমন পাতা, ফুল, ফুলের ও ফলের বোঁটা এবং কচি পড হতে রস শোষণ করে খায়।

এরা দলবদ্ধভাবে ফসলের বিভিন্ন কচি অংশ যেমন পাতা, ফুল, ফুলের ও ফলের বোঁটা এবং কচি পড হতে রস শোষণ করে খায়। রস শোষণের ফলে আক্রান্ত গাছ দূর্বল হয়ে পড়ে এবং পাতা হলুদ হয়ে যায়। আক্রান্ত গাছে ফুল ও ফল হয় না। গাছে ফুল ও ফল অবস্থায় এদের আক্রমণ হলে ফুলের কুঁড়ি এবং কচি ফল ঝরে পড়ে। আক্রমণের মাত্রা অত্যন্ত বেশি হলে কচি ডগা মারা যায়। জাবপোকা মোজাইক ভাইরাস রোগের বাহক হিসাবেও কাজ করে।

১। লেডি বার্ড বিটল নামক পরভোজী পোকা এবং এর শূককীট জাবপোকা খায়। আক্রান্ত জমিতে এ পোকার সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাবপোকাকে দমন করা সম্ভব।

২। গাছে যখন সীম না থাকে তখন প্রতি হেক্টর জমিতে ৫৬০ মি. লি. ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ৫৭০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

## সীমের গান্ধী পোকা (Bean bug)

বৈজ্ঞানিক নামঃ *Coptosoma cribrarium* F.
বর্গঃ হেমিপ্টেরা

এটি সীমের একটি প্রধান ক্ষতিকারক পোকা। সীম ছাড়াও এ পোকা Liguminaceae পরিবারের অন্যান্য শস্য হতে রস শোষণ করে।

**বর্ণনা ও জীবনচক্র**

এ পোকা আকারে ছোট, লম্বায় ৫-৬ মি. মি. হয়ে থাকে। এরা দেখতে ডিম্বাকৃতির (চিত্র ৪.৭) এবং গায়ের রং সবুজ। এ পোকার পেট ও পাখা উত্তল স্কুটেলম দ্বারা আবৃত। স্ত্রী পোকা গাছের কচি ডালপালায় সারি করে ডিম পারে। একটি স্ত্রী পোকা ৩০ থেকে ৫০ ডিম পাড়ে। ডিমগুলো পাঁংশুটে ধূসর (ashy grey) বর্ণের এবং নক্সার মত সুন্দর করে সাজানো থাকে। ডিম ফুটে নিম্ফ বের হতে গড়ে ৬ দিন সময় লাগে। নিম্ফগুলো গোলাকৃতির এবং এদের রং সবুজ। নিম্ফ অবস্থার মেয়াদ ৬ সপ্তাহ। একবার জীবনচক্র সম্পন্ন করতে এদের প্রায় দু'মাস সময় লাগে। পূর্ণাঙ্গ পোকা ও নিম্ফ উভয়ের শরীর থেকে এক ধরনের বিশ্রী গন্ধ বের হয়।



চিত্র ৪.৭ সীমের গান্ধীপোকা

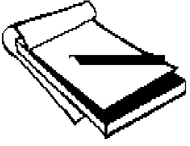
**ক্ষতির ধরন**

সীমের গায়ে শুড় ঢুকিয়ে রস শোষণ করার ফলে সীমের গায়ে ক্ষতের চারপাশে বাদামী দাগ হয়।

এরা সীম গাছের নরম অংশ এবং সীমের পড হতে দলবদ্ধভাবে রস শোষণ করে খায়। ফলে সীম গাছের ডগা বিবর্ণ হয়ে যায়। সীমের গায়ে শুড় ঢুকিয়ে রস শোষণ করার ফলে সীমের গায়ে ক্ষতের চারপাশে বাদামী দাগ হয়। সীমের বীজ নষ্ট হয়ে যায় এবং সীমের বৃদ্ধি কমে যায়। আক্রমণ তীব্র হলে গাছ থেকে সীম ঝরে যায় এবং গাছে ফলন কম হয়। সাধারণত গাছে ফুল ফোটার পর এদের আক্রমণ বেশি হয়।

**প্রতিকার**

এ পোকা দমনের জন্য সাধারণত কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না। তবে প্রতি লিটার পানিতে ২ মি. লি. ম্যালাথিয়ন মিশিয়ে স্প্রে করলে এ পোকা দমন করা যায়।



***অনুশীলন (Activity)*** *ঃ আপনার এলাকায় বেগুন ও সীমে আক্রমণকারী কয়েকটি পতঙ্গের নাম লিখুন। বেগুনের ডগা ও ফলের মাজরা পোকা এবং সীমের জাবপোকার ক্ষতির ধরন এবং এদের দমনের উপায়গুলো বর্ণনা করুন।*



**সারমর্ম ঃ** বেগুন ও সীমে বিভিন্ন প্রজাতির পোকা আক্রমণ করে। বেগুনের পোকার মধ্যে ডগা ও ফলের মাজরা পোকা অত্যন্ত মারাত্নক। এ পোকার আক্রমণে শতকরা ২০-৬২ ভাগ বেগুন নষ্ট হতে পারে। পোকার আক্রমণের ফলে বেগুন খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে যায়। কাটালে পোকা গাছের পাতা খেয়ে পাতাকে জালের মত ঝাঁঝরা করে ফেলে। সীমের জাবপোকা গাছের বিভিন্ন নরম অংশ হতে রস শুয়ে খায়। এদের আক্রমণে ফুলের কুঁড়ি ও ফল ঝরে যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে ডগা মারা যায়। সীমের গান্ধী পোকা গাছের কচি অংশ, বিশেষ করে পড হতে রস শোষণ করে খায়। আক্রমণ তীব্র হলে গাছ থেকে সীম ঝরে যায়।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.২

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√ ) চিহ্ন দিন।**

ক) বেগুনের ডগা ও ফলের মাজরা পোকার মথ কোথায় ডিম পাড়ে?

i) পাতার নিচে  ii) গাছের গোড়ায়

iii) বেগুনের ভিতরে  iv) মাটিতে

খ) নিম্নে কোন্ পোকাটি গাছের পাতা খেয়ে জালের মত করে ফেলে?

i) বেগুনের ডগা ও ফলের মাজরা পোকা।  ii) কাটালে পোকা

iii) সীমের গান্ধী পোকা  iv) সীমের জাবপোকা

**২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।**

ক. বেগুনের ডগা ও ফলের মাজরা পোকা পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় বেগুনের ক্ষতি করে।

খ. বাংলাদেশে কাটালে পোকার দু'টি প্রজাতি পাওয়া যায়।

**৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. কাটালে পোকা গাছের পাতার ........ খায়।

খ. সীমের জাবপোকা গাছের রস শোষণ করা ছাড়াও ...... ভাইরাস রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. কোন্ পোকাকে ইংরেজি Hadda পোকা বলে?

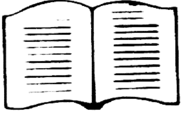
খ. *Epilachna dodecastigma* এর পাখার কয়টি কালো ফোঁটা আছে?

## পাঠ ৪.৩ লাউ, কুমড়া ও ঢেঁড়সের ক্ষতিকর পোকার বর্ণনা ও দমন



**এ পাঠ শেষে আপনি–**

- কুমড়া জাতীয় সবজির মাছি পোকার জীবনচক্র, ক্ষতির ধরন এবং প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।
- কুমড়ার লাল বিটল পোকার জীবনচক্র, ক্ষতির ধরন এবং প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ঢেঁড়সের ডগা ও ফলের মাজরা পোকার জীবনচক্র ,ক্ষতির নমুনা এবং প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।



### লাউ ও কুমড়ার পোকা

লাউ এবং কুমড়া বাংলাদেশর অতি গুরুত্বপূর্ণ দু'টি সবজি। এ দু'টি সবজি বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয়। অন্যান্য সবজির ন্যায় লাউ এবং কুমড়াতেও বেশ কয়েক প্রজাতির পোকা আক্রমণ করে থাকে। এ সব পোকার মধ্যে কুমড়া জাতীয় সবজির মাছি পোকা এবং কুমড়ার বিটল পোকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

### কুমড়া জাতীয় সবজির মাছি পোকা (Cucurbit fruit fly)

বৈজ্ঞানিক নামঃ *Bactrocera cucurbitae* Coquilett
বর্গঃ ডিপ্টেরা

মাছি পোকা কুমড়া জাতীয় সবজির মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। এটি ছাড়া মাছি পোকার আরও ৬টি প্রজাতি এ দেশে পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে *Bactrocera ciliatus* (Loew.), *Bactrocera diversus* C. *Bactrocera latiforns* Handel, *Bactrocera parvulus* H. *Bactrocera tau* Walker Ges *Bactrocera zonatus* এদের মধ্যে *Bactrocera cucurbitae* সব রকমের সবজি আক্রমণ করে এবং এটিকে সবজির মারাত্মক ক্ষতিকারক পোকা হিসাবে গণ্য করা হয়। এখানে শুধু *Bactrocera cucurbitae* পোকা সম্বন্ধ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

মাছি পোকা একটি বহুভোজী পতঙ্গ। এ পোকা লাউ,কুমড়া, শশা, চাল কুমড়া, করলা, চিচিঙ্গা,বাঙ্গি, তরমুজ,ক্ষিরা ধুন্দুল এবং কাঁকরোলের যথেষ্ট ক্ষতি করে।

### বর্ণনা ও জীবনচক্র

> স্ত্রী পোকা কচি ফলের ভিতরে ডিম্বস্থালকের সাহায্যে ছিদ্র করে ডিম পাড়ে।

*Bactrocera cucurbitae* Ges এবং *Bactrocera ciliatus* দেখতে প্রায় একই রকম। পূর্ণ বয়স্ক মাছির রং লাল ও বাদামী । বুকের দিকে হালকা হলুদ রং এর বাঁকা ও সোজা রেখা রয়েছে।পাখার কিনারার দিকে বাদামী ছোপ আছে।স্ত্রী মাছির পেট সরু এবং এদের একটি ধারালো ডিম্বালক (Ovipositor) রয়েছে। এর ফলে স্ত্রী মাছিকে অতি সহজেই চেনা যায়(চিত্র ৪.৮)। স্ত্রী পোকা কচি ফলের ভিতরে ডিম্বস্থালকের সাহায্যে ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ডিমগুলি দেখতে সাদা, নলের মত এবং একদিকে একটু বাঁকা থাকে। প্রতি ছিদ্রে ১টি এবং কোনো কোনো সময় ৪-১০টি ডিম পাড়ে। একটি স্ত্রী মাছি মোট ২০০টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে গ্রীষ্মকালে সাধারণত ১৮ ঘন্টা এবং শতীকালে ৩-৫ দিন সময় লাগে। কীড়া গরমের দিনে ৩ দিনে এবং শীতকালে ২ সপ্তাহে এদের খাওয়া শেষ করে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। পূর্ণতাপ্রাপ্ত কীড়া প্রায় সাদা রঙের এবং লম্বায় প্রায় ৯-১০ মি. মি. এবং প্রস্থে ২ মি. মি. হয়ে থাকে। শূককীট ফলের গায়ে ছিদ্র করে বের হয়ে পড়ে এবং মাটির নিচে ১.৩-৭.৩ সে. মি. গভীরতায় মুককীটে পরিণত হয়। এরা প্রাক মুককীট অবস্থায় ৬-২৪ ঘন্টা থাকে। মুককীট দেখতে অনেকটা ডিম্বাকৃতির এবং রং হালকা বাদামী। মুককীটের দৈর্ঘ্য ৫.৫ মি. মি. ও প্রস্থ ২ মি. মি.। এদের শরীরে ১১ টি খন্ডক থাকে। ঋতুভেদে মুককীট অবস্থায় এরা ৫-২১ দিন পর্যন্ত কাটায়। পুরুষ মাছি ৪৩ দিন এবং স্ত্রী মাছি ৫৪ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে। এ পোকা বৎসরে কয়েকবার বংশ বিস্তার করে।



চিত্র ৪.৮ সবজির মাছি পোকাঃ (ক) আক্রান্ত ফল (করলা), (খ ও গ) ডিম, (ঘ) শূককীট, (ঙ) মূককীট, (চ) পূর্ণ বয়স্ক মাছি। (অুধৎ, ১৯৮৪ থেকে নেয়া হয়েছে)।

**ক্ষতির ধরন**

মাছি পোকা কচি ফল বা সবজির ভিতরে ডিম পাড়ে । ডিম ফুটে বের হবার পর শুককীটগুলো সবজির ভিতরে নরম আঁশ খায়।

মাছি পোকা কচি ফল বা সবজির ভিতরে ডিম পাড়ে । ডিম ফুটে বের হবার পর শুককীটগুলো সবজির ভিতরে নরম আঁশ খায়। কীড়া ভিতরে খাওয়ার ফলে ফল খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে, পঁচে যায় এবং অনেক সময় গাছ থেকে ঝরে পড়ে। কোনো কোনো সময় স্ত্রী মাছি ফুলের দলমন্ডল এবং অন্যান্য স্থানেও ডিম পাড়ে। ডিম হতে বের হবার পর কীড়াগুলো ফুল এমনকি গাছের কান্ড পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। এ পোকার আক্রমনের ফলে কান্ডে এক প্রকার গুটি (এধষষ) সৃষ্টি হয়।

এ পোকা দ্বারা ৫০% এর বেশি সবজি আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

**প্রতিকার**

১। শাক সবজির বাগান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

২। আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে মাটির নিচে গভীর গর্ত করে পুঁতে পোকার শূককীট ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

৩। ফাঁদ দিয়ে পূর্ণ বয়স্ক মাছি সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে।

৪। ৬০ মি. লি. ডিপটেরেক্স ৫০ ইসি বা লিবাসিড ৫০ ইসি বা ফলিথিয়ন ৫০ ইসি ১১.২৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

## কুমড়ার লাল বিটল পোকা (Red pumpkin beetle)

বৈজ্ঞানিক নামঃ *Aulacophora foveicollis* Lac.
বর্গঃ কলিওপ্টেরা

কুমড়ার লাল বিটল পোকা বাংলাদেশে কুমড়া জাতীয় সবজির একটি মারাত্মক ক্ষতিকারক পোকা। এ ছাড়া আরও দু'টি প্রজাতির বিটল পোকা এ দেশে লাউ ও কুমড়াজাতীয় সবজিকে আক্রমণ করে।

এগুলো হলো *Aulacophora abdominalis* F. এবং *Aulacophora frontalis* L. *Aulacophora abdominalis* এর রং কমলা এবং *Aulacophora frontalis* এর রং নীল । তিনটি প্রজাতির জীবন চক্র, ক্ষতির ধরন এবং দমন ব্যবস্থা একই। এরা কুমড়া জাতীয় বিভিন্ন সবজি যেমন, লাউ, শশা, মিষ্টি কুমড়া, ঝিঙা, চিচিঙ্গা, করলা, তরমুজ কাঁকরোল প্রভৃতি সবজিকে আক্রমণ করে।

### বর্ণনা ও জীবন চক্র

পূর্ণবয়স্ক পোকা লাল রঙের এবং মধ্যম আকৃতির (চিত্র ৪.৯)। স্ত্রী পোকা গাছের গোড়ার নিকটে আর্দ্র মাটিতে একটি একটি করে বা গাঁদা করে ডিম পাড়ে। ডিমগুলি ডিম্বাকৃতির এবং হলুদ রঙের। ডিম ফুটে কীড়া বের হতে-৬-১৫ দিন সময় লাগে। শূককীট গুলো গাছের শিকড়, মাটির নিচের কান্ড এবং মাটি সংলগ্ন ফল ছিদ্র করে খেয়ে বড় হতে থাকে। শূককীট কালের মেয়াদ ১৩-২৫ দিন। এরা মাটির নিচে ২০-২৫ সে. মি. গভীরতায় একটি প্রকোষ্ঠে মূককীটে পরিণত হয়। মুককীট হতে ৭-১৭ দিন পর পূর্ণ বয়স্ক বিটল বের হয়ে আসে। একবার জীবনচক্র শেষ করতে ২৬-৩৭ দিন সময় লাগে। মার্চ হতে অক্টোবরের মধ্যে এরা ৫টি প্রজন্ম তৈরি করে।



চিত্র ৪.৯ কুমড়ার লাল বিটল পোকা ঃ (ক) ও (খ) শূককীট, (গ) মূককীট, (ঘ) পূর্ণয়বয়স্ক পোকা, (ঙ) পোকাসহ আক্রান্ত পাতা

### ক্ষতির প্রকৃতি

কুমড়ার লাল বিটল পোকা পাতায় অসম আকৃতির গোলা-কার গর্ত করে খায়।

পূর্ণ বয়স্ক পোকা কুমড়া জাতীয় সবজির বিভিন্ন গাছের ফুল, ফল, পাতা বিশেষ করে বর্ধিষ্ণু গাছের পাতা খায়। এরা পাতায় অসম আকৃতির গোলাকার গর্ত করে খায়। অনেক সময় এরা এমনভাবে খায় যে, পাতায় শুধুমাত্র শিরা উপশিরাগুলো অবশিষ্ট থাকে বা পাতায় জালিকা তৈরি হয়। এ পোকার কীড়া মাটিতে লেগে থাকা ফল, গাছের শিকড়, মাটির নিচের কান্ড ইত্যাদিতে ছিদ্র করে। এর ফলে গাছ নেতিয়ে পড়ে এবং মারা যায়।

### প্রতিকার

১। আক্রান্ত গাছে ছাই ছিটিয়ে এ পোকা সাময়িকভাবে দমন করা সম্ভব।

২। হেক্টর প্রতি ১.১২ লিটার ডায়াজিনন ৬০ ইসি অথবা সুমিথিয়ন ৫০ ইসি পানির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

### ঢেঁড়সের পোকা

অন্যান্য সবজির ন্যায় ঢেঁড়সেও নানা প্রজাতির পোকা আক্রমণ করে এবং ক্ষতি সাধন করে। ঢেঁড়সে আক্রমণকারী পোকাগুলোর মধ্যে ঢেঁড়সের ফল ও ডগার মাজরা পোকা, ঢেঁড়সের পাতা শোষক পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা এবং তুলার লাল গান্ধী পোকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

### ঢেঁড়সের ডগা ও ফলের মাজরা পোকা (Ladys finger fruit and shoot borer)

বৈজ্ঞানিক নামঃ *Earias fabea* St.
বর্গঃ লেপিডোপ্টেরা

এটি বাংলাদেশে ঢেঁড়স গাছের ডগা ও ফলের একটি প্রধান অনষ্টিকারী পোকা হিসাবে বিবেচিত। ঢেঁড়স ছাড়া এ পোকা অন্যান্য গাছ বিশেষ করে তূলার মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। এ পোকার শূককীট ঢেঁড়স গাছের ক্ষতি করে।

### বর্ণনা ও জীবন চক্র

এ পোকা পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় একটি মথ (চিত্র ৪.১০)। পূর্ণ বয়স্ক মথ বিশ্রামরত অবস্থায় ১২.৫০ মি. মি. লম্বা। মথের রং হালকা সবুজ, সামনের পাখায় একটি গাঢ় সবুজ দাগ থাকে। স্ত্রী মথ রাতের বেলা ঢেঁড়স গাছের নরম ডগা, কুঁড়ি ও ফলে একটি করে ডিম পাড়ে। ডিমগুলি অত্যন্ত ছোট এবং দেখতে উজ্জ্বল নীল রঙের। একটি মথ প্রায় ৭০০ টি ডিম পাড়ে। ডিম ফুটতে এক সপ্তাহ সময় লাগে। শূককীট অবস্থায় এরা ঋতুভেদে ১০-১৬ দিন কাটায়। শূককীটের রং গাঢ় বাদামী, গায়ে বিভিন্ন আকারের ফোঁটা বা দাগ থাকে এবং পিঠের উপর অনেকগুলো দাগ আছে। পূর্ণতাপ্রাপ্ত শূককীট লম্বায় প্রায় ২০ মি. মি. হয়ে থাকে। শূককীটের ৫টি স্তর আছে। শূককীট গুলো ময়লা বাদামী (dirty brown) অথবা হলদে রঙের রেশম দ্বারা নৌকাকৃতির একটি কোকুন তৈরি করে তার ভিতরে মূককীটে পরিণত হয়। মূককীটগুলোকে গাছে, আবর্জনাতে বা মাটির ফাটলে পাওয়া যায়। মুককীট কাল ৮-১৪ দিন স্থায়ী হয়। পূর্ণবয়স্ক মথ ৮-১২ দিন বাঁচে। এ পোকার একটি সম্পূর্ণ জীবনচক্র শেষ হতে প্রায় একমাস সময় লাগে। বাংলাদেশে এ পোকা বছরে ১২টি প্রজন্ম তৈরি করে।

ঢেঁড়সের ডগা ও ফলের মাজরা পোকার কীড়াগুলো ঢেঁড়স গাছের নরম বা কচি ডগা, কুঁড়ি ও ফল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে এবং ভিতরের নরম অংশ খায়।



চিত্র ৪.১০ ঢেড়সের ডগা ও ফলের মাজরা পোকা ঃ (ক) শূককীট, (খ) পূর্ণবয়স্ক মথ (আহমেদ ও জলিল, ১৯৮৩ থেকে নেয়া হয়েছে)।

### ক্ষতির ধরন

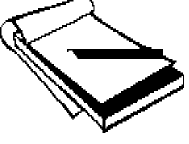
ডিম থেকে বের হবার পর এ পোকার কীড়াগুলো ঢেঁড়স গাছের নরম বা কচি ডগা, কুঁড়ি ও ফল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে এবং ভিতরের নরম অংশ খায়। এ পোকায় খাওয়ার ফলে অনেক সময় নরম ডগা নেতিয়ে পড়ে। কঁচি ফল ও ফুলের কূঁড়ি গাছ থেকে ঝরে যায়।

### প্রতিকার

১। জমিকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। জমির আশে পাশে বিকল্প পোষক গাছ (alternate host), বিশেষকরে তূলার চাষ না করা।

২। পরজীবি পোকা বিশেষ করে *Apanteles* sp Ges *Trichogramma evanescens* West. এর মাধ্যমে এ পোকা কমানো যেতে পারে। পরজীবি পোকা ব্যবহারের সময় কোনো রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে না।

৩। আক্রান্ জমিতে রিপকর্ড ১০ ইসি সুমিথিয়ন ৫০ ইসি, বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি, ১ মি. লি. অথবা সেভিন ৮৫ এস,পি ১ গ্রাম ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।



***অনুশীলন (Activity):*** *আপনার এলাকায় লাউ ও কুমড়া জাতীয় সবজিতে কোনো কোনো পোকার আক্রমণ বেশি হয়? কুমড়ার মাছি পোকার ৭টি প্রজাতির নাম লিখুন। কুমড়ার লাল বিটল পোকা এবং ঢেঁড়সের ডগা ও ফলের মাজরা পোকার ক্ষতির নমুনা বর্ণনা করুন।*



**সারমর্মঃ** কুমড়ার মাছি পোকার মোট ৭টি প্রজাতি এদেশে পাওয়া যায়।এগুলোর মধ্যে *Bactrocera cucurbitae* সবচেয়ে মারাত্মক। এ পোকার কীড়ার আক্রমণে কচি ফল পচেঁ যায় এবং ঝরে যায়। কুমড়ার লাল বিটল পোকা পুর্ণাঙ্গ অবস্থায় গাছের পাতা খায়। অনেক সময় এরা পাতা খেয়ে পাতাকে জালিকার মত করে ফেলে। ঢেঁড়সের ক্ষতিকারক পোকাগুলোর মধ্যে ডগা ও ফলের মাজরা পোকা অন্যতম। এ পোকার কীড়ায় খাওয়ার ফলে ফুলের কুঁড়ি এবং কচি ফল গাছ থেকে ঝরে যায়।



## পাঠোত্তর মুল্যায়ন ৪.৩

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

ক. কুমড়ার মাছি পোকার কীড়া কোথায় খায়?

i) ফল বা সবজির ত্বকে ii) ফল বা সবজির ভিতরে
iii) গাছের পাতায় iv) গাছের কান্ডে

খ. ঢেঁড়সের ফল ও ডগার মাজরা পোকার বিকল্প পোষক কোন্‌টি?

i) তূলা ii) আখ
iii) বাঁধাকপি iv) কুমড়া

**২। সত্য হলে ‘‘স’’ এবং মিথ্যা হলে ‘‘মি’’ লিখুন**

ক. কুমড়ার মাছি পোকা একটি বহুভোজী পতঙ্গ।
খ. কুমড়ার লাল বিটল পোকা পাতায় লম্বা লম্বা গর্ত করে।

**৩। শুন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. কুমড়ার মাছি পোকা....... অবস্থায় সবজির ক্ষতি করে।
খ. ঢেঁড়সের ফল ও ডগার মাজরা পোকার কীড়া গাছের.........খায়।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন**

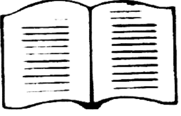
ক. কুমড়ার লাল বিটল পোকা কোথায় ডিম পাড়ে?
খ. *Trichogramma evanescens* কোন্‌ পোকার পরজীবি?

## পাঠ ৪.৪ আম, কলা ও নারিকেলের ক্ষতিকর পোকার বর্ণনা ও দমন।



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- আম ছিদ্রকারী পোকার জীবনচক্র, ক্ষতির ধরন এবং প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকার জীবনচক্র, ক্ষতির ধরন এবং প্রতিকার সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- নারিকেলের গন্ডারে পোকার জীবনচক্র, ক্ষতির নমূনা এবং প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



### আমের পোকা

আম বাংলাদেশের একটি প্রধান ফল। প্রায় ২৫ প্রজাতির পোকা এদেশে আম ও আম গাছের ক্ষতি করে থাকে। আমে আক্রমণকারী পোকগুলোর মধ্যে আম ছিদ্রকারী পোকা আমের মাছি পোকা, আমের কান্ডের মাজরা পোকা, আমের ডগার মাজরা পোকা, আমের শোষক পোকা এবং আম পাতার বিছাপোকা বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। এগুলো আমের প্রধান অনিষ্টকারী পোকা হিসাবে গণ্য।

### আম ছিদ্রকারী পোকা বা ভোমরা পোকা (The mango fruit borer)

বৈজ্ঞানিক নামঃ *Sternochetus frigidus* F.
বর্গঃ কলিওপ্টেরা

এ পোকা বাংলাদেশে আমের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে।

### বর্ণনা জীবন চক্র

ডিম ফুটে বের হবার পর কীড়া বা গ্রাবগুলো ফল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে আমের শাঁস (Pulp) খেয়ে বড় হতে থাকে।

পূর্ণ বয়স্ক উইভিল দেখতে খাটো, ডিম্বাকৃতির এবং গাঢ়বাদামী রংঙের (চিত্র ৪.১১)। স্ত্রী উইভিল কচি আমের খোসায় মার্চ-এপ্রিল মাসে ডিম পাড়তে থাকে। একটি আমে ২-৫ ডিম পাড়ে। ডিমগুলো দেখতে সাদা এবং প্রায় ১ মি. মি. লম্বা। ডিম পাড়ার আগে স্ত্রী পোকা তার ডিম্বস্থালকের সাহায্যে আমের সবুজ বহিঃত্বককে (epidermis) একটি গর্ত করে নেয় এবং তারপর ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বের হবার পর কীড়া বা গ্রাবগুলো ফল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে আমের শাঁস (Pulp) খেয়ে বড় হতে থাকে। এভাবে ১ মাস খাবার এরা ফলের ভিতরেই মূককীটে পরিণত হয়। দেড় থেকে দুসপ্তাহের মধ্যে মূককীটগুলো পূর্ণ বয়স্ক পোকায় রূপান্তরিত হয় এবং আমের গায়ে ছিদ্র করে বাইরে বেরিয়ে আসে। এ পোকা বৎসরে কেবল একবার আমের সময়ে বংশ বিস্তার করে। আমের মৌসুম শেষ হবার পর এরা গাছের বাকলের নিচে বা আমগাছে জন্মানো পরগাছার শিকড়ে লুকিয়ে কাল কাটায়। এ পোকা ৪০-৫০ দিনে তার জীবন চক্র সম্পন্ন করে।



চিত্র ৪.১১ আম ছিদ্রকারী পোকা। (ক) গ্রাব, (খ) পূর্ণ বয়স্ক উইভিল, (গ) ক্ষতিগ্রস্ত আমের ভিতরের অংশ (Alam, ১৯৬২ থেকে নেয়া হয়েছে)।

### ক্ষতির ধরন

এ পোকার কীড়া আমের গায়ে ছিদ্র করে ভিতরে আমের শাঁস খায় (চিত্র ৪.১১)। কীড়াগুলো কচি আমে ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে। কিন্তু গুটি বড় হওয়ার সাথে সাথে ছিদ্রটি বন্ধ হয়ে যায়। এজন্যই অনেক সময় বাইরে থেকে আমের মধ্যে আক্রমনের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। আম কাটার পরে ভিতরে পোকা, পাওয়া যায়। এ পোকা খেতে খেতে আমের শাঁসের মধ্যে ছোট সুড়ঙ্গ তৈরি করে যা পোকার মল দ্বারা পূর্ণ থাকে। একবার কোনো গাছে এ পোকার আক্রমণ হলে প্রতি বছরই সে গাছে এ পোকার আক্রমণ হয়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে গাছে একটিও ভালো আম পাওয়া যায় না।

কীড়াগুলো কচি আমে ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে। কিন্তু গুটি বড় হওয়ার সাথে সাথে ছিদ্রটি বন্ধ হয়ে যায়। এজন্যই অনেক সময় বাইরে থেকে আমের মধ্যে আক্রমনের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না।

**প্রতিকার**

১। আমবাগান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং আম গাছে যাতে কোনো পরগাছা জন্মাতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

২। গাছে ফাটল বা গর্ত থাকলে তা ফিনাইল মিশ্রিত পানিতে একটি ন্যাকড়া ভিজিয়ে মাঝে মাঝে মুছে দিতে হবে।

৩। গাছে মুকুল আসার ১-২ মাস পূর্বে বাগানের ফাঁকা জমি লাংগল দিয়ে চাষ দিতে হবে। এতে পোকার আক্রমণ কম হবার সম্ভবানা থাকে।

৪। আমের গুটি ধরার এক থেকে দু'সপ্তাহ পরে ১৪.৩ মি. লি. ডাইমেক্রন ১০০ এস,সি ডবি-উ ৫৪.৪ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে ১৫-২১ দিন পর দু'বার প্রয়োগ করলে এ পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

## কলার পোকা

কলা বাংলাদেশের অত্যন্ত উপাদেয় এবং পুষ্টিকর একটি ফল। এটা বাংলাদেশের সর্বত্র চাষ হয়। কলা গাছে মোট ৪টি প্রজাতির পোকা আক্রমণ করে। এগুলো হল কলার পাতা ও ফলের বিটল দাগযুক্ত ঘাস ফড়িং এবং কলার কান্ডের উইভিল। এদের মধ্যে কলার পাতা ও কান্ডের বিটল কলা গাছের প্রধান অনিষ্টকারী পোকা।

## কলার পাতা ও ফলের বিটল (Banana leaf and fruit beetle)

বৈজ্ঞানিক নামঃ *Nodostoma viridipennis* Mots

বর্গ ঃ কলিওপ্টেরা

এ পোকা বাংলাদেশে কলার মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে।

**বর্ণনা ও জীবনচক্র**

পূর্ণ বয়স্ক পোকার রং এবং আকারে পার্থক্য দেখা যায় (চিত্র ৪.১২)। বাংলাদেশে এ পোকা দু'রঙের হয়। একটির ইলাইট্রা বাদামী এবং অন্যটির ইলাইট্রা গাঢ় সবুজাভ নীল। স্ত্রী পোকা চারা গাছের পাতার কিনারায় অথবা শুকনা পাতার ভাঁজে ডিম পাড়ে। এরা গাদা করে ৫০-৬০টি ডিম পাড়ে। ডিমগুলো অত্যন্ত ছোট এবং চুঙ্গাকৃতির। ঋতুভেদে ডিম ফুটে কীড়া বা গ্রাব বের হতে ৫-১৬ দিন সময় লাগে। সদ্যজাত গ্রাবগুলো অত্যন্ত সক্রিয় থাকে এবং সাথে সাথে নিচের দিকে যেতে থাকে ও মাটিতে ঢুকে যায়। এরা মাটির নিচে ১৫-১৬ সে. মি. গভীর পর্যন্ত কলার শিকড় খায়। চার সপ্তাহ খাবার পর শূককীটগুলো উপরে উঠতে থাকে এবং ভু-পৃষ্ঠের কাছাকাছি মূককীটে পরিণত হয়। শীতের সময়ে এদের কীড়াকাল ১৪০-১৬০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মূককীট অবস্থায় ৮-১০ দিন কাটানোর পর পূর্ণ বয়স্ক পোকা বের হয়ে আসে। পূর্ণ বয়স্ক পোকা বের হবার পর গাছের কচি পাতা ও ফল আক্রমণ করে। পূর্ণ বয়স্ক পোকা প্রায় দু'সপ্তাহ বাঁচে। মার্চ মাসে এ পোকার আক্রমণ শুরু হয় এবং আগষ্ট মাসে এ পোোকার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি থাকে। এরা কীড়া ও মূককীট অবস্থায় মাটির নিচে শীতকালটা শীতনিদ্রায় কাটায়।

কলার পাতা ও ফলের বিটল কীড়া ও মূককীট অবস্থায় মাটির নিচে শীতকালটা শীতনিদ্রায় কাটায়।









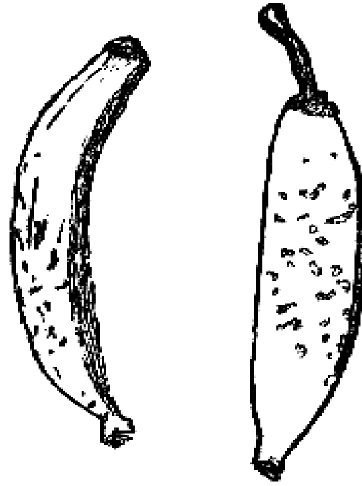
চিত্র ৪.১২ কলা পাতা ও ফলের বিটল। (ক) গ্রাব, (খ) মূককীট, (গ) পূর্ণ বয়স্ক বিটল (অষধস, ১৯৬২ থেকে নেয়া হয়েছে)।

**ক্ষতির ধরন**

কলার পাতা ও ফলের বিটল চারা অবস্থা থেকে শুরু করে ফল ধারণ পর্যন্ত কলা গাছের ক্ষতি করে। কলার পাতা যখন ছোট ও কচি এবং মোড়ানো অবস্থায় থাকে তখন পূর্ণ বয়স্ক বিটল সে পাতা খেতে থাকে। সাধারণত এরা পাতার অঙ্কীয় পৃষ্ঠে বা উল্টাদিকে খায়। এরা পাতার সবুজ অংশ খায় ফলে পাতায় বিষমাকর তালির (Irregelar patches) সৃষ্টি হয় (চিত্র ৪.১৩)। পাতা বড় হবার সাথে সাথে দাগগুলো শুকিয়ে আসে। এ সময়ে বড় পাতায় এগুলোকে বসন্তের দাগের মত দেখায়। আক্রমণের মাত্রা অত্যধিক হলে গাছ দূর্বল হয়ে পড়ে এবং বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। থোড় বা মোচা বের হবার সময় এরা মোচার ভিতরে ঢুকে কচি কলার খোসা খেতে থাকে। কলা বড় হবার সাথে সাথে আক্রমণের দাগগুলো বড় হয়ে স্পষ্ট দেখা যায়। এতে করে কলার বাজার মূল্য ২৫-৭৫% কমে যায়। এ পোকা অমৃতসাগর জাতের কলার মারাত্মক ক্ষতি করে।

কলার পাতা ও ফলের বিটল পাতার সবুজ অংশ খায় ফলে পাতায় বিষমাকর তালির সৃষ্টি হয়।





চিত্র ৪.১৩ আক্রান্ত কলা

**প্রতিকার**

১। শস্য পর্যায়ক্রম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে এবং পর পর দু'বছর কলা চাষ বন্ধ রাখতে হবে।

২। নতুন বাগানের চারপাশে মুড়ি কলা গাছ রাখা চলবে না।

৩। প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ গ্রাম সেভিন ৮৫ ডবি-উ. পি. অথবা ডায়াজিনন ৬০ ইসি মিশিয়ে আক্রান্ত জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১৫ দিন পর পর দু'বার প্রয়োগ করতে হবে।

### নারিকেলের পোকা

†mLv‡b Giv Abyb¥xwjZ KwP cvZv, †hLvb †_‡K gywP †ei nq

নারিকেল বাংলাদেশের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ফল। বাংলাদেশে নারিকেল ৩টি প্রজাতির পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। এগুলো হচ্ছে - নারিকেলের গন্ডারে পোকা, নারিকেলের লাল উইভিল এবং নারিকেলের বিছাপোকা। তবে নারিকেলের গন্ডারের পোকাই একমাত্র প্রধান অনিষ্টকারী হিসাবে বিবেচিত।

### নারিকেলের গন্ডারে পোকা (The rhinoceros beetle)

বৈজ্ঞানিক নামঃ *Oryctes rhinoceros* L.
বর্গ ঃ কলিওপ্টেরা

বাংলাদেশে এটি নারিকেলের মারাত্মক ক্ষতি করে। বাংলাদেশে এটিকে গুবরে পোকাও বলা হয়। এরা পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় গাছের ক্ষতি করে।

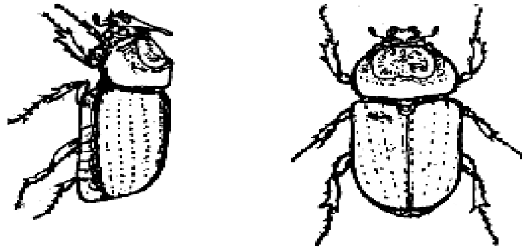
### বর্ণনা ও জীবনচক্র

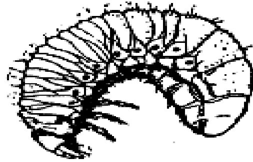
পূর্ণ বয়স্ক পোকা চকচকে কালো, পৃষ্ঠাদেশ মসৃন এবং অঙ্কীয় দিকে (Ventral side) লালচে বাদামী রোম আছে। এ পোকা বেশ বড়, ৪০-৫০ মি. মি. লম্বা এবং ২০ মি. মি. প্রস্থ। পুরুষ পোকার মাথায় একটি লম্বা চোখা শিং থাকে, স্ত্রী পোকার শিং অত্যন্ত খাট। গন্ডারের মত শিং থাকার জন্য এ পোকাকে গন্ডারে পোকা বলে (চিত্র ৪.১৪)।

গন্ডারের মত শিং থাকার জন্য গুবরে পোকাকে গন্ডারে পোকা বলে।

স্ত্রী পোকা পঁচনশীল গোবরের গাদায় বা পঁচনশীল আবর্জনা ও শাকসবজীর স্তূপ, ভিজা করাতের গুঁড়া প্রভৃতি জায়গায় ডিম পাড়ে। ডিম গুলো দেখতে সাদা। এরা একটি একটি করে ডিম পাড়ে। একটি স্ত্রী পোকা ১০০-১৫০টি ডিম পেড়ে থাকে। ১২-২০ দিনের মধ্যে ফ্যাকাশে হলদে সাদা রঙের কীড়া বের হয়ে আসে। পূর্ণতাপ্রাপ্ত কীড়া লম্বায় ৭৫ মি. মি. এবং প্রস্থে ২৫ মি. মি.। কীড়া অবস্থা ৩-৬ মাস স্থায়ী হয়। এ সময় কীড়ার মাথা কালো এবং শরীর ময়লাটে সাদা রং ধারণ করে। কীড়াগুলো সব সময় বাঁকা হয়ে থাকে। কীড়াগুলো মাটির নিচে বা গোবরের গাদায় সুড়ঙ্গ করে ঢুকে এবং সেখানে একটি কোষ গঠন করে তার ভিতরে মূককীটে পরিণত হয়। মূককীট অবস্থায় ৩-4 সপ্তাহ থাকার পর পূর্ণ বয়স্ক পোকা বের হয়ে আসে। পূর্ণ বয়স্ক পোকা নিশাচর এবং আলোতে আকৃষ্ট হয়। এদের সম্পূর্ণ জীবনচক্র সমাপ্ত করতে প্রায় দশ মাস সময় লাগে এবং বৎসরে এদের একটি প্রজন্ম তৈরি হয়।







চিত্র ৪.১৪ নারিকেলের গন্ডারে পোকা। (ক) ও (খ) পূর্ণ বয়স্ক পোকা, (গ) গ্রাব বা শূককীট

### ক্ষতির প্রকৃতি

পূর্ণ বয়স্ক পোকা সুস্থ নারিকেল গাছের কচি ডগায় গর্ত করে ভিতেরে ঢুকে পড়ে। সেখানে এরা অনুন্মীলিত কচি পাতা, যেখান থেকে মুচি বের হয় তার গোড়া ইত্যাদিতে খেতে থাকে। এরা ফলবর্তী

কাদি কান্ডেও আক্রমণ করে। বিটল এ সব জায়গায় ছিদ্র করে খায়। এরা এ সব জায়গার আঁশ যুক্ত অংশ চিবিয়ে রস খায় এবং আঁশ গুলো ফেলে দেয়। যখন আক্রান্ত পাতাগুলো খোলে তখন এতে সারিবদ্ধ ভাবে ছিদ্র দেখা যায়। আক্রমণ তীব্র হলে গাছের মাথা শুকিয়ে যায়। গাছে পাতা ও ফলের সংখ্যা কম হয়। কোনো কোনো সময় আক্রান্ত গাছ মারা যায়। এ পোকার আক্রমণে কচি গাছের বেশি ক্ষতি হয়।

**প্রতিকার**

১। বাগানের ভিতরে বা আশে পাশে গোবর বা আবর্জনার স্তুপ রাখা চলবে না।

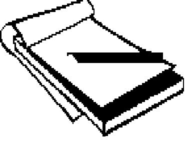
২। বাগানে মরা, পঁচা বা আক্রান্ত গাছের গুড়ি থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে।

৩। আলোর ফাঁদের সাহায্যে পূর্ণ বয়স্ক পোকা ধরে মেরে ফেলতে হবে।

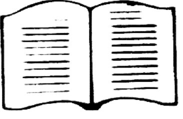
৪। গাছের ডগা পরিস্কার রাখতে হবে। আক্রান্ত গাছে শিক ঢুকিয়ে গর্তের ভিতরের পোকা মেরে ফেলতে হবে।

৫। ১০ লিটার পানিতে ১০ মি. লি. ডাইমেক্রন ১০০ এস. সি. ডবি-উ. মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

৬। আক্রান্ত গাছের গর্তে প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন ঢুকিয়ে গর্তের মুখ কাদা দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এতে পোকা মারা যাবে।



***অনুশীলন (Activity) ঃ*** *আম, কলা ও নারিকেলের প্রধান প্রধান ক্ষতিকারক পোকাগুলো কী কী? আপনার এলাকায় আম ছিদ্রকারী পোকার প্রার্দুভাব কেমন হয়? কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকার আক্রমণে গাছের কী ক্ষতি হয় তা বিস্তারিত লিখুন*



**সারমর্ম ঃ** আমের ক্ষতিকারক পোকাগুলোর মধ্যে আম ছিদ্রকারী পোকা আমের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। এ পোকা আমের ভিতরে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করে খায়। একবার কোনো গাছে আম ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হলে সে গাছে প্রতি বছরই এ পোকার আক্রমণ হয়। কলার পতা ও ফলের বিটল কলার প্রধান অনিষ্টকারী পোকা। এ পোকায় খাওয়ার ফলে কলার পাতা ও কলার খোসায় দাগ সৃষ্টি হয়। ফলে কলার বাজার দর ২৫-৭৫% কমে যায়। নারিকেলের গন্ডারে পোকা নারিকেল গাছের কচি ডগায় গর্ত করে ভিতরে ঢুকে এবং অনুন্মীলিত কচি পাতার গোড়ায় ছিদ্র করে খায়। আক্রান্ত পাতাগলো খোলার পর এতে সারিবদ্ধভাবে ছিদ্র দেখা যায়। এ পোকার আক্রমণে কোনো কোনো সময় গাছ মারাও যেতে পারে।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৪

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√ ) চিহ্ন দিন।**

ক. আম ছিদ্রকারী পোকা আমের কোন্ অংশে খায়?

i) আম ছিদ্র করে ভিতরে শাঁস খায়। ii) আম ছিদ্র করে আমের আঁটি খায়।
iii) আমের মুকুল খায় iv) আম থেকে রস শোষন করে খায়।

খ. নারিকেলের গন্ডারে পোকা কোন্ অবস্থায় নারিকেল গাছের ক্ষতি করে?

i) শূককীট বা গ্রাব অবস্থায় ii) পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায়
iii) মূককীট অবস্থায় iv) শূককীট ও পূর্ণ বয়স্ক উভয় অবস্থায়।

**২। সত্য হলে ''স''এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।**

ক. আম ছিদ্রকারী পোকাকে ভোমরা পোকা বলা হয়।
খ. নারিকেলের গন্ডারে পোকার রং চকচকে কালো।

**৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. ............... পোকার মাথায় গন্ডারের মত শিং আছে।
খ. কলার পাতা ও ফলের বিটল ................ অবস্থায় গাছের ক্ষতি করে।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. কোন্ পোকাকে গোবরে পোকা বলে?
খ. কলার পাতা ও ফলের উইভিল কোন্ জাতের কলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে?

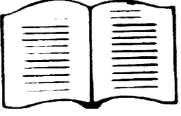
# ব্যবহারিক

## পাঠ ৪.৫ কলার প্রধান প্রধান পোকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- কলার প্রধান অনিষ্টকারী পোকা অর্থাৎ কলার পাতা ও ফলের বিটল সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন।
- কলার পাতা ও ফলের বিটল সংগ্রহ করতে পারবেন।
- কলার পাতা ও ফলের বিটল সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন।
- কলার পাতা ও ফলের বিটল সংরক্ষণ করতে পারবেন।



### কলার পোকা সংগ্রহের উদ্দেশ্য

পোকা সংগ্রহের প্রধান উদ্দেশ্যে হচ্ছে কলার প্রধান অনিষ্টকারী পোকাকে শনাক্ত করা এবং এ পোকার ক্ষতির ধরন সম্পর্কে জানা যাতে করে এ পোকা দমনের জন্য সঠিক পদক্ষেপ নেয়া যায়।

### ক) পোকা সংগ্রহের পদ্ধতি

পোকা সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সমুহ

১। হাতজাল

২। কিলিং জার বা বোতল

### কাজের ধাপ

এ পোকা সংগ্রহ করা খুবই সহজ। আক্রান্ত গাছে ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এ পোকা পাতায় বসে আছে। এগুলোকে সুইপিং জাল দিয়ে অতি সহজেই ধরা যায়। সুইপিং জাল দিয়ে ধরার পর এগুলোকে কিলিং বোতলে ভরে বোতলের মুখ বন্ধ করে দিন। এভাবে এ পোকা সংগ্রহ করুন।

### পোকা শনাক্তকরণ

সংগৃহীত পোকাগুলো মারা যাবার পর বইয়ে দেয়া বর্ণনার সাথে মিলিয়ে এ গুলোকে শনাক্ত কর€ন।

### খ) সংরক্ষণ

পোকাকে শনাক্ত করার পর এদেরকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করুন। এ পোকা সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত জিনিসগুলোর প্রয়োজন হবে–

১। কাঠের বাক্স

২। পিন

৩। পিনিং বোর্ড

৪। টেগ বা লেবেল

৫। নেফথালিন বল

### কাজের ধাপ

পাঠ ৩.৭ এ দেয়া বর্ণনা অনুযায়ী বিটলগুলোকে পিনে গেঁথে নিন। এরপর ট্যাগ সহ এগুলোকে বাক্সে সাজিয়ে রাখুন।

**ট্যাগ লেবেল ঃ** ৩.৭ এ যে ধরনের লেবেল বা ট্যাগ ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে এখানেও ঠিক একই ধরনের ট্যাগ ব্যবহার করুন।

### সতর্কতা

১। কিলিং বোতল সাবধানে ব্যবহার করবেন। এটি যাতে ভেঙ্গে না যায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। কিলিং বোতলে ভুলেও শ্বাস নেবেন না বা গন্ধ শুকবেন না।

## পাঠ ৪.৬ আমের প্রধান প্রধান পোকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

### এ পাঠ শেষে আপনি–

- আম ছিদ্রকারী পোকা সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
- আম ছিদ্রকারী পোকা সংগ্রহ এবং শনাক্ত করতে পারবেন।
- আম ছিদ্রকারী পোকা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের তালিকা তৈরি করতে পারবেন এবং এ পোকা সংরক্ষণ করতে পারবেন।

### পোকা সংগ্রহের উদ্দেশ্য

পোকা সংগ্রহের প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রধান প্রধান ক্ষতিকারক পোকাগুলোকে শনাক্ত করা। এতে করে ক্ষতিকারক পোকার বিরুদ্ধে সঠিক দমন ব্যবস্থা নেয়া সহজ হয়।

### ক) পোকা সংগ্রহের পদ্ধতি

**পোকা সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহঃ**

১। কিলিং বোতল বা জার
২। ছুরি
৩। হাত জাল
৪। পেট্রিডিস অথবা কৌটা

**কাজের ধাপ**

**আম ছিদ্রকারী পোকা সংগ্রহ**

আমের পোকা সংগ্রহের জন্য কিছু আম সংগ্রহ করুন। পাকা আমে অনেক সময় পোকার ছিদ্র দেখা যায়। ছিদ্রওয়ালা আমে এ পোকা থাকে না। কারণ আমের গায়ে ছিদ্র করে পূর্ণ বয়স্ক পোকাগুলো বাইরে বের হয়ে আসে। কাজেই যে সব আমের গায়ে ছিদ্র নেই সে সব আম নিতে হবে। এ রকম কিছু আম সংগ্রহ করে একটি ছুরি দিয়ে আমটি কাটুন। কাটার পর আক্রান্ত আমের ভিতরে পোকার খাওয়ার নমূনা দেখতে পাবেন এবং পোকার কীড়া বা শূককীট অথবা পূর্ণাঙ্গ পোকা পাবেন। পূর্ণাঙ্গ পোকাকে কিলিং বোতলে রাখুন। যদি শূককীট পাওয়া যায় তাহলে তাকে একটি পেট্রি ডিস বা কৌটায় রেখে দিন।

শীতকালে এ পোকা আক্রান্ত গাছের বাকলের নিচে বা আম গাছে জন্মানো পরগাছার শিকড়ে পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় শীত নিদ্রায় থাকে। কাজেই আমের মৌসুম ছাড়া অন্য সময় এদেরকে সংগ্রহ করতে হলে আক্রান্ত গাছের মধ্যে যে সব আগাছা জন্মে সে সব আগাছার শিকড়ে ভালোভাবে খুজতে হবে। তাহলে পূর্ণ বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করা যাবে। আক্রান্ত গাছে কোনো কোনো সময় কাটা বাকল থাকে। সে সব বাকলের নিচে ভালো করে খুঁজলে আম ছিদ্রকারী উইভিল পাওয়া যায়। এভাবে সংগৃহীত পূর্ণ বয়স্ক পোকাকে কিলিং জার বা বোতলে পুরে মেরে ফেলুন।

**পোকা শনাক্তকরণ ঃ** বইয়ে দেয়া বর্ণনার সাথে মিলিয়ে সংগৃহীত পোকাকে শনাক্ত কর€ন।

### খ) পোকা সংরক্ষণ

**আমের ভোমরা পোকা সংরক্ষণ**

শনাক্ত করার পর সংগৃহীত পোকাগুলোকে সংরক্ষণ করতে হবে। এদেরকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন যাতে করে নষ্ট হয়ে না যায়। সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত জিনিষগুলো প্রয়োজন।

১। কাঠের বাক্স
২। পিন

৩। পিনিং বোর্ড
৪। লেবেল
৫। নেফথালিন বল
৬। কর্কযুক্ত শিশি
৭। ৯৫% অ্যালকোহল।

**কাজের ধাপ**

পাঠ ৩.৭ এ দেয়া পদ্ধতি অনুসরণ করে পূর্ণ বয়স্ক পোকাকে সঠিকভাবে পিনে গেঁথে বাক্সেরাখুন। পোকার সাথে বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত লেবেল বা ট্যাগ ব্যবহার করুন। বাক্সে রাখার পর বাক্সের ভিতরে কোণায় কয়েকটি নেফথালিন বল রাখুন। বাক্সের মুখ বন্ধ করুন।

এ পোকার গ্রাব বা কীড়া সংরক্ষণের জন্য ৩.৭ দেয়া পদ্ধতি অনুসরণ করুন।

**সাবধানতাঃ** কিলিং বোতলের ব্যাপারে সব সময়ই সজাগ থাকতে হবে। এটি একটি মারাত্মক বিষ। কাজেই এটি যাতে ভেঙ্গে না যায় বা বোতলের মুখ খোলা না থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কিলিং বোতল শিশু বা অন্যান্য লোকের হাতের নাগালে না থাকে সে ব্যাপারে খুব সাবধান হতে হবে।

## পাঠ ৪.৭ নারিকেলের প্রধান প্রধান পোকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- নারিকেলের গন্ডারে পোকা সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন।
- নারিকেলের গন্ডারে পোকা সংগ্রহ করতে পারবেন।
- নারিকেলের প্রধান অনিষ্টকারী পোকা সংরক্ষণের জন্য জিনিষপত্রের তালিকা তৈরি করতে পারবেন এবং এ পোকা সংরক্ষণ করতে পারবেন।



**পোকা সংগ্রহের উদ্দেশ্য**

পোকা সংগ্রহের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে নারিকেলের প্রধান অনিষ্টকারী পোকা শনাক্তকরণ, এ পোকার ক্ষতির ধরন প্রত্যক্ষকরণ এবং এ পোকা দমনের জন্য সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ। এখানে বলে নেয়া প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে নারিকেলের একটিই মাত্র মুখ্য অনিষ্টকারী পোকা আছে। সেটি হলো নারিকেলের গন্ডারে পোকা বা ভোমরা পোকা।

### ক) পোকা সংগ্রহ পদ্ধতি

**পোকা সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা উপকরণঃ**

নারিকেলের গন্ডারে পোকা সংগ্রহের জন্য নিম্নবর্ণিত উপকরণগুলো লাগবে-

১। একটি কিলিং জার
২। একটি লোহার ছোট রড
৩। খুবই শক্ত আঠা
৪। একটি কোদাল
৫। একটি প্লাস্টিকের কৌটা
৬। শূককীট মারার জন্য একটি দ্রবন (পাঠ ৩.৭ এ দেয়া আছে)

**কাজের ধাপ**

এ পোকা রাত্রি বেলায় চলাচল করে। কোনো কোনো সময় এ পোকা আলোতে আকৃষ্ট হয়। তাই মাঝে মাঝে এটিকে মানুষের ঘরে আসতে দেখা যায়। কোনো সময় এভাবে পাওয়া গেলে তাকে হাত দিয়ে ধরে কিলিং জার বা বোতলে রেখে দিন।

এ পোকা আক্রান্ত গাছে ছিদ্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। এ পোকা সংগ্রহ করতে হলে আক্রান্ত গাছ খুঁজে বের করুন। তার পর এ পোকার গর্ত খুঁজে বের করুন । এরপর একটি ছোট রডের মাথায় খুব শক্ত আঠা লাগিয়ে গর্তে ঢুকিয়ে দিন।পোকা থাকলে সে আঠায় লেগে বের হয়ে আসবে। তারপর তাকে কিলিং জারে রেখে মেরে ফেলুন।

**শূককীট সংগ্রহ**

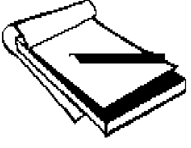
এ পোকার শূককীট সংগ্রহ করতে হলে পঁচনশীল গোবরের গাদায় বা পঁচা আবর্জনার স্তুপে যেতে হবে। গোবরের গাদা বা আবর্জনার স্তুপের উপর দিক থেকে গোবর বা আবর্জনা সরিয়ে ফেলুন। এভাবে খুঁজলে গন্ডারে পোকার কীড়া বা গ্রাব বেরিয়ে আসবে। কীড়াগুলো বাঁকা, মাথা কালো এবং শরীর ময়লাটে সাদা। সংগ্রহের পর কীড়াগুলোকে অ্যালকোহল দ্রবনে ঢুকিয়ে দিন। গ্রাবগুলো মারা যাবে।

### খ) পোকা সংরক্ষণ

**গন্ডারে পোকা সংরক্ষণঃ** পূর্ণ বয়স্ক পোকা ও গ্রাবগুলো সংগ্রহের জন্য পাঠ ৩.৭ এ দেয়া পদ্ধতি অনুসরণ করুন। পূর্ণ বয়স্ক পোকা একটি বিটল। কাজেই এটিকে পিনে গেঁথে কাঠের বাক্সে এবং গ্রাবকে তরল মাধ্যমে সংরক্ষণ করুন।

**সাবধানতা**

১। কিলিং জার ব্যবহারের জন্য পূর্বের পাঠ গুলোতে দেয়া সাবধানতা অবলম্বন করুন।
২। পূর্ণ বয়স্ক পোকা সংগ্রহের সময় নারিকেল গাছ হতে যেন পড়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।



## চূড়ান্ত মূল্যায়ন– ইউনিট ৪

### সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। টমেটোর জাবপোকার কয়টি প্রজাতি বাংলাদেশে পাওয়া যায়? জাবপোকা টমেটোর কী ক্ষতি করে তা বর্ণনা করুন।

২। জাবপোকা কীভাবে বংশ বিস্তার করে? টমেটোর জাবপোকা দমনের উপায় গুলো সংক্ষেপে লিখুন।

৩। ফুলকপির বিছাপোকার বৈজ্ঞানিক নাম কী? এ পোকার জীবনচক্র বর্ণনা করুন।

৪। ফুলকপির বিছাপোকার ক্ষতির ধরন এবং প্রতিকারের উপায়গুলো লিখুন।

৫। বাঁধাকপির সুরুই পোকার ক্ষতির নমূনা এবং দমনের উপায়গুলো লিখুন।

৬। বাঁধাকপির প্রজাপতির জীবনচক্র বর্ণনা করুন।

৭। বেগুনের ডগা ও ফলের মাজরা পোকার বৈজ্ঞানিক নাম কী? এ পোকার জীবনচক্র সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৮। বেগুনের ডগা ও ফলের মাজরা পোকা গাছ ও ফলের কী ক্ষতি করে তা বিস্তারিত লিখুন।

৯। কাটালে পোকার কয়টি প্রজাতি বাংলাদেশে পাওয়া যায়? কাটালে পোকার জীবনচক্র বর্ণনা করুন।

১০। কাটালে পোকা কী কী গাছের ক্ষতি করে? এ পোকার ক্ষতির ধরন ও প্রতিকারের উপায়গুলো লিুখন।

১১। সীমের জাবপোকা কোন্ বর্গের অন্তর্গত? এ পোকার জীবনচক্র বর্ণনা করুন।

১২। সীমের জাবপোকার বৈজ্ঞানিক নাম কী? এ পোকার ক্ষতির ধরন এবং প্রতিকার বর্ণনা করুন।

১৩। সীমের গান্ধী পোকার ক্ষতির ধরন এবং প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১৪। কুমড়ার মাছি পোকার কয়টি প্রজাতি বাংলাদেশে পাওয়া যায়? মাছি পোকার জীবনচক্র আলোচনা করুন।

১৫। মাছি পোকা কী কী সবজিতে আক্রমণ করে। এ পোকার ক্ষতির ধরন এবং প্রতিকার বর্ণনা করুন।

১৬। কুমড়ার লাল বিটল পোকার শূককীট কোথায় থাকে? এ পোকার ক্ষতির ধরন বর্ণনা করুন।

১৭। ঢেঁড়সের ডগা ও ফলের মাজরা পোকার বৈজ্ঞানিক নাম কী? এ পোকার ক্ষতির ধরন এবং প্রতিকারের উপায়গুলো আলোচনা করুন।

১৮। আমের প্রধান প্রধান অনিষ্টকারী পোকাগুলোর নাম লিখুন। আম ছিদ্রকারী পোকার ক্ষতির ধরন বর্ণনা করুন।

১৯। আম ছিদ্রকারী পোকার অপর নাম কী? এ পোকা দমনের উপায়গুলো বর্ণনা করুন।

২০। কলার পাতা ও ফলের বিটলের বৈজ্ঞানিক নাম কী? এ পোকার জীবনচক্র আলোচনা করুন।

২১। কলার পাতা ও ফলের বিটল কোন্ অবস্থায় কলা গাছের ক্ষতি করে। এ পোকার ক্ষতির নমূনা ও দমনের উপায় সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২২। নারিকেলের গন্ডার পোকার অপর নাম কী? এ পোকাকে গন্ডারে পোকা বলা হয় কেন? এ পোকার ক্ষতির নমূনা আলোচনা করুন।

২৩। নারিকেলের গন্ডারে পোকা কোথায় ডিম পাড়ে? এ পোকার জীবনচক্র আলোচনা করুন।

২৪। নারিকেলের গন্ডারে পোকা দমনের উপায়গুলো লিখুন।



## উত্তর মালা– ইউনিট ৪

### পাঠ ৪.১

১। ক. iv খ. i
২। ক. স খ. মি
৩। ক. ২ লাখ খ. *Spodoptera litura*
৪। ক. বাঁধাকপির সুরুই পোকাকে খ. বাঁধাকপির সুরুই পোকা

### পাঠ ৪.২

১। ক. i খ. ii
২। ক. মি খ. স
৩। ক. ক্লোরোফিল খ. মোজাইক
৪। ক. কাটালে পোকাকে খ. ১২ টি

### পাঠ ৪.৩

১। ক. i খ. i
২। ক. স খ. মি
৩। ক. শুককীট খ. নরম অংশ
৪। ক. মাটিতে খ. ঢেঁড়সের ডগা ও ফলের মাজরা পোকা

### পাঠ ৪.৪

১। ক. i খ. ii
২। ক. স খ. স
৩। ক. নারিকেলের গন্ডারে খ. পূর্ণ বয়স্ক
৪। ক. নারিকেলের গন্ডারে পোকা খ. অমৃত সাগর

**ইউনিট ৫**
**পোকা দমন**

# ইউনিট ৫ পোকা দমন

ফসল উৎপাদনে পোকা দমন একটি অপরিহার্য অংশ। আদিকাল থেকে প্রাকৃতিকভাবে ও বিভিন্ন উপায়ে পোকা দমন হয়ে আসছে। যদি এসব ব্যবস্থা না থাকতো তবে পোকার অত্যাধিক জন্ম ক্ষমতার কারণে পৃথিবীতে মানুষের বসবাস অসম্ভব হয়ে পড়তো। অতীতের তুলনায় বর্তমানে পোকা দমনে অনেক কলাকৌশল, নীতিমালা ও যন্ত্রের উদ্ভাবন ঘটেছে। কিন্তু এসবের প্রয়োগ এখনও সঠিকভাবে হচ্ছে না। যেমন, শস্য ক্ষেতে অধিক অথবা স্বল্প মাত্রায় অনিয়মিতভাবে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে কাঙ্খিত পোকা দমন হয় না বরং পোকা প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে, পরিবেশ দূষিত হয়, জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এবং কৃষির Sustainability হ্রাস পায়। পোকা দমন সফল করতে হলে পোকা সম্বন্ধে ধারণা ও সঠিক দমন পদ্ধতি জানা প্রয়োজন। এ ইউনিটে পোকা দমনের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

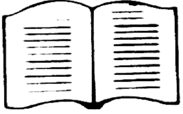
## পাঠ ৫.১ পোকা দমন পদ্ধতি



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- পোকা দমনের বিভিন্ন পদ্ধতির নাম লিখতে পারবেন।
- পোকা দমনের বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগের উদাহরণ দিতে পারবেন।

### দমন পদ্ধতি



পোকার দমন পদ্ধতি প্রধানতঃ দুই প্রকার– যথা, প্রাকৃতিক দমন ও ফলিত বা কৃত্রিম দমন।

আক্রান্ত ক্ষেতের পাশে রাতে মশাল জ্বালালে ধানের গান্ধি পোকা, পাতা শোষক পোকা ও পঙ্গপাল আগুনে পড়ে মারা যায়।

### প্রাকৃতিক দমন (Natural control)

১। জলবায়ুগত উপাদান সম হ দ্বারা
২। ভূমি বন্ধুরতা বৈশিষ্ট্য দ্বারা
৩। শিকারী জীব দ্বারা
৪। পোকার রোগ দ্বারা

### ফলিত বা কৃত্রিম দমন (Applied or Artificial control)

১। যান্ত্রিক দমন
২। ভৌত দমন
৩। কৃষিজ পরিচর্যার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ
৪। জৈবিক দমন
৫। রাসায়নিক দমন
৬। কৌলিকভাবে দমন
৭। আইনগত নিয়ন্ত্রণ

### প্রাকৃতিক দমন

জলবায়ুগত উপাদানের মধ্যে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আলো, বাতাস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সকল উপাদানগুলোর বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন পোকা সহ্য করতে পারে ও বংশ বিস্তার করে থাকে। এসব

উপাদানের পরিবর্তন ঘটলে বংশবৃদ্ধি ও বিস্তার মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। যেমন, গ্রীষ্মের সময় অত্যধিক তাপমাত্রায় বা খরায় পোকার মৃত্যু ঘটে। অল্প আর্দ্রতায় পাতা শোষক পোকার মৃত্যু ঘটে। আর্দ্রতা বেশি হলে পোকার দেহে ছত্রাকজনিত রোগ বেশি হয় এবং পোকা মারা যায়। প্রবল বায়ুপ্রবাহে মিজ জাতীয় মাছি, কিছু মশক ও উড়ন্ত কীটপতঙ্গ আঘাত পেয়ে মারা যায়। ভূমি বন্ধুরতা যেমন, সমুদ্র, পর্বত, খরস্রোতা নদী, বিশাল অরণ্য প্রভৃতি কীটপতঙ্গের বিস্তারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাঁধা সৃষ্টি করে। অনেক শিকারী ও পরজীবি কীটপতঙ্গ, মেরুদন্ডী প্রাণী যথা পাখী, ব্যাঙ, মাছ, বিভিন্ন সরীসৃপ পোকা ধরে খায় এবং পোকার সংখ্যা হ্রাস পায়। উল্লেখ্য যে, প্রতিদিন একটি ব্যাঙ তার পাকস্থলীর ধারণক্ষমতার চারগুণ বেশি পরিমাণ কীটপতঙ্গ ক্ষেতে পারে এবং একটি পাখী প্রায় তার দেহের ওজনের সমান পোকা খেয়ে থাকে। রোগজীবাণু যেমন ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, কৃমি (Nematode) ইত্যাদি পোকার দেহে রোগ সৃষ্টি করে মৃত্যু ঘটায়। এ ছাড়া খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদির জন্য একই অথবা একাধিক প্রজাতির মধ্যে প্রতিযোগিতার (Inter or intra-specific competetion) ফলে প্রকৃতিকভাবে পোকা দমন হয়। প্রকৃতিতে এরূপে পোকা দমন হয়ে থাকে।

প্রতিদিন একটি ব্যাঙ তার পাকস্থলীর ধারণক্ষমতার চারগুণ বেশি পরিমাণ কীটপতঙ্গ ক্ষেতে পারে এবং একটি পাখী প্রায় তার দেহের ওজনের সমান পোকা খেয়ে থাকে।

### ফলিত বা কৃত্রিম দমন

মানুষ কর্তৃক গৃহীত দমন ব্যবস্থাকে কৃত্রিম বা ফলিত দমন বলে। প্রাকৃতিকভাবে দমন কার্যকরী না হলে কৃত্রিমভাবে নিম্নে বর্ণিত দমন ব্যবস্থার প্রয়োগ করতে হয়।

**যান্ত্রিক দমন ঃ** হাত দ্বারা আহরণ করে পা দ্বারা পিষে মারা। যেমন– পোকার ডিমের গাদা, গুচ্ছ কীড়া এবং দলবদ্ধ অবস্থায় পূর্ণাঙ্গ পোকা ধরে ধ্বংস করা। হাত জাল ও থলে ব্যবহার করে পোকা মারা যায়। পিটিয়ে মারা যেমন– ঘরের মাছি, তেলাপোকা ইত্যাদি দমন করা সহজ। খুঁচিয়ে মারা যেমন– পোষকের দেহে লুকিয়ে থাকা পোকা লোহার শিক দ্বারা খুঁচিয়ে মেরে দমন করা যায়। কেরোসিন মিশ্রিত পানিতে ভেজা দড়ি আক্রান্ত গাছের উপর টেনে নেয়া এবং গাছ ঝাঁকিয়ে পোকা দমন করা যায়। চালুনি দ্বারা চেলে ও কুলা দ্বারা ঝেড়ে গুদামজাত শস্যদানার পোকা দমন করা যায়। যান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা (Mechanical exclusion) সৃষ্টি করে কীটপতঙ্গের গমনবিধি বন্ধ করলে পোকা দমন হয়। যান্ত্রিক ফাঁদ যেমন– আলোর ফাঁদে পূর্ণাঙ্গ পোকা আকৃষ্ট হয়ে পানিতে পড়ে মারা যায়। পুড়িয়ে যেমন– আক্রান্ত ক্ষেতের পাশে রাতে মশাল জ্বালালে ধানের গান্ধি পোকা, পাতা শোষক পোকা ও পঙ্গপাল আগুনে পড়ে মারা যায়।

**ভৌত দমন ঃ** অধিক তাপমাত্রা প্রয়োগ করে যেমন– গুদামে ১০-১২ ঘন্টা ৫০$^\circ$ সে. তাপমাত্রা প্রয়োগ করলে অন্য দিকে আক্রান্ত শস্যদানাকে প্রখর রোদে বিছালে পোকাসমূহ মারা যায়। আর্দ্রতার তারতম্য ঘটিয়ে অর্থাৎ শস্যদানা শুকিয়ে আর্দ্রতা ৮% এর নিচে গুদামজাত করলে অধিকাংশ পোকার আক্রমণ হয় না। শৈত্য প্রয়োগ করে যেমন– গুদামঘর ৫$^\circ$-১০$^\circ$ সে. তাপমাত্রায় কয়েক ঘন্টা রেখে দিলে অনেক শস্যদানার পোকা দমন হয়। শুষ্ক ফল, সবজি এভাবে রাখলে পোকার আক্রমণ হয় না।

**কৃষিজ পরিচর্যার মাধ্যমে দমন ঃ** শস্য ক্ষেতে নিয়মিত পরিচর্যার দ্বারা কীটপতঙ্গের ক্ষতি থেকে ফসলকে মুক্ত রাখা সম্ভব। বিভিন্ন প্রকার পরিচর্যা যেমন– জমি কর্ষণ, আগাছা দূরকরা, ক্ষেত পরিস্কার রাখা, শস্য বপন ও রোপণের তারিখ পরিবর্তন, ক্ষেতে পানি সিঞ্চন বা নিষ্কাশন, শস্য ছাটাই ও পাতলাকরণ, পরিমিত ও সঠিক সার প্রয়োগ, ফাঁদ শস্য রোপণ, শস্য পর্যায় (Crop rotation) এবং পোকা প্রতিরোধকজাত চাষের মাধ্যমে পোকা দমন হয়ে থাকে।

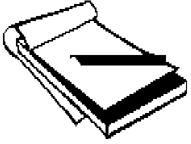
**জৈবিক দমন ঃ** এই পদ্ধতিতে পোকার প্রাকৃতিক শত্রুসমূহ যেমন পরভোজী (Predator), পরজীবি (Parasitoid) এবং রোগজীবাণু (Pathogen) কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি করে আক্রান্ত শস্য ক্ষেতে ছেড়ে দিয়ে দমন করা হয়। অনেক পোকা আছে যারা পরজীবি ও পরভোজী হিসাবে অন্য পোকা দমনে ব্যবহৃত হয়। রোগজীবাণুর মধ্যে অনেক ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও কৃমি সফলভাবে পোকার জৈবিক দমনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

**রাসায়নিক দমনঃ** বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যাদির মাধ্যমে কীটপতঙ্গ দমন করা হয়। এসব দ্রব্যাদির মধ্যে কীটনাশক (Insecticide), আকর্ষক (Attractant), বিকর্ষক (Repellent), হরমোন ও খাদ্যনিরোধক (Antifeedant) উল্লেখযোগ্য। নানা প্রকারের কীটনাশক পোকা দমনে ব্যবহার করা হয়। এগুলোর বর্ণনা এই ইউনিটের পাঠ ৫.২ এ পাওয়া যাবে। আকর্ষকের মধ্যে ফেরোমোন কৃত্রিমভাবে তৈরি করে পুরুষ পোকাকে আকৃষ্ট করে মারা যায়। বিকর্ষক কীটপতঙ্গকে নিরুৎসাহ, এড়িয়ে চলার প্রবণতা, অনাগ্রাসন ইত্যাদির মাধ্যমে খাদ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ভৌত বিকর্ষক যেমন, পানি, ধূলা, মোম, ধূঁয়া ইত্যাদি রাসায়নিক বিকর্ষক যথা বিটা-ন্যাপথল, সাইট্রোনিল তৈল, আলকাতরা ইত্যাদি এবং ভেষজ বিকর্ষক যেমন নিম, বিষকাটালী, নিশিন্দা ইত্যাদি পোকা দমনে ব্যবহার করা যায়। হরমোন কীটপতঙ্গ দমনের একটি আধুনিক পদ্ধতি। কৃত্রিম হরমোন যেমন, এলটুসিড, ডিমিলিন ইত্যাদি আক্রান্ত ক্ষেতে ছড়িয়ে দিলে কীটপতঙ্গ সরাসরি মরে না কিন্তু বৃদ্ধি ব্যহত হয়, বিকলাঙ্গ, স্বল্পায়ু, প্রজনন ক্ষমতা রহিত করে দমন করা যায়। খাদ্যনিরোধক কীটপতঙ্গকে স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণে বিরত রাখে। ট্রাইফিনাইল কার্যকরী খাদ্যনিরোধক এবং উদ্ভিদজাত কীটনাশক, যেমন– নিমের নির্যাস খাদ্য নিরোধের কাজ করে।

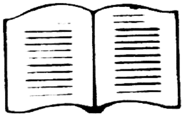
**কৌলিকভাবে দমনঃ** গামা রশ্মি (Gamma radiation) প্রয়োগে কীটপতঙ্গের প্রজনন ক্ষমতা রহিত করে এবং পোকার সংখ্যা সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই পদ্ধতিতে পুরুষ পোকাগুলোকে গামা রশ্মির মাধ্যমে বন্ধ্যা করে স্ত্রী পোকাগুলোর সহিত স্বাভাবিক যৌন মিলনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। এদের মিলনের ফলে যে ডিম হয় সবটিই বন্ধ্যা হয় এবং বাচ্চা হয় না। বন্ধ্যাকরণ রাসায়নিক দ্রব্য (Chemosterilant) ব্যবহার করেও এই প্রক্রিয়ায় পোকা দমন করা যায়।

কোনো ক্ষতিকর পোকা কোনো দেশ বা অঞ্চলে যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য আইন-গতভাবে বাঁধা প্রদান করা হয়।

**আইনগত নিয়ন্ত্রণ ঃ** কোনো ক্ষতিকর পোকা কোনো দেশ বা অঞ্চলে যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য আইনগতভাবে বাঁধা প্রদান করা হয়। আক্রান্ত গাছের অংশ ও বীজ এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চলাচলে আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ করে অনেক পোকা ও রোগের ব্যাপক বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই দমন পদ্ধতিকে কোয়ারেন্টাইন দমন বলে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন সামুদ্রিক বন্দর, আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও সীমান্ত এলাকায় আইনগত পোকা দমনের ব্যবস্থা আছে।



***অনুশীলন (Activity) ঃ** বর্তমানে আপদ দমনে কোন্ কোন্ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তা বর্ণনা করুন।*



**সারমর্মঃ** বিভিন্ন পদ্ধতিতে পোকা দমন করা হয়। প্রাকৃতিকভাবে পোকা দমন সর্বদা কম বেশি হয়ে থাকে। এই দমন পদ্ধতিতে জলবায়ুর তারতম্য ও প্রাকৃতিক শত্রু অধিক ভূমিকা পালন করে। ফলিত দমন পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকারের এবং সবগুলো পদ্ধতি একই পোকার উপর প্রযোজ্য নয়। কোনো কোনো পোকা দমনে একাধিক ফলিত পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। যান্ত্রিক দমন, কৃষিজ পরিচর্যার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও রাসায়নিক দমন যথা কীটনাশকের ব্যবহার সাধারণত প্রচলিত পদ্ধতি। ভৌত দমন গুদামজাত শস্যদানা পোকার জন্য উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। জৈবিক, কৌলিক ও আইনগত দমন পদ্ধতির জন্য বিশেষ কৌশলের প্রয়োজন পড়ে। এসব পদ্ধতি প্রয়োগ করলে পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকে। সহজ উপায়ে, কম খরচে ও পরিবেশ দূষিত না করে পোকা দমন করতে হলে যান্ত্রিক ও কৃষিজ পরিচর্যার মাধ্যমে পোকা দমন পদ্ধতি কীটনাশক প্রয়োগ অপেক্ষা উত্তম।

জৈবিক দমন পদ্ধতিতে পোকার প্রাকৃতিক শত্রুসমূহ যেমন পরভোজী, পরজীবি এবং রোগজীবাণু কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি করে আক্রান্ত শস্য ক্ষেতে ছেড়ে দিয়ে দমন করা হয়।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১

### ১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক. যান্ত্রিক দমন বলতে কী বুঝায়?

i) হাত দ্বারা ধ্বংস করা
ii) কীটনাশক প্রয়োগ
iii) গরম পানিতে মারা
iv) জমি কর্ষণ

খ. কোন্ পোকার প্রজনন ক্ষমতা রহিত করে কৌলিকভাবে দমন করা যায়?

i) শুককীট
ii) পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী পোকা
iii) পূর্ণাঙ্গ পুরুষ পোকা
iv) পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী ও পুরুষ পোকা

### ২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।

ক. সাফল্যজনকভাবে পোকা দমন করতে হলে পোকা সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

খ. আইনগত নিয়ন্ত্রণে আক্রান্ত চারা অনুপ্রবেশে বাঁধা দেয়া হয়।

### ৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. জৈবিক দমনে পরজীবি প্রাণী হিসেবে .................. ব্যবহৃত হয়।

খ. রাসায়নিক দমন পদ্ধতিতে ................ বেশি প্রয়োগ করা হয়।

### ৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. কোন্ অবস্থায় কৃত্রিম দমন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়?

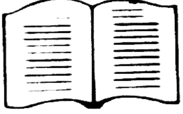
খ. কৃষিজ পরিচর্যার মাধ্যমে দমন বলতে কী বুঝায়?

## পাঠ ৫.২ রাসায়নিক কীটনাশকের শ্রেণিবিভাগ ও বর্ণনা



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- রাসায়নিক কীটনাশকের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।
- রাসায়নিক কীটনাশকের শ্রেণিবিন্যাস জানতে পারবেন।
- সচরাচর ব্যবহৃত কিছু রাসায়নিক কীটনাশকের বর্ণনা দিতে পারবেন।



### রাসায়নিক কীটনাশকের শ্রেণিবিভাগ

যেসব বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি কীটপতঙ্গকে মেরে ফেলে অথবা দমনের জন্য ব্যবহার করা হয় তাকে কীটনাশক (Insecticide) বলে। বিভিন্নভাবে কীটনাশক সমূহকে শ্রেণিবিভাগ করা যায়।

ক. রাসায়নিক প্রকৃতি ও উৎসের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস
 ১। অজৈব কীটনাশক
 ২। জৈব কীটনাশক
  ক. জৈব ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন অথবা জৈব ক্লোরিন
  খ. জৈব ফসফরাস
  গ. জৈব কার্বামেট
  ঘ. পাইরিথ্রয়েড

খ. কার্যপ্রকৃতির (Mode of action) উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস
 ১। পাকস্থলী বিষ (Stomach poison)
 ২। সংস্পর্শ বিষ (Contact poison)
 ৩। প্রবাহ বিষ (Systemic poison)
 ৪। সংস্পর্শ ও স্থানীয় প্রবেশ বিষ (Contact poison with local penetration properties)
 ৫। বিষবাষ্প বা শ্বাস বিষ (Fumigant)

**অজৈব কীটনাশক ঃ** এ কীটনাশক প্রাথমিক কীটনাশক বলে বিবেচিত হয়। এই প্রকারের কীটনাশক কার্বন ধারণ করে না। কেবলমাত্র একাধিক ধাতুর সমন্বয়ে অজৈব কীটনাশক তৈরি হয়। যেমন, মারকিউরিক ক্লোরাইড, লেড আর্সিনেট ইত্যাদি। কার্যপ্রকৃতি সাধারণত পাকস্থলী বিষ বা ভক্ষণ বিষ হয়ে থাকে। জৈব কীটনাশকের আবিস্কার ও ব্যবহার শুরু হলে অজৈব কীটনাশক তৈরি রহিত হয়।

> এই প্রকার কীটনাশক প্রধানত ক্লোরিনের পরমাণু রাসায়নিক বন্ধন দ্বারা কার্বন পরমাণুর সহিত সংযুক্ত থাকে।

**জৈব ক্লোরিন ঃ** জৈব কীটনাশকের মধ্যে জৈব ক্লোরিন কীটনাশক সর্বপ্রথম আবিস্কৃত হয়। এই প্রকার কীটনাশক প্রধানত ক্লোরিনের পরমাণু রাসায়নিক বন্ধন দ্বারা কার্বন পরমাণুর সহিত সংযুক্ত থাকে। এই প্রকারের কীটনাশক পানিতে অদ্রবনীয় এবং অনেক দিন পর্যন্ত কীটপতঙ্গের শরীরে জমা থকে। বিষক্রিয়ার স্থায়িত্ব (Residual action) কাল অনেক বেশি। এ কারণে জৈব ক্লোরিণ জাতীয় কীটনাশকের ব্যবহার বর্তমানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ সকল কীটনাশক সিক্তযোগ্য গুঁড়া (Wettable powder), তরল (Emulsifiable concentrate) এবং অ্যারোসল আকারে বাজারজাত করা হয়। যেমন, ডিডিটি, ডাইএলড্রিন, হেপ্টাক্লোর, ক্লোরডান, অলড্রিন ইত্যাদি।

**জৈব ফসফরাস ঃ** এই প্রকারের কীটনাশক ফসফরাসের পরমাণু রাসায়নিক বন্ধন দ্বারা সরাসরি কার্বন পরমাণুর সংগে অথবা পরোক্ষভাবে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন বা সালফার এর মাধ্যমে যুক্ত থাকে। জৈব ফসফরাস কীটনাশকের সংখ্যা অন্যান্য শ্রেণীর কীটনাশকের চেয়ে অনেকগুন বেশি। কোনো কোনো

কীটনাশকে একাধিক ক্রিয়ার ধরন থাকে যার ফলে একটি কীটনাশক দ্বারা কয়েকটি মাঠ ফসলের পোকা দমন করা যায়। পাকস্থলী ও সংস্পর্শ বিষ কীটনাশকগুলো প্রবাহ বিষ, সংস্পর্শ ও স্থানীয় প্রবেশ বিষ এবং বিষ বাষ্প হিসেবে কাজ করে। জৈব ফসফরাস কীটনাশক সহজে পানিতে দ্রবনীয় এবং বিষক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী থেকে স্বল্প দীর্ঘকাল স্থায়ী। মাঠ ফসল গুদামজাত শস্যদানার পোকা দমনে এই প্রকার কীটনাশক বেশি ব্যবহার করা হয়। জৈব ফসফরাস কীটনাশকের ফর্মূলেশন (আকার) নানা প্রকারের হয়ে থাকে। ডাইমেক্রন, ডায়াজিনন, ম্যালাথিয়ন, ভ্যাপোনা, সুমিথিয়ন, ডিপটেরেক্স ইত্যাদি কীটনাশক জৈব ফসফরাস শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

**জৈব কার্বামেট ঃ** কার্বনিক এসিড এস্টার এই প্রকারের কীটনাশকে থাকে। জৈব ফসফরাসের মত কাজ করে এবং সংখ্যায় কম হলেও কতকগুলো কীটনাশকের ব্যবহার কৃষিতে ব্যাপক। জৈব কার্বামেট কীটনাশক সিক্তযোগ্য গুঁড়া ও দানাদার ফর্মুলেশন হিসেবে পাওয়া যায়। সেভিন, ফুরাডান ইত্যাদি জৈব কারবামেট কীটনাশক।

গুণাবলীর দিক থেকে গুদাম-জাত শস্যদানার পোকা দমনে পাইরিথ্রয়েড ভালো কাজ করে।

**পাইরিথ্রয়েড ঃ** এই প্রকারের কীটনাশকের উৎস ছিল চন্দ্রমল্লিকা জাতীয় (ক্রিসানথিমাম) ফুল। পরবর্তীতে কারখানার সংশ্লেষিত পাইরিথ্রয়েড কীটনাশক প্রাপ্তি শুরু হলো। গুণাবলীর দিক থেকে গুদামজাত শস্যদানার পোকা দমনে পাইরিথ্রয়েড ভালো কাজ করে। কিছু শাক-সবজির পোকাও সহজে নিয়ন্ত্রন করা যায়। বিষক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী হলেও মাছের জন্য পাইরিথ্রয়েড কীটনাশক খুব মারাত্মক।

## সচরাচর ব্যবহৃত রাসায়নিক কীটনাশক

**ডাইমেক্রন ঃ** এই কীটনাশকের সাধারণ নাম ফসফামিডন। এর বাণিজ্যিক নাম ডাইমেক্রন। এর ক্রিয়ার ধরন সংস্পর্শ, পাকস্থলী ও প্রবাহমান বিষ। ইহা তৈল ও পানিতে দ্রবনীয় ও রাসায়নিকভাবে স্থায়ী এবং গাছের যে অংশের সংস্পর্শে লাগে, সেই অংশের ভিতর ঢুকে এবং কোষ রসের সংগে মিশ্রিত হয়ে গাছের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত হয়। ইহার বিষাক্ততা তিন সপ্তাহ স্থায়ী থাকে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত। ইহা ধান, পাট ও আমগাছের পোকা দমনে ব্যবহৃত হয়। এই কীটনাশক ১০০ ইসি (তরল) রূপে পাওয়া যায়।

**ডায়াজিনন ঃ** এর বাণিজ্যিক নাম বাসুডিন ও ডায়াজিনল। এর ক্রিয়ার ধরন হলো সংস্পর্শ ও স্থানীয় প্রবেশ বিষ প্রকৃতির। ইহার বিষাক্ততা এক সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। ফসলের মাজরা পোকা দমনে খুব ভালো কাজ করে। এছাড়া গাছের উপরের পোকাও দমন হয়ে থাকে। ইহা তরল ও দানাদার আকারে পাওয়া যায়।

ম্যালাথিয়ন নিরাপদে ব্যবহার বা প্রয়োগ করা যায় এবং খাদ্য শস্য, গুদামজাত শস্যদানা এবং শাক-সবজিতে কোনো বিষক্রিয়া থাকে না।

**ম্যালাথিয়ন ঃ** এই কীটনাশক যিথিওল, ফাইফানল এবং আরও অনেক বাণিজ্যিক নামে পাওয়া যায়। প্রধানত সংস্পর্শ বিষ তবে বিষবাষ্প ক্ষমতাও আছে। ইহা নিরাপদে ব্যবহার বা প্রয়োগ করা যায় এবং খাদ্য শস্য, গুদামজাত শস্যদানা এবং শাক-সবজিতে কোনো বিষক্রিয়া থাকে না। বিভিন্ন প্রকারের পোকা দমনের জন্য মাঠে, গুদামঘরে এমনকি গৃহপালিত পশু-পাখীর উপর ব্যবহার করা যায়। ম্যালাথিয়ন কীটনাশকের বিষক্রিয়ার স্থায়ীত্ব অত্যন্ত কম ৩-৫ দিন কার্যকরী থাকে। ইহা তরল ও গুঁড়া (Dust) রূপে পাওয়া যায়।

**ভ্যাপোনা ঃ** ইহার সাধারন নাম ডাইক্লোরভস এবং বাণিজ্যিক নাম নগজ, ডিডিভিপি, নুভান। ইহা সংস্পর্শ ও বিষবাস্প বিষ এবং অত্যন্ত বিষাক্ত বলে অনেক পোকা দমনে প্রয়োগ করা হয়। শাক-সবজি, গুদামজাত শস্যদানা পোকা ও মশা এবং মাছি দমনে অত্যন্ত কার্যকরী কীটনাশক। স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্যও অত্যন্ত মারাত্মক। বিষক্রিয়ার স্থায়ীত্ব অত্যন্ত কম কার্যকারীতা ২-৩ দিন। ইহা তরল আকারে পাওয়া যায়।

**সুমিথিয়ন ঃ** ইহার বাণিজ্যিক নাম একোথিয়ন, ফেনোট্রিথিয়ন, ফলিথিয়ন ইত্যাদি। ইহা সংস্পর্শ ও পাকস্থলী বিষ এবং ব্যাপক সংখ্যক পোকার দমনে ব্যবহার করা যায়। ইহার বিষক্রিয়ার স্থায়ীত্ব প্রায় ১২-১৪ দিন। তরল আকারে পাওয়া যায়।

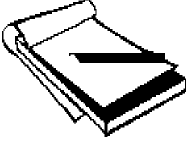
**ডিপটেরেকস ঃ** ইহার বাণিজ্যিক নাম ডিপাটেরেক্স, ডাইলকস, নেগুভন ইত্যাদি। ইহা সংস্পর্শ ও স্থানীয় প্রবেশ বিষ এবং পাকস্থলী বিষ। ইহা ফলের মাছি পোকা দমনে বিশেষভাবে কার্যকরী। ইহা সিক্তগুঁড়া আকারে পাওয়া যায়।

**সেভিন ঃ** ইহাকে কারবারিল বলে। সংস্পর্শ ও পাকস্থলী বিষ এবং স্বল্পভাবে প্রবাহ বিষ হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন প্রকারের ফসলের পোকা দমনে ব্যবহৃত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের পোকাসমূহও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। গুদামজাত শস্যের পোকাও দমন করা যায়। ইহা সিক্তগুঁড়া ও গুঁড়া আকারে পাওয়া যায়। বিষক্রিয়ার স্থায়ীত্বকাল ৫-৮ দিন।

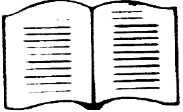
ফুরাডান কেবল কীটনাশক নয়। মাকড়নাশক ও নেমাটোড বা কৃমিনাশকেরও কাজ করে।

**ফুরাডান ঃ** সাধারণ নাম কারবোফুরান। সংস্পর্শ ও পাকস্থলী বিষ। ইহা কেবল কীটনাশক নয়। মাকড়নাশক ও নেমাটোড বা কৃমিনাশকেরও কাজ করে। ধানের মাজরাপোকা সহ অন্যান্য পোকা দমনে ব্যবহার করা হয়। ইহা দানাদার রূপে পাওয়া যায়।

**সাইপারমেথ্রিন ঃ** পাইরিথ্রয়েড জাতীয় কীটনাশক। বাণিজ্যিক নাম রিপকর্ড, সিমবুশ ইত্যাদি। আমের হপার, তূলার গুটি পোকা প্রভৃতি দমনের জন্য অনুমোদিত। তরল আকারে পাওয়া যায়।



***অনুশীলন (Activity) ঃ*** *সচরাচর যে সব আপদনাশক ব্যবহার করা হয় তাদের একটা তালিকা তৈরি করুন। আপনার এলাকায় কী কী কীটনাশকের ব্যবহার বেশি তা কারণ সহ লিখুন।*



**সারমর্ম ঃ** রাসায়নিক কীটনাশকের বিষাক্ততার কারণে পোকা মরে এবং ইহার দ্বারা দ্রুতবেগে পোকা দমন করা যায়। সবগুলো রাসায়নিক কীটনাশক কারখানায় তৈরি হয় এবং এদের শ্রেণিবিভাগ রাসায়নিক প্রকৃতি ও বিষক্রিয়ার ধরনের উপর নির্ভর করে। ক্রমাগত বিভিন্ন কীটনাশক আবিষ্কৃত হওয়ায় বর্তমানে জৈবিক কীটনাশক পোকা দমনের কাজে ব্যবহার হচ্ছে বেশি। বিভিন্ন প্রকারের কীটনাশকের মধ্যে জৈব ফসফরাস কীটনাশকের গুণগত মান বেশি থাকায় কৃষি ও জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পোকা দমনে এই শ্রেণীর কীটনাশকের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। কতগুলো রাসায়নিক কীটনাশক অত্যন্ত বিষাক্ত ও এদের স্থায়িত্বকাল বেশি থাকে। আবার কতকগুলো কীটনাশকের বিষক্রিয়ার ধরন একাধিক এবং অনেক প্রকারের পোকা দমনে ব্যবহৃত হয়।



## পাঠোত্তর ম ল্যায়ন ৫.২

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

ক. কীটপতঙ্গ দমনের জন্য নিম্নের রাসায়নিক দ্রব্যাদির কোন্‌টি ব্যবহৃত হয়?
র) মাকড়নাশক রর) কৃমিনাশক
ররর) ইঁদুরনাশক রা) কীটনাশক

খ. হেপটাক্লোর কোন্ শ্রেণীর কীটনাশক?
র) জৈব ক্লোরিন রর) জৈব ফসফরাস
ররর) জৈব কার্বামেট রা) পাইরিথ্রয়েড

**২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।**

ক. লেড আর্সিনেট এক প্রকার অজৈব কীটনাশক।
খ. ডাইমেক্রন স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত।

**৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. মাজরা পোকা দমনে ................ ভালো কাজ করে।
খ. শাক সবজির পোকা দমনে .............. ব্যবহার করা নিরাপদ।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. কোন্ প্রকারের কীটনাশক পানিতে অদ্রবনীয়?
খ. কোন্ শ্রেণীর কীটনাশকের বিষক্রিয়ার স্থায়ীত্বকাল বেশি?

## পাঠ ৫.৩ কীটনাশক ব্যবহার ও সতর্কতা



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- কীটনাশক ব্যবহারের নিয়মাবলী সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- কীটনাশক ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতির ধারণা জানতে পারবেন।
- কীটনাশক ব্যবহারকালীন করণীয় সতর্কসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।



### কীটনাশক ব্যবহার পদ্ধতি

সাফল্যজনক পোকা দমন যেমন কীটনাশকের কার্যকারীতা ও সময়মত প্রয়োগের উপর নির্ভর করে তেমন কীটনাশক ব্যবহার পদ্ধতিরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কীটনাশক প্রয়োগ পদ্ধতি নির্বাচনকালে শস্য, পোকার প্রকৃতি, স্থানীয় অবস্থা ও ব্যয় প্রভৃতি লক্ষ্যনীয়। গাছে, গুদামঘরে অথবা অন্য কোথাও কীটনাশক এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যেন পোকার সংস্পর্শে আসে। এজন্য উপযুক্ত যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে।

### সিঞ্চণ পদ্ধতি (Spraying)

পানিতে কীটনাশকের মিশ্রণ সিঞ্চণ যন্ত্রের সাহায্যে বিন্দু বিন্দু আকারে ছড়ানোকে সিঞ্চণ পদ্ধতি বলে।

সিক্তযোগ্য গুঁড়া ও তরল কীটনাশক ব্যবহারে সিঞ্চণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পানিতে কীটনাশকের মিশ্রণ সিঞ্চণ যন্ত্রের সাহায্যে বিন্দু বিন্দু আকারে ছড়ানোকে সিঞ্চণ পদ্ধতি বলে। সাধারণত সিঞ্চণ প্রয়োগ সুবিধার্থে বাহক তরলের (পানি) পরিমাণের উপর ভিত্তি করে উচ্চ ঘনফল, নিম্ন-ঘনফল এবং সর্বনিম্ন-ঘনফল সিঞ্চণ এ তিন পদ্ধতিতে ভাগ করা হয়েছে। উচ্চ-ঘনফল সিঞ্চণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে তরল মিশ্রণ উচ্চ চাপের দ্বারা সিঞ্চণ যন্ত্রের পাইপের অগ্রভাগ দিয়ে বিন্দু আকারে বের হয়। বিন্দুগুলোর আকার ১৫০ মাইক্রন অথবা অধিক। এই পদ্ধতিতে অধিক পরিমাণ তরল মিশ্রণ বা সিঞ্চণ মিশ্রণ প্রয়োজন হয়। মাঠের ছোট ফসল যেমন ধান, শাক-সবজি, তূলা প্রভৃতির জন্য প্রতি একরে ১০০ গ্যালন সিঞ্চণ মিশ্রণ লাগে এবং বড় ফসল যেমন ইক্ষুর ক্ষেত্রে উচ্চ ঘনফল সিঞ্চণ যন্ত্র দিয়ে সিঞ্চণ করলে প্রতি একরে সিঞ্চণ মিশ্রণ লাগবে ১৫০ গ্যালন। সিঞ্চণ যন্ত্রের ট্যাংক সুবিধাজনকভাবে বড় হতে হবে। কোনো কোনো সময় সিঞ্চণ যন্ত্র ট্রাকটরের সংগে যুক্ত করে সিঞ্চণ কাজ করতে হয়। সাধারণ সিঞ্চণ যন্ত্র যেমন হস্তচালিত সিঞ্চণ যন্ত্র এ পদ্ধতিতে ব্যবহার হয়। নিম্ন ঘনফল সিঞ্চণ পদ্ধতিতে কীটনাশকের মাত্রা ঠিক থাকে কিন্তু প্রতি একরে তরল মিশ্রণ কম লাগবে। উচ্চ চাপের ফলে সিঞ্চণ যন্ত্র থেকে মিশ্রণ ১৫০ মাইক্রনের চেয়ে কম আকারের বিন্দুসমূহ বের হবে। মিষ্ট ব্লায়ার এর মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। সর্বনিম্ন ঘনফল সিঞ্চণ পদ্ধতিতে কীটনাশক পানিতে মিশ্রিত করার প্রয়োজন হয় না। কীটনাশক সরাসরি পরিমাণমত জমিতে ছিটানো সম্ভব। বিমান বা হেলিকপ্টার দিয়ে আকাশ থেকে এই পদ্ধতিতে কীটনাশক ছিটানো যায় ইহাকে এরিয়াল স্প্রেইং বলে। এখানে অত্যধিক চাপের ফলে কীটনাশক ভেঙ্গে ৭০ মাইক্রন বিন্দুতে কুয়াশার ন্যায় পড়ে। সর্বন্মি ঘনফল সিঞ্চণ পদ্ধতির মাধ্যমে ধানের শীষকাটা লেদাপোকা, পামরি পোকা, গান্ধিপোকা ইত্যাদি যখন মড়ক আকারে শস্য ক্ষেতে দেখা যায় তখন বিমান দ্বারা কীটনাশক ছিটিয়ে দমন করা হয়। শহর এলাকায় ব্যাপক হারে মশা দমনে, বিস্তীর্ণ বনে এবং যেখানে স্থলভাগে প্রয়োগ সম্ভব নয় এসব স্থানে এরিয়েল স্প্রেইং করা হয়।

### গুঁড়া ছড়ান (Dusting)

গুঁড়া ছড়ান পদ্ধতিতে কীটনাশক গুঁড়া অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। পানির পরিবর্তে সূক্ষ্ম বালি অথবা করাতের গুঁড়া কীট-নাশকের সংগে মিশিয়ে ছড়ান যায়।

এই পদ্ধতিতে কীটনাশক গুঁড়া অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। পানির পরিবর্তে সূক্ষ্ম বালি অথবা করাতের গুঁড়া কীটনাশকের সংগে মিশিয়ে ছড়ান যায়। ডাস্টার নামক যন্ত্র গুঁড়া ছড়ান কাজে উপযোগী। যেখানে পানির অভাব সেখানে এই পদ্ধতি সিঞ্চণ পদ্ধতি অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক। শস্য ক্ষেতে গুঁড়া কীটনাশক ছড়ানোর সময় শান্ত আবহাওয়া থাকা বাঞ্ছণীয় এবং সকালবেলা এ কাজের জন্য উপযুক্ত সময়। উক্ত সময়ে গাছের পাতার শিশির গুঁড়া কীটনাশক ধরে রাখে, ফলে কীটনাশক গাছের নিচে পড়ে অপচয় হয় না। গুদামঘরের ফাটলে, বৃহৎ পরিমাণ গুদামজাত শস্যদানার উপর এবং বস্তার

স্তুপের উপর গুঁড়া কীটনাশক ছড়ান হয়। অল্প পরিমিত শস্যদানা ও বীজ সংরক্ষণে পোকার প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থার জন্য সাধারণভাবে কীটনাশক গুঁড়ার মিশ্রণ মিশিয়ে ব্যবহার হয়।

**বিষবাষ্প প্রয়োগ (Fumigation)**

এ পদ্ধতিতে কীটনাশক বিষবাষ্পরূপে কঠিন ও তরল অবস্থায় বিশেষ করে বদ্ধ স্থানে ব্যবহার করা হয়। পোকা দীর্ঘ সময় বিষাক্ত গ্যাস অর্থাৎ বিষবাষ্পের সংস্পর্শে থেকে মারা যায়। গুদামজাত শস্যদানার পোকা দমনে এটি একটি সুবিধাজনক পদ্ধতি। পোকা কর্তৃক আক্রান্ত শস্যদানা বিশেষ কক্ষে অথবা গ্যাস প্রতিরোধক বড় আস্তরণের ভিতরে রেখে বিষবাষ্প ব্যবহার করা হয়। প্ল্যান্ট কোয়ার‍্যান্টাইন স্টেশনে এবং খাদ্যশস্য ও বীজের গুদামঘরে বিষবাষ্প প্রয়োগ করা হয়। বিষবাষ্প হিসেবে ফসটক্সিন ট্যাবলেট প্রতি টন শস্যদানা অথবা বীজের জন্য ২টি ট্যাবলেট ব্যবহার করা হয়। তরল বিষবাষ্প যেমন ইডিসিটি, মিথাইল ব্রোমাইড ইত্যাদি বদ্ধস্থানে ব্যবহার করা যায়। মশা ও মাছি দমনে কঠিন ও তরল বিষবাষ্প যথাক্রমে কয়েল ও কেন্ডেল এবং এরোসল ঘরে ব্যবহার হয়। এক্ষেত্রে কয়েল ও কেন্ডেল আগুনে জ্বালাতে হয় এবং সৃষ্ট বিষাক্ত গ্যাস শ্বাসনালীর ভিতরে ঢুকে পোকাকে মেরে ফেলে। এরোসল চাপ দিয়ে অথবা পাত্র খুলে ব্যবহার করতে হয়। চাপের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় তরলে দ্রবীভূত এরোসলের বিষ চাপ মুক্ত হলে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে পোকা মারা যায়।

> প্ল্যান্ট কোয়ার‍্যান্টাইন স্টেশনে এবং খাদ্যশস্য ও বীজের গুদামঘরে বিষবাষ্প প্রয়োগ করা হয়।

**দানাদার প্রয়োগ (Granules application)**

কীটনাশক দানাদার আকারে জমিতে ব্যবহারকে দানাদার প্রয়োগ বলে। বীজোৎপন্ন শস্যে প্রবাহমান জৈব ফসফরাস ও জৈব কার্বামেট কীটনাশক দানাদাররূপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সাধারণত মাটিতে কীটনাশক এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। ধানের মাজরা পোকা দমনে কীটনাশকের এই পদ্ধতির ব্যবহার হচ্ছে অনেক বেশি। দানাদার কীটনাশক যেমন ডায়াজিনন ১০ডি, ফুরাডান ৩জি সরাসরি পানিযুক্ত জমিতে হাত দিয়ে ছড়ান যায়। দানাদার কীটনাশক ছড়ান যন্ত্রের মাধ্যমে বীজ বপণের সময় সারিতেও প্রয়োগ করা যায়। এছাড়া হাত দ্বারা গাছের গোড়ায় মাটিতে মিশানো যেতে পারে। তবে মাটিতে প্রচুর রস থাকতে হবে। দানাদার কীটনাশক প্রয়োগের প্রধান উপকার হচ্ছে যে, ব্যাপকহারে মাটি দুষণের বিপদ কম এবং ব্যবহারকারীর বিপদ নগন্য।

**বিষটোপ (Poison bait)**

মাটিতে অবস্থানকারী পোকা যেমন কাটুই পোকা, উঁড়চুঙ্গা, উঁই পোকা, পিঁপড়া, ধানের শীষকাটা লেদাপোকা, তেলাপোকা ইত্যাদি বিষটোপের দ্বারা দমন করা যায়। চারটি উপাদান যেমন– নিষ্ক্রিয় বস্তু (গমের ভূষি, চালের কুড়া), আকর্ষক (চিনি, গুড় অথবা শাক-সবজির তেল), কীটনাশক এবং পানি বিষটোপ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এগুলো মিশিয়ে টোপ তৈরি করে সুড়ঙ্গে বা ক্ষেতে হাত দ্বারা রাখতে হয়। রাতে ঐসব পোকা সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে টোপ খায় অথবা ভিতরে টেনে নিয়ে খায় এবং পোকা মারা যায়। বিষটোপের আকর্ষক বস্তু সহজে পোকাকে টোপের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং একাধিক পোকা একটি টোপে মরতে পারে। কুমড়া জাতীয় সবজির মাছি পোকা দমনে বিষটোপ একটি উত্তম পদ্ধতি। মিষ্টি কুমড়ার গুঁড়া, পানি ও কীটনাশক একত্রে মিশিয়ে এই বিষটোপ তৈরি করতে হয়। আক্রান্ত গাছের নিকটে একটি পাত্রে বিষটোপ রেখে দিলে মাছি পোকা আকৃষ্ট হয়ে খেয়ে মারা যায়।

> কুমড়া জাতীয় সবজির মাছি পোকা দমনে বিষটোপ একটি উত্তম পদ্ধতি। মিষ্টি কুমড়ার গুঁড়া, পানি ও কীটনাশক একত্রে মিশিয়ে এই বিষটোপ তৈরি করতে হয়।

## কীটনাশক ব্যবহারে সতর্কতা

প্রত্যেক কীটনাশক কম বেশি বিষাক্ত। সাধারণভাবে সাবধানতা অবলম্বনসহ অনুমোদিত সতর্কমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ না করলে অথবা অবহেলা করলে মারাত্মক দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই প্রতিটি কীটনাশক ব্যবহারে সতর্কতা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

## ক. কীটনাশক ব্যবহারের পূর্বে সতর্কতা

কীটনাশক পাত্রের গায়ে লিখিত নির্দেশাবলী কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

১। কীটনাশক পাত্রের গায়ে লিখিত নির্দেশাবলী কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

২। অনুমোদিত মাত্রায় কীটনাশক মিশ্রণ তৈরি করতে হবে।

৩। হাতে রবারের গ্লোবস লাগিয়ে কাঠ বা বাঁশের শলাকা দিয়ে মিশ্রণকে উত্তমভাবে নাড়তে হবে।

৪। এক কীটনাশকে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অন্য কীটনাশকে ব্যবহার করার পূর্বে পানিতে ভালোরূপে ধুয়ে নিতে হবে যাতে রাসায়নিক বিক্রিয়া না ঘটে।

৫। ব্যবহারকারীর শরীরে কোনো প্রকার ক্ষত, খোস-পাঁচড়া বা কোনো প্রকার চর্মরোগ থাকতে পারবে না। এমনকি মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে কীটনাশক ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না।

## খ. কীটনাশক ব্যবহারকালীন সতর্কতা

কীটনাশক প্রয়োগ করার সময় অতিরিক্ত কাপড় বা এপ্রোন পড়ে নিতে হবে এবং নাক, মুখ ও চোখ কীটনাশকের বিষাক্ত বাষ্প থেকে রক্ষার জন্য মুখোস ব্যবহার করতে হবে।

১। কীটনাশক প্রয়োগ করার সময় অতিরিক্ত কাপড় বা এপ্রোন পড়ে নিতে হবে এবং নাক, মুখ ও চোখ কীটনাশকের বিষাক্ত বাষ্প থেকে রক্ষার জন্য মুখোস ব্যবহার করতে হবে।

২। সব সময় বায়ু প্রবাহের অনুকূলে কীটনাশক সিঞ্চণ করতে হবে এবং প্রখর রোদে সিঞ্চণ নিষিদ্ধ।

৩। কীটনাশক ব্যবহারের সময় সর্ব প্রকারের পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪। নজেল ক্যাপের ছিদ্র বন্ধ হলে কখনও মুখের দ্বারা ফুঁ দিয়ে পরিস্কার করা যাবে না।

৫। শস্য গাছে ফুল ধরলে কীটনাশক প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা মৌমাছি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ যারা পরাগায়নে সাহায্য করে তারা মারা যাবে।

৬। পুকুর, খাল ও নালার নিকট কীটনাশক প্রয়োগে অতি সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এমনকি এসব জলাশয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ধোয়াও চলবে না। এছাড়া কোনো পশু-পাখীর খামারের নিকট কীটনাশক প্রয়োগের সময় বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে।

৭। পরিপক্ক ফসলে অল্প মেয়াদী কীটনাশক ছাড়া অন্য কীটনাশকের ব্যবহার চলবে না।

৮। কীটনাশক ব্যবহারকারীকে প্রতিদিন ছয় ঘন্টার বেশি কাজ করতে দেয়া যাবে না।

## গ. কীটনাশক ব্যবহারের পর সতর্কতা

১। কীটনাশক ব্যবহারকারীকে কাজ শেষ হওয়ার সংগে সংগে যন্ত্রপাতি ধৌত করে যথাস্থানে রেখে দিতে হবে।

২। সিঞ্চণ যন্ত্রের পানি বা অবশিষ্টাংশ কীটনাশক নিরাপদ স্থানে ফেলতে হবে।

৩। কীটনাশক ব্যবহৃত জমিতে হুসিয়ারী সাইন বোর্ড টানাতে হবে যাতে করে অত্র এলাকার কৃষক, রাখাল ও পথচারী নিরাপত্তা গ্রহণ করতে পারে।

যদি কোনো কারণে কীটনাশক পাকস্থলীতে প্রবেশ করে ফেলে, তবে তৎক্ষণাৎ বমন করাতে হবে। উষ্ণ লবণ খাইয়ে অথবা গলার মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমন করানো যায়।

৪। কীটনাশক ব্যবহারের শেষে ব্যবহারকারীকে গায়ের কাপড় খুলে সাবান দ্বারা হাত মুখ ধুয়ে বা গোসল করে নিতে হবে।

৫। কীটনাশকের পাত্র পরিস্কার করে কীটনাশকের নাম লিখে গুদামে রাখতে হবে এবং প্রয়োজন ছাড়া গুদামঘর সব সময় তালা বন্ধ করে রাখতে হবে।

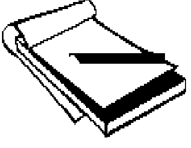
৬। কোনোক্রমেই কীটনাশকের খালি পাত্রে খাদ্য দ্রব্য বা পানি রাখা যাবে না।

৭। যদি কোনো কারণে কীটনাশক পাকস্থলীতে প্রবেশ করে ফেলে, তৎক্ষণাৎ বমন করাতে হবে। উষ্ণ লবণ খাইয়ে অথবা গলার মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমন করা যায়। অচেতন রোগীকে বমন করে যতশীঘ্র ডাক্তারের চিকিৎসাধীন নিতে হবে।

৮। শ্বাসের সংগে কীটনাশক ভিতরে গেলে রোগীকে মুক্ত আবহাওয়ায় নিতে হবে। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট দেখা দিলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে ডাক্তার ডাকতে হবে।

৯। চর্মের উপর কীটনাশক লাগলে সংগে সংগে পানি ও সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। চর্ম যদি আক্রান্ত হয় এবং তজ্জন্য যদি দৈহিক কোনো রোগ দেখা দেয় তবে অবিলম্বে ডাক্তারকে দেখানো উচিত।

১০। চক্ষু কীটনাশক দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রথমে চক্ষুর উপরিভাগ পানি দিয়ে ধুঁয়ে তারপর সম্পূর্ণ চক্ষুটাই প্রচুর পানিতে ধুঁয়ে দিতে হবে। পরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।



***অনুশীলন (Activity)*** *ঃ আপনার এলাকায় কী ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করা হয় তা বর্ণনা করুন। কীটনাশক ব্যবহারের সময় প্রয়োগকারীর কী করা উচিত?*



**সারমর্ম ঃ** কীটনাশক স্থল ও আকাশ থেকে প্রয়োগ করা হয়। সিক্তযোগ্য গুঁড়া ও তরল কীটনাশক সিঞ্চণ যন্ত্রের চাপের তারতম্যের জন্য বিভিন্ন ঘনফল পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শস্যের জমি ও বিভিন্ন স্থানে পোকা দমনে কীটনাশক প্রয়োগ করা যায়। সাধারণত গুঁড়া ও বিষবাষ্প জাতীয় কীটনাশক আবদ্ধ পরিবেশে ব্যবহার করা হয়। দানাদার ও বিষটোপ প্রয়োগের জন্য বিশেষ কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। এ প্রকারের কীটনাশকের ব্যবহার খুব সীমিত। কীটনাশক বিষাক্ত বলে ব্যবহারের পূর্বে ও পরে নানাভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, তাছাড়া দূর্ঘটনা ঘটতে পারে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৩

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

ক. পানিতে মিশিয়ে কোন্ কীটনাশক ব্যবহার করা হয়?
র) গুঁড়া রর) বিষবাষ্প
ররর) সিক্তযোগ্য গুঁড়া ও তরল রা) বিষটোপ

খ. গুঁড়া কীটনাশক ব্যবহারের উপযুক্ত স্থান কোন্‌টি?
র) শস্য ক্ষেতে রর) শাক-সবজির ক্ষেতে
ররর) গুদামঘরে রা) যে স্থানে প্রচুর পানি পাওয়া যায়।

**২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।**

ক. বিষবাষ্প প্রয়োগের সুবিধাজনক স্থান হলো ছোট মাঠ।
খ. বায়ূর অনুকূলে কীটনাশক প্রয়োগ করা নিরাপদ।

**৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. বিষটোপ তৈরির সময় কীটনাশক ছাড়া ................ কার্যকরী।
খ. চর্মের উপর কীটনাশক লাগলে ................ ব্যবস্থা নিতে হয়।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. কীটনাশক ব্যবহার নির্বাচনের সময় কী বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে?
খ. কীটনাশক ব্যবহারের পূর্বে কঠোরভাবে কী পালন করতে হয়?

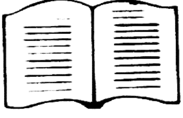
## পাঠ ৫.৪ সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার উপকারিতা জানতে পারবেন।
- সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনার নীতি আলোচনা করতে পারবেন।
- সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখতে পারবেন।

বিদেশে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা এখন ব্যাপকহারে প্রয়োগ হচ্ছে। ইউরোপিয়ান দেশসমূহে বিভিন্ন শাক-সবজির মাঠে সমন্বিত দমন ব্যবস্থা চলছে।



সমন্বিত বালাই বা আপদ দমন ব্যবস্থাপনা (Integrated Pest Management, IPM) উদ্ভিদ সংরক্ষণের একটি পদক্ষেপ যার মাধ্যমে অনেক প্রকারের দমন পদ্ধতি সমন্বয় করে বালাইসমূহ অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্তের (Economic threshold) নিচে রাখা হয়। এ প্রক্রিয়ায় অল্প পরিমান বালাই শস্য পরিবেশে অবশিষ্টাংশ হিসাবে থাকবে। সামান্য বালাইয়ের আক্রমণে শস্যের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং গাছের বৃদ্ধি ও ফলনে সহায়তা করে। কখনও আক্রমণ কিছুটা বেশি হলে শস্য নিজের ক্ষমতায় ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে। একটি মাত্র পদ্ধতির দ্বারা বালাই দমন শস্য পরিবেশে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। যেমন, ব্যাপকভাবে অনির্বাচিত আপদনাশক ব্যবহারে পোকা-মাকড়ের ধ্বংসের সংগে সংগে প্রাকৃতিক শত্রুও ধ্বংস হয় এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে থাকে। সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য বা মূলনীতি হলো পোকা-মাকড় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস নয় বরং অর্থনৈতিক ক্ষতির হাত থেকে শস্যকে রক্ষা করা। বিশেষ করে আপদনাশক ব্যবহার ব্যাপারে অর্থনৈতিক ক্ষতির ধাপ (Economic Injury level) বিবেচনায় রেখে দমন ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নেয়া। এমতাবস্থায়, অনুমোদিত মাত্রার কম আপদনাশক ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন দমন পদ্ধতি যেমন, প্রাকৃতিক, যান্ত্রিক, কৃষি পরিচর্যা, জৈবিক, রাসায়নিক, আইনগত প্রভৃতির মধ্যে যখন যেটি প্রযোজ্য তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য বা মূলনীতি হলো পোকা-মাকড় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস নয় বরং অর্থনৈতিক ক্ষতির হাত থেকে শস্যকে রক্ষা করা।

### সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনার উপাদানসমূহ (IPM Components)

শস্য ভিত্তিক (Cropping system) সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে। একটি শস্য উৎপাদনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ বীজ বপন থেকে ফসল কাটার পূর্ব পর্যন্ত নানাবিধ দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। শস্যের বিভিন্ন স্তরে যেমন চারা অবস্থা, বর্ধিত স্তর (Vegetative stage), ফুল ও ফল ধরার স্তরে বিভিন্ন পোকা-মাকড় ও রোগ আক্রমণ করতে পারে। সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনায় এসব স্তরে যখন বালাই বা আপদ (Pest) দেখা যাবে তখন উপযুক্ত দমন পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই ব্যবস্থাপনার প্রধান উপাদান হলো–

১। **পর্যবেক্ষণ ঃ** শস্যক্ষেতে আপদ বা বালাইয়ের আক্রমণ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা।

২। **জরিপ ঃ** শস্যক্ষেতে আপদ ও তার প্রাকৃতিক শত্রু শনাক্তকরণ এবং এদের সংখ্যার ঘনত্ব জরিপ করা। শস্য পরিবেশে অজীবিয় উপাদানসমূহ (Abiotic factors) জানা।

৩। **দমন নীতি ঃ** শস্যক্ষেতে কখন ও কী পদ্ধতিতে বালাই দমন করতে হবে সে সম্পর্কে জানা এবং সিদ্ধান্ত নেয়া।

সমন্বিত আপদ দমন ব্যবস্থা-পনার প্রধান উপাদান-গুলো হলো পর্যবেক্ষণ, জরিপ, দমন নীতি, দমন পদ্ধতি এবং অজীবিয় উপাদান।

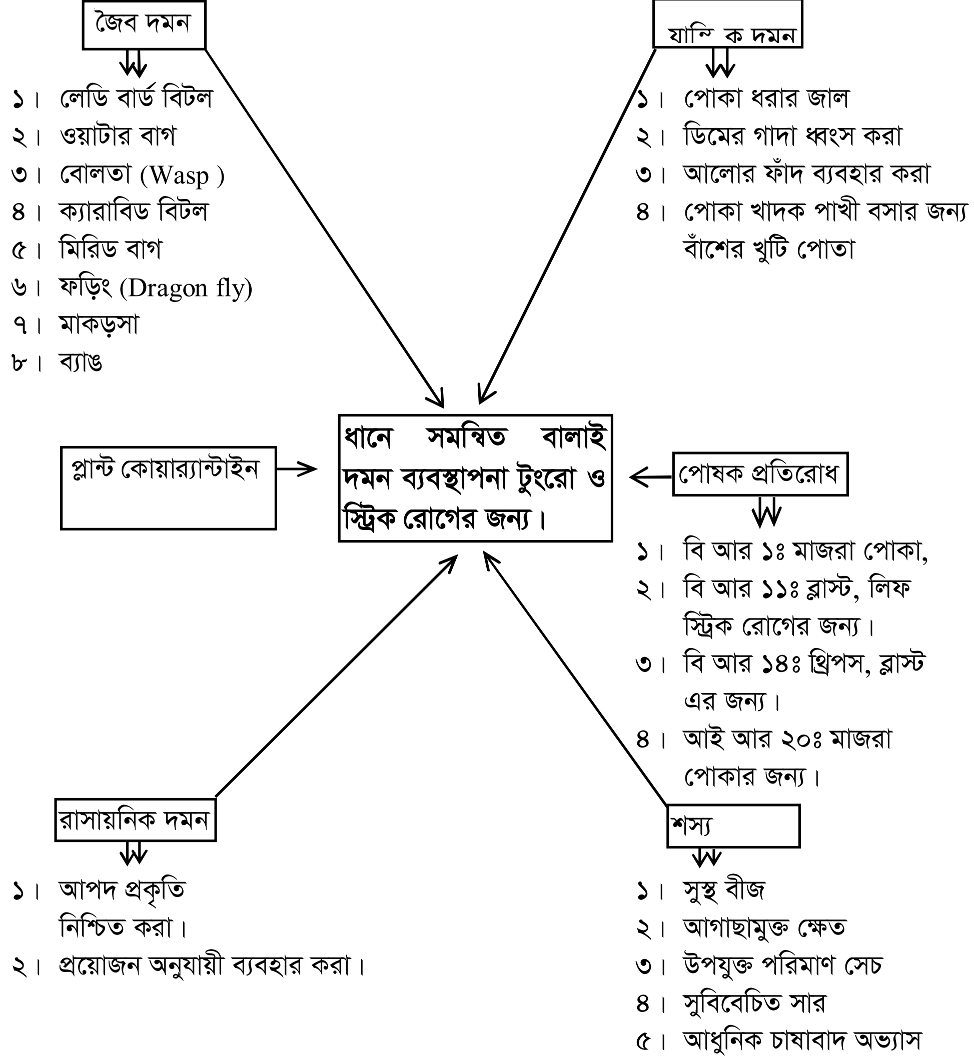
৪। **দমন পদ্ধতি ঃ** বিভিন্ন দমন পদ্ধতি যেমন যান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে হাত দ্বারা ধরে মেরে ফেলা, ব্রাস করা, শস্য পরিচর্যার মধ্যে আগাছা তুলে ফেলা, ক্ষেতে পানি দেয়া বা পানি নিষ্কাশন করা, আপদ প্রতিরোধক জাত ব্যবহার করা ইত্যাদি, জৈব দমন পদ্ধতির মধ্যে প্রাকৃতিক শত্রু যথা পরজীবি, পরভূক অথবা রোগ জীবাণু ব্যবহার করা, রাসায়নিক দমন পদ্ধতির মধ্যে নির্বাচিত কীটনাশক, মাকড়নাশক, ছত্রাকনাশকের ব্যবহার।

৫। **অজীবিয় উপাদান ঃ** শস্য উৎপাদন প্রাক্কালে আবহাওয়া যেমন তাপমাত্রা, বৃষ্টি বা আর্দ্রতা, কুয়াশা, বাতাসের গতিবেগ ইত্যাদি বালাইয়ের উপর যে বিরূপ প্রভাব ফেলছে তার ভিত্তিতে

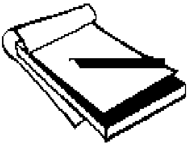
দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যেমন প্রতিকূল আবহাওয়ার অনেক আপদ প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এসব ক্ষেত্রে অন্য কোনো দমন পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।

## সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার উদাহরণ

বিদেশে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা এখন ব্যাপকহারে প্রয়োগ হচ্ছে। ইউরোপিয়ান দেশসমূহে বিভিন্ন শাক-সবজির মাঠে সমন্বিত দমন ব্যবস্থা চলছে। এশিয়ার মধ্যে ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, লাউস, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে শাক-সবজি সহ ধান ক্ষেতে এ পদ্ধতিতে আপদ দমন করা হয়। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে ধান ও শাক-সবজির (বেগুন) উপর সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি চলছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এ ব্যবস্থার অনুসরণ করা হবে।




চিত্র ৫.১ বাংলাদেশে ধানে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার (IPM) কার্যক্রম (DAE/FAO)।



***অনুশীলন (Activity)*** *ঃ আপনার এলাকায় ধানক্ষেতে আক্রান্ত মাজরা পোকা দমনের জন্য সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনায় কী কী পদ্ধতি অনুসরণ করবেন তার একটি নমূনা তৈরি করুন।*



**সারমর্ম ঃ** সমন্বিত বালাই বা আপদ দমন ব্যবস্থাপনা (Integrated Pest Management, IPM) উদ্ভিদ সংরক্ষণের একটি পদক্ষেপ যার মাধ্যমে অনেক প্রকারের দমন পদ্ধতি সমন্বয় করে বালাইসমূহ অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্তের (Economic threshold) নিচে রাখা হয়। সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য বা মূলনীতি হলো পোকা-মাকড় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস নয় বরং অর্থনৈতিক ক্ষতির হাত থেকে শস্যকে রক্ষা করা। শস্য ভিত্তিক (Cropping system) সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে। একটি শস্য উৎপাদনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ বীজ বপন থেকে ফসল কাটার পূর্ব পর্যন্ত নানাবিধ দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৪

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

ক. সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনায় বালাইসমূহের ঘনত্ব কীরূপ থাকবে?
- i) সম্পূর্ণ ধ্বংস করা
- ii) অর্থনৈতিক দ্বার প্রান্তের নিচে রাখা
- iii) অর্থনৈতিক ক্ষতির ঘনত্বের উপরে যাওয়া
- iv) কোনোটাই নয়

খ. জৈব দমন ব্যবস্থার সংগে কোন্ পদ্ধতি সমন্বিত বালাই দমনে ব্যবহৃত হয়?
- i) অজৈব দমন ব্যবস্থা
- ii) রাসায়নিক দমন
- iii) আলোর ফাঁদ ব্যবহার
- iv) শস্য প্রতিরোধকজাত

**২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।**

ক. IPM একক দমন ব্যবস্থা।

খ. অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্ত ও অর্থনৈতিক ক্ষতির ধাপের অর্থ একই।

**৩। শূণ্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. IPM প্রক্রিয়ায় অল্প পরিমাণ ---------- শস্য পরিবেশে থাকতে হয়।

খ. জৈব দমনে লেডিবার্ড বিটল ------- হিসাবে ব্যবহার হয়।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. সমন্বিত আপদ বা বালাই দমন ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়?

খ. সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থা কেন গ্রহন করা হয়?

# ব্যবহারিক

## পাঠ ৫.৫ সমন্বিত পোকা দমন পদ্ধতি অনুশীলন



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- সমন্বিত পোকা দমনে কয়টি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমন্বিত পোকা দমন পদ্ধতি কীভাবে অনুসরণ করতে হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



শুধু কীটনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে পোকা ধ্বংসের সাথে পোকার প্রাকৃতিক শত্রুও ধ্বংস হয় এবং অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। অন্যান্য দমন পদ্ধতির সংগে কীটনাশক ব্যবহার করলে অল্প মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ করা যায়। এতে পোকা সুষ্ঠভাবে দমন হয় এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকে। অনেক পোকার জন্য একাধিক দমন পদ্ধতি আছে। এসব পদ্ধতি উপযুক্ত সময়ে প্রয়োগ করলে পোকার ঘনত্ব অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্তের নিচে থাকবে অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষতির ধাপে পৌছাতে পারবে না এবং শস্যের ফলন বৃদ্ধি পাবে। এখানে সীমের জাব পোকার (Bean aphid) সমন্বিত দমন পদ্ধতি অনুশীলন করা হলো। পদ্ধতিগুলো সীমের বীজ বপনের পর থেকে সীম তোলা পর্যন্ত প্রয়োগ করতে হয়।

### প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। সীমের ক্ষেত (চারা অবস্থা)

২। হ্যান্ড লেন্স

৩। কাঁচ (ছোট আকারের)

৪। ব্রাস

৫। কাগজের প্যাকেট অথবা পলিথিন ব্যাগ (ছোট আকারের)

৬। পেট্রিডিস ৪ জোড়া (মাঝারি আকারের)

৭। গবেষণাগারে পালিত লেডি বার্ড বিটল কালচার (পরভূক)।

৮। ম্যালাথিয়ন কীটনাশক এক বোতল (ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি)

৯। হ্যান্ড স্পেয়ার (ছোট আকারের)

১০। পানি ইত্যাদি।

### পদ্ধতি

১। জাবপোকার মনিটরিং (জাব পোকার আক্রমণ শুরু হয়েছে কিনা সীম গাছ চারা অবস্থায় পরীক্ষা করুন)।

২। জাবপোকার আক্রমণে আক্রান্ত গাছে পিঁপড়া আসা যাওয়া করে। এটি ভালো করে লক্ষ্য করুন।

৩। জাবপোকার আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় ছোট কলোনি সীমের পাতায় দেখা যাবে।

৪। সাধারণ জরিপের মাধ্যমে জাবপোকার সংখ্যা বা ঘনত্ব নির্ণয় করুন। একেই সংগে জাবপোকার শত্রু লেডিবার্ড বিটল এর আবির্ভাব হয়েছে কিনা পর্যবেক্ষণ করুন।

৫। আবহাওয়ার অবস্থা যেমন, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, কুয়াশা ইত্যাদি রেকর্ড করুন।

৬। জাবপোকার সংখ্যা অথবা কলোনির উপর ভিত্তি করে দমন ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নিন।

৭। সীমের ক্ষেতে নিড়ানী দিয়ে আগাছা দূর করুন।

৮। অল্প সংখ্যক জাবপোকা দেখা গেলে যান্ত্রিক দমন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে পাতাসহ জাবপোকা হাত দ্বারা তুলে মেরে ফেলুন। এছাড়া ব্রাসিং পদ্ধতি অনুসরণ করা উত্তম। এখানে

ব্রাস দ্বারা জাবপোকা কলোনি থেকে ব্রাস করতে হবে এবং পাতার নিচে একটি কাগজের প্যাকেট বা পলিথিন ব্যাগে জাবপোকা ব্রাস করে ফেলে মেরে ফেলুন। এই পদ্ধতিকে ব্রাসিং বলে।

৯। ক্ষেতে লেডিবার্ড বিটল (পরভূক) দেখা গেলে অল্প সংখ্যক এই পোকার লার্ভা বা শুককীট গবেষণাগার থেকে পেট্রিডিসে ধরে নিয়ে আক্রান্ত সীম গাছে ছেড়ে দিন। এই পদ্ধতির নাম জৈবিক দমন (Biological control)। যদি জাবপোকার ঘনত্ব কম থাকে অর্থাৎ প্রতি সীম গাছে ৫০০ জাবপোকা অথবা কম থাকে তখন প্রতি গাছে ১৫টি লেডিবার্ড বিটলের লার্ভা ছেড়ে দিন।

১০। যদি জাবপোকার আক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করে (প্রতি গাছে ১০০০ এর বেশি জাবপোকা) তখন লেডিবার্ড বিটলের লার্ভা ছাড়ার পর ম্যালাথিয়ন কীটনাশক প্রয়োগ করুন। এখানে প্রতি আক্রান্ত গাছে ১৫টি লার্ভা ছেড়ে দিন এবং পরে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ০.০০২% মাত্রায় স্প্রে করুন।

১১। বেশি বৃষ্টিপাতে ও ঘন কুয়াশাতে জাবপোকা সহজে মারা যায়। এরূপ অবস্থায় কোনো দমন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না।

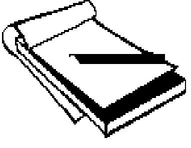
**সতর্কতা**

১। কীটনাশক ব্যবহারের পূর্বে হাতে গ্লোবস পড়ে নিন।

২। কীটনাশকের মিশ্রণ যেন শরীরের কোনো অংশে না লাগে।

৩। শরীরের কোথাও মিশ্রন লাগলে সংগে সংগে পানি দিয়ে ধুঁয়ে ফেলুন।

৪। লেডিবার্ড বিটলের লার্ভা সাবধানে ধরবেন যেন আঘাত না পায়। আঘাতপ্রাপ্ত লার্ভা জাবপোকার জৈবিক দমনে কাজ করে না।



## চূড়ান্ত মূল্যায়ন– ইউনিট ৫

১। পোকা দমনের শ্রেণিবিভাগ লিখুন।

২। প্রাকৃতিক দমন ও কৃত্রিম দমনের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

৩। আইনগত নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝেন?

৪। পাঁচটি জৈব কীটনাশকের বর্ণনা দিন।

৫। কীটনাশক ব্যবহার পদ্ধতিগুলো কী কী? তার মধ্যে যে কোনো তিনটির বর্ণনা দিন।

৬। কীটনাশক ব্যবহারের সতর্কতা বর্ণনা করুন?

৭। সমন্বিত দমন ব্যবস্থা শস্যের কোন্ অবস্থায় করতে হয় এবং প্রথমে পোকার কী দেখতে হয়?

৮। জাবপোকার সমন্বিত দমন পদ্ধতিতে জৈবিক দমন ব্যবস্থা কীভাবে করতে হয়?

৯। কোন্ কীটনাশক কীভাবে জৈবিক দমনের সংগে জাবপোকার সমন্বিত দমন পদ্ধতিতে অনুসরণ করা যায়?



## উত্তরমালা– ইউনিট ৫

### পাঠ ৫.১

১। ক. i খ. iii

২। ক. স খ. মি

৩। ক. এক প্রকার পোকা খ. কীটনাশক

৪। ক. প্রাকৃতিক দমন কার্যকরী না হলে খ. শস্যক্ষেতে নিয়মিত পরিচর্যা করা

### পাঠ ৫.২

১। ক. iv খ. i

২। ক. স খ. স

৩। ক. ডায়াজিনন খ. ম্যালাথিয়ন

৪। ক. অজৈব কীটনাশক খ. জৈব ক্লোরিন

### পাঠ ৫.৩

১। ক. iii খ. i

২। ক. মি খ. স

৩। ক. আকর্ষক খ. তৎক্ষনাৎ পানি ও সাবান দিয়ে হাত ধূয়ে ফেলা

৪। ক. পোকার প্রকৃতি ও স্থানীয় অবস্থা খ. লিখিত নির্দেশাবলী

### পাঠ ৫.৪

১। ক. ii খ. i

২। ক. মি খ. মি

৩। ক. বালাই খ. পরভূক

৪। ক. একের অধিক দমন ব্যবস্থা খ. শস্যের পরিবেশ ঠিক রাখার জন্য

ইউনিট ৬
গোলাজাত শস্যের ক্ষতিকর পোকা ও ইঁদুর

# ইউনিট ৬ গোলাজাত শস্যের ক্ষতিকর পোকা ও ইঁদুর

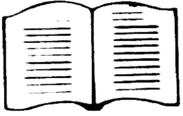
পোকা ও ইঁদুর যেমন মাঠ ফসলের ক্ষতি করে তেমন গোলাজাত শস্যেরও ক্ষতি করে থাকে। গোলাজাত শস্যের এসব আপদ (Pest) সংখ্যায় কম, কিন্তু এদের ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশি। অধিকাংশ পোকা গুদামঘরে থেকেই আক্রমণ করে এবং কতগুলোর আক্রমণ মাঠ থেকে শুরু হয়। পোকার আক্রমণ ও শস্যদানার ক্ষতি তাপ ও আর্দ্রতার উপর নির্ভরশীল। বেশি আর্দ্রতা পোকার পূর্ণ ক্ষমতায় বংশ বিস্তারের সহায়ক এবং এতে অল্প সময়ের মধ্যে গোলাজাত শস্যদানার আশাতীত ক্ষতি সাধিত হয়। ইঁদুরও পোকার ন্যায় দ্রুত বংশ বিস্তারে সক্ষম। সুতরাং পোকা ও ইঁদুর গোলাজাত শস্যের জন্য অধিকতর ক্ষতিকর। এই ইউনিট পাঠ করলে আপনি গোলাজাত শস্যের বিভিন্ন প্রকারের পোকা ও ইঁদুর এবং তাদের দমন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

## পাঠ ৬.১ গোলাজাত শস্যের ক্ষতিকর পোকার ক্ষতির প্রকৃতি, মাত্রা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- বিভিন্ন পোকা গোলাজাত শস্যকে কীভাবে ক্ষতি করে তা শিখতে পারবেন।
- পোকা কর্তৃক শস্যদানার ক্ষতির প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- শস্যদানার ক্ষতির পরিমাণ ও ক্ষতিগ্রস্থ শস্যদানার কুফলসমূহ জানতে পারবেন।



### ক্ষতির প্রকৃতি

বিভিন্ন প্রকারের পোকা ধান, চাল, গম, ভূট্টা, যব, জোয়ার ও ডালজাতীয় গোলাজাত শস্য আক্রমণ করে থাকে। পূর্ণাঙ্গ পোকা শুঁড়ের সাহায্যে গর্ত করে শস্যদানার ভিতরের শাঁস খায়। কীড়া শস্যদানার মধ্যে ফুটা করে ঢুকে এবং শাঁস খেয়ে থাকে। বিটল ও উইভিল পরিণত ও কীড়া অবস্থায় ধান, চাল, গম ইত্যাদি দানার শাঁস কুড়ে কুড়ে খাওয়ার ফলে ভিতরটি ফাঁপা করে দেয় এবং কেবল উপরস্থ আবরনটি পড়ে থাকে। আক্রান্ত ডালজাতীয় দানায় এক বা একাধিক গর্ত পরিলক্ষিত হয়। লাল শুস্‌রী পোকা শস্যদানার ভিতরে সরাসরি প্রবেশ করতে পারে না। অন্য পোকার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ শস্যদানা বা সুজি, আটা, ময়দা ইত্যাদি খেয়ে জটা তৈরি করে। এসব শস্যদানা খাওয়া যায় না।

মথ জাতীয় সুরুই পোকার কেবলমাত্র কীড়া গুদামজাত ধানের বিশেষ ক্ষতি করে। ধানের গায়ে লালচে বাদামী রঙের ডিমের উপস্থিতি এ পোকার আক্রমণের প্রধান লক্ষণ। কীড়া ধানের খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খেতে থাকে। ধান পরবর্তীতে চিটা হয়। আর এক প্রকার মথ জাতীয় সুরুই পোকা যা চাল ও গমকে সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করে। এদের কীড়াগুলো দ্বারা তৈরি জালের মধ্যে থেকে চাল ও গম খেয়ে থাকে। যদি আক্রমণ বেশি হয় তবে সম্পূর্ণ দানায় মাকড়সার জালের মত জাল দেখায়। আক্রান্ত শস্যদানা থেকে দূর্গন্ধ বের হয়, চাল ও গম খাওয়া ও বিক্রয়ের অনুপযোগী হয়ে যায়। এসব শস্যদানার ভিতর এদের বিষ্ঠাও দেখা যায়।

গুদামজাত শস্যদানার সবগুলো পোকা প্রায় সারা বছরই বংশ বিস্তার করে। কিন্তু জুন থেকে অক্টোবর এদের আক্রমণ ও ক্ষতি সবচেয়ে বেশি। কারণ এ সময় আবহাওয়ায় তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বেশি থাকে এবং দ্রুত বংশ বিস্তার ঘটে।

### ক্ষতির মাত্রা

বাংলাদেশে পোকা কর্তৃক গড়ে ১০% গোলাজাত শস্য প্রায় প্রতি বছর নষ্ট হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে পোকা কর্তৃক গড়ে ১০% গোলাজাত শস্য প্রায় প্রতি বছর নষ্ট হয়ে থাকে। তবে কোনো কোনো পোকার পৃথকভাবে ক্ষতির মাত্রা অনেকগুণ বেশি। যেমন, খাপড়া পোকার আক্রমণে প্রায় ৮-৬৯% চাল ও গম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিদেশে এ পোকার ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশি উল্লেখ আছে।

ধানের শুঁড় পোকার ক্ষতির মাত্রা কোনো সময় সর্বাধিক আকার ধারণ করে। আক্রমণের সময় বেশি দিন চললে প্রায় সম্পূর্ণ শস্যদানা ক্ষতি হতে পারে। ডালজাতীয় বীজের ক্ষতির মাত্রা ২৮-৫৫%। এ পোকার মারাত্মক আক্রমণের ফলে কিছুদিন পর সবগুলো বীজই নষ্ট হতে পারে।

**অর্থনৈতিক গুরুত্ব**

খাদ্য ও বীজ হিসেবে ব্যবহারের জন্য গোলাজাত শস্য পোকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। গোলাজাতকালীন প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রতি বছর কৃষকের ঘরে ও সরকারী গুদামে বিনষ্ট হচ্ছে। হিসেব করে দেখা গেছে শুধু সরকারী গুদামেই প্রতি বছর পোকার আক্রমণে এক লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিনষ্ট হয়। টাকার হিসেবে এটা একটি বড় অংকের। বীজের ক্ষতির পরিমাণের তথ্য নেই। এক্ষেত্রে এক বিরাট অংকের টাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এতে কোনো সন্দেহ নেই।

পোকার আক্রমণে শস্যদানার খাদ্যমান নষ্ট হয়ে যায়। শস্যদানার ভিতরের শাঁস ছিদ্র করে খাওয়ার ফলে শস্যদানার অংকুরোদগম ক্ষমতা, ওজন ও গুণাগুণ হারিয়ে ফেলে।

পোকার আক্রমণে শস্যদানার খাদ্যমান নষ্ট হয়ে যায়। শস্যদানার ভিতরের শাঁস ছিদ্র করে খাওয়ার ফলে শস্যদানা অংকুরোদগম ক্ষমতা, ওজন ও গুণাগুণ হারিয়ে ফেলে। পোকার মল, ডিম, শরীরের অংশ ইত্যাদির মিশ্রণে শস্যদানা খাদ্যের জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় শস্যদানার মধ্যে পরবর্তীতে রোগ জীবাণু আক্রমণ করে। পোকায় আক্রান্ত শস্যদানা খাওয়ার ফলে মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হতে পারে।



**সারমর্ম ঃ** গোলাজাত শস্যের অনেক পোকা আছে যাদের ক্ষতির প্রকৃতি ভিন্নতর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই পোকা কয়েক প্রকারের গোলাজাত শস্যের ক্ষতিসাধন করে থাকে। বিটল ও উইভিল পোকার পূর্ণাঙ্গ ও কীড়া শস্যদানার ভিতরে ঢুকে শাঁস খেয়ে নষ্ট করে। অন্য প্রকারের পোকার শুধু কীড়া ক্ষতিকর। পোকার আক্রমণে প্রতিবছর গোলাজাত শস্যের এক বড় অংকের ক্ষতি সাধিত হয়। আক্রান্ত শস্যদানার গুণীয় মান নষ্ট হয়ে থাকে।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.১

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

ক. গুদামজাত শস্যের ক্ষতিকর পোকার বংশ বিস্তারে কোন্‌টি সহায়ক?

i) অল্প আর্দ্রতা ii) বেশি আর্দ্রতা
iii) অল্প তাপমাত্রা iv) অত্যধিক তাপমাত্রা

খ. কোন্‌ অবস্থায় বিটল ও উইভিল শস্যদানার শাঁস খেয়ে থাকে?

i) কেবল পরিণত অবস্থায় ii) কীড়া অবস্থায়
iii) ডিম ফুটার পর iv) পরিণত ও কীড়া অবস্থায়

**২। সত্য হলে ‘‘স’’ এবং মিথ্যা হলে ‘‘মি’’ লিখুন।**

ক. পূর্ণাঙ্গ ও কীড়া পোকা ধানের খোসা খায়।
খ. শস্য দানার শাঁস পোকার খাদ্যবস্তু।

**৩। শূন্যস্থান পুরণ করুন।**

ক. বাংলাদেশে পোকা কর্তৃক প্রতিবছর গড়ে ----------- গোলাজাত শস্য নষ্ট হয়ে থাকে।
খ. ------ ও --------- হিসেবে ব্যবহারের জন্য গোলাজাত শস্য পোকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. শুস্‌রী পোকা কোন্‌ ধরনের দানা খায়?
খ. সরকারী গুদামে প্রতি বছর কী পরিমান খাদ্যশস্য বিনষ্ট হচ্ছে?

## পাঠ ৬.২ গোলাজাত শস্যের পোকা ও দমন পদ্ধতি



### এ পাঠে শেষে আপনি–

- গোলাজাত শস্যের প্রধান ক্ষতিকর পোকার নাম জানতে পারবেন।
- শস্যদানাসহ উৎপাদিত দ্রব্যাদির পোকার সাধারণভাবে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- গোলাজাত শস্যের পোকার বিভিন্ন দমন পদ্ধতি শিখতে পারবেন।



### গোলাজাত শস্যের পোকা

গোলাজাত শস্যের অনেক পোকা আছে। সবগুলো সমানভাবে ক্ষতি করে না। কতকগুলো পোকা বেশি ক্ষতি করে এবং এদের দমন ব্যবস্থা নিতে হয়। এসব পোকা প্রধান ক্ষতিকর পোকা হিসেবে বিবেচিত। প্রধান পোকাগুলোর নামসহ কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।

**ধানের শুঁড় পোকা (Rice weevil)** ঃ ছোট আকারের উইভিল। লাল বা কালচে বাদামী রঙের এবং সামনের দিকে লম্বা শুঁড় আছে। একটি স্ত্রী উইভিল তার দেড় মাস আয়ুকালে অনেকগুলো ডিম পাড়ে। ডিম থেকে সাদা কীড়া বের হয়ে শস্যদানার ভিতরের শাঁস খেতে থাকে। এক জোড়া পোকা চার মাসের মধ্যে পাঁচ লক্ষ পোকার জন্ম দিতে পারে। গোলাজাত চাল, ধান, গম, ভূট্টা ইত্যাদির একটি অন্যতম ধ্বংসাত্মক পোকা।

**কেড়ী পোকা (Lesser grain borer)** ঃ কালচে বাদামী রঙের ছোট বিটল। মাথা গোল এবং নিচের দিকে নোয়ানো। এ পোকা শস্যদানার ভ্রূণের কাছে থোকা করে ডিম দেয়। সাদা কীড়া শস্যদানার মধ্যে ফুঁটা করে ঢুকে অথবা অন্যান্য পোকা দ্বারা পরিত্যক্ত চালের গুড়ার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। ধান, গম ও ভূট্টা এমনকি কাঠ, শুকনা ফল, গোল আলু ইত্যাদিতে আক্রমণ করে।

**শুসরী পোকা (Saw toothed grain beetle)** ঃ বাদামী রঙের ছোট বিটল। গ্রীবার দুইপাশে করাতের ন্যায় ছোট দাঁত সাজানো থাকে। এই পোকা অনেক দিন বেঁচে থাকে, শীতের দেশে ৫ বছরেরও বেশি বাঁচতে দেখা গেছে। স্ত্রী বিটল সাদা রঙের ডিম দেয়। খাদ্য দ্রব্যাদির মধ্যে ডিম সমূহ আলতোভাবে জমা হয় অথবা শস্যদানার ভিতরে জমা হয়। ধান, চাল, গম, যব, সবজি, আটা, খৈল ইত্যাদি গোলাজাত দ্রব্যাদিতে আক্রমণ করে।

খাপড়া পোকা আক্রান্ত গুদামের মেঝে বা দেয়ালের ফাটলে লুকিয়ে থাকে এবং নতুন শস্যে আক্রমণ করে।

**খাপড়া পোকা (Khapra beetle)** ঃ মিশ্রিত সাদা ও বাদামী রঙের গোলাকার আকারের বিটল। কীড়া বাদামী আভাযুক্ত হলদে, সমস্ত শরীর লম্বা লালচে লোমে আবৃত এবং পিছনের লোমগুলো অনেকটা লেজের মত দেখায়। জীবন চক্র সম্পন্ন হতে চার মাস লাগে। আক্রান্ত গুদামের মেঝে বা দেয়ালের ফাটলে লুকিয়ে থাকে এবং নতুন শস্যতে আক্রমণ করে। এ পোকা গোলাজাত গম ও চালের মারাত্মক ক্ষতিকারক।

**লাল শুসরী পোকা (Red grain beetle)** ঃ লাল বাদামী রঙের খুব ছোট বিটল। এদের শুঙ্গের শেষের তিনটি অংশ অপেক্ষাকৃত বড়। ডিমগুলো খাদ্য বস্তুর দ্বারা ঢাকা থাকে। কীড়া সাদা ও হলদে বর্ণের। অক্ষত দানাসমূহ সাধারণত এ পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয় না। আটা, সুজি, ময়দা, ইত্যাদিতে এ পোকা যায়। সাধারণত খাদ্য গুদাম বা ওয়ার হাউজগুলোতে বেশি আক্রমণ করতে দেখা যায়।

বিভিন্ন প্রকার গুদামজাত ডালশস্য যেমন, মসুর, মুগ, ছোলা, অড়হর, খেসারী ইত্যাদি আক্রমণ করে থাকে।

**ডালের পোকা (Pulse beetle)** ঃ ধুসর-লাল বাদামী বর্ণের বিটল। এদের প্রথম জোড়া ডানার দ্বারা পেট সম্পূর্ণ আবৃত হয় না। শুঙ্গ করাতের মত। বিভিন্ন প্রকার গুদামজাত ডালশস্য যেমন, মসুর, মুগ, ছোলা, অড়হর, খেসারী ইত্যাদি আক্রমণ করে থাকে।

**ধানের সুরুই পোকা (Rice moth) ঃ** খড় রঙের ছোট মথ। এদের সামনের পাখায় কয়েকটি দাগযুক্ত, পিছনের পাখার শীর্ষপ্রান্ত বেশ চোখা এবং উভয় পাখার পিছনের কিনারা জুড়ে ঝালরের মত লোম আছে। স্ত্রী মথ ধানের খোসার উপর একটি বা গুচ্ছাকারে ৩৫-১২০টি ডিম পাড়ে। তবে এরা দেওয়াল বা মেঝের ফাটলেও ২-৩ দিন ধরে ক্রমাগতভাবে ডিম পেড়ে থাকে। কীড়াগুলো ১১-২৫ দিন পর্যন্ত কীড়া অবস্থায় থাকে এবং শস্যদানার ক্ষতি করে থাকে। এটি গুদামজাত ধানের বিশেষ অনিষ্টকারী পোকা। ধান ছাড়াও জোয়ার, গম, ভূট্টা ইত্যাদি দানারও বেশ ক্ষতি করে থাকে।

**চালের সুরুই পোকা (Rice meal moth) ঃ** ধানের সুরুই পোকার মথ অপেক্ষা এ পোকার মথ কিছুটা বড় এবং হালকা ধূসর বাদামী রঙের। মথ রাতে সক্রিয় থাকে। মিলনের ১-২ দিন পর স্ত্রী মথ দেয়াল, বস্তা বা দানার উপরে প্রায় ২০০ টি ডিম পাড়ে। ডিমগুলো সাদা ও ডিম্বাকার। কীড়া হলুদ মাথাযুক্ত ক্রীম সাদা রঙের এবং ৩-৫ সপ্তাহে পুত্তলীতে পরিণত হয়। পুত্তলী থেকে প্রায় ১০ দিন পর মথ বের হয় এবং ১ বা ২ সপ্তাহ বেঁচে থাকে। চাল, গম ও সীমবীজ ছাড়া খৈল, শুষ্ক ফল, কোকো, বিস্কুট, সুজি, আটা ইত্যাদি আক্রমণ করে। চাল এদের দ্বারা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। কীড়াগুলো রেশমী জালের নিচে থেকে চাল ও গমের ক্ষতি করে।

> কীড়াগুলো রেশমী জালের নিচে থেকে চাল ও গমের ক্ষতি করে।

## দমন পদ্ধতি

গোলাজাত শস্যদানার পোকার দমন পদ্ধতিকে প্রধানত দু' ভাগে ভাগ করা যায়, যথা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা।

**প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে নেয়া ব্যবস্থা) ঃ**

১। অল্প পরিমাণ শস্যদানা গোলাজাত করার জন্য ধাতব পাত্র (Metal bin) এবং বেশি পরিমাণ (Bulk storage) শস্যদানার জন্য সিমেন্ট নির্মিত পাকা গোলাঘর ব্যবহার করতে হবে।

২। গোলাজাত করার পূর্বে শস্যদানা ভালোভাবে ঝেড়ে পরিস্কার করে ৪-৫ দিন রোদে শুকিয়ে দানার জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ১২% এর নিচে আনতে হবে।

৩। গোলাঘর আবর্জনামুক্ত করতে হবে এবং কোনো ফাটল ও গর্ত থাকলে সেসব সিমেন্ট বা আলকাতরা দ্বারা পূরণ করে দিতে হবে। কেননা এসব স্থান পোকার আশ্রয়স্থল।

৪। গোলাঘরে উপযুক্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে খোলা রাখতে হবে এবং বর্ষাকালে আর্দ্র হাওয়া প্রবেশে বাঁধা দেওয়ার জন্য বন্ধ রাখতে হবে।

> গোলাঘরে উপযুক্ত বায় চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে খোলা রাখতে হবে এবং বর্ষাকালে আর্দ্র হাওয়া প্রবেশে বাঁধা দেওয়ার জন্য বন্ধ রাখতে হবে।

৫। বীজ হিসেবে শস্যদানা রাখতে হলে কীটনাশক যেমন, ১ পাউন্ড ম্যালাথিয়ন অথবা সেভিন ১০% গুঁড়া (Dust) প্রতি ৪০ মন বীজের সংগে মিশিয়ে গোলাজাত করা যায়। কীটনাশকের পরিমাণ কম হওয়ায় উল্লেখিত কীটনাশকের সংগে ২০ ভাগ রাস্তার সুক্ষ্ম ধুলি মিশানো যেতে পারে। এছাড়া প্রতি ১ মন শস্যদানার সংগে ১১৬ গ্রাম (২ ছটাক) নিম বা বিষকাটালী শুকনো পাতার গুঁড়া ভালোভাবে মিশিয়ে গোলাজাত করলে পোকার আক্রমণ প্রতিহত হয়। এ বনজ গুঁড়ো পোকার প্রতি খাদ্যনিরোধক ও বিকর্ষক হিসেবে কাজ করে।

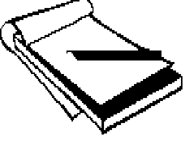
**প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা (আক্রান্ত হওয়ার পর নেয়া ব্যবস্থা) ঃ**

১। আক্রান্ত শস্যদানা কড়া রোদে বেশিক্ষণ রাখার পর উত্তমরূপে ঝেড়ে নিলে পোকা সহজে দমন করা যায়।

২। প্রতি টন শস্যদানার জন্য ২টি ৩ গ্রাম ওজনের ফসটক্সিন (Phostoxin) টেবলেট ব্যবহার করা যেতে পারে। খাদ্যশস্যের বস্তা পলিথিন দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে এবং পলিথিনের খোলা চারপাশ মাটি বা বালি দিয়ে আইলের মত বেঁধে দিতে হবে যেন বিষবাষ্প বের হতে না পারে। ফসটক্সিনের স্থলে (EDCT) কীটনাশক প্রতি ২৫ মণে ১-১.৫ পাউন্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

> প্রতি টন শস্যদানার জন্য ২টি ৩ গ্রাম ওজনের ফসটক্সিন টেবলেট ব্যবহার করা হয়।

৩। সংরক্ষিত শস্যদানার বস্তার স্তুপের উপর প্রতি ১০০ ঘনফুটে ম্যালাথিয়ন অথবা সেভিন ১০% ডাষ্ট ৮ আউন্স অনুপাতে ছিটাতে হবে।



***অনুশীলন (Activity)*** *ঃ আপনার গুদামে রক্ষিত বিভিন্ন রকমের ডাল কোন্ কোন্ পোকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এই ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবার জন্য আপনি কী ব্যবস্থা নিবেন তা বর্ণনা করুন।*



**সারমর্ম ঃ** উইভিল, বিটল ও মথ জাতীয় পোকা দ্বারা গোলাজাত শস্য আক্রান্ত হয়। প্রথম দুই প্রকারের পোকা প্রায় সবপ্রকারের শস্যদানা খেয়ে ক্ষতি করে এবং মথ পোকার আক্রমণ কেবল ধান, চাল ও গমে সীমাবদ্ধ। সবগুলো শস্যদানার পোকার জীবনে চারটি স্তর আছে। কীড়া বা শুককীট অধিকতর ক্ষতিকর। উইভিল ও বিটল পোকা পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় দীর্ঘদিন বাঁচে এবং মথের আয়ুকাল অল্প দিনের। গোলাজাত শস্যের পোকা প্রতিরোধমূলক ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থায় দমন করা যায়। প্রতিরোধমূলক ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা যথাক্রমে পোকার আক্রমনের পূর্বে এবং আক্রমনের পরে নেয়া হয়ে থাকে।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.২

### ১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

ক. ধানের শুঁড় পোকা কোন্ অঙ্গের দ্বারা চেনা যায়?

i) লম্বা শুঁড় ii) মোটা ও ছোট শুঁড়
iii) দু'জোড়া পাখা iv) তিনজোড়া পাখা

খ. কেড়ী পোকা শস্য দানার কোন্ অংশে ডিম পাড়ে?

i) ভিতরে ii) পিছনে
iii) ভ্রুনের কাছে iv) মাঝে

### ২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।

ক. চালের শুরুই পোকার কীড়া রেশমী জালের নিচে থেকে চালের ক্ষতি করে।
খ. বীজ হিসেবে শস্যদানা সংরক্ষণের জন্য সেভিন ১০% গুড়া ব্যবহার করা হয়।

### ৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. গোলাজাত শস্যের সবগুলো পোকা ---------- ক্ষতি করে না।
খ. শস্যদানা গোলাজাত করার পূর্বে রোদে শুকিয়ে জলীয় বাষ্পের পরিমান --------- এর নিচে আনতে হবে।

### ৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. শুসরী পোকা চেনার উপায় কী?
খ. খাপড়া পোকার কীড়া দেখতে কী রকম?

## পাঠ ৬.৩ ইঁদুর পরিচিতি ও প্রকৃতি



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- মানুষের প্রধান অনিষ্টকারী প্রাণী ইঁদুর সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কৃষিক্ষেত্রে ইঁদুরের ক্ষতি সম্বন্ধে লিখতে পারবেন।
- ইঁদুরের স্বভাব আলোচনা করতে পারবেন।



### ইঁদুর পরিচিতি

ইঁদুর মেরুদন্ডী প্রাণী, আপদ হিসেবে মানুষের অন্যতম শত্রু এবং প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের সাথে পরিচিত। উৎপাদিত ফসলকে মাঠে ও গুদামে যথেষ্ট ক্ষতি করে। বাংলাদেশে সমগ্র ফসলের প্রায় ১০-২০% ফসল প্রতি বছর ক্ষতিগ্রস্থ হয় ইঁদুর দ্বারা। এছাড়া ইঁদুর প্রতি বছর আমাদের দেশে ৩০০-৪৮০ কোটি টাকার ফসল সহ অন্যান্য সম্পদ নষ্ট করে।

ইঁদুরের উভয় দন্ত পাটিতে সামনে একজোড়া করে অত্যন্ত তীক্ষ , ধারালো, ও সদাবর্ধিঞ্চু ছেদন দন্ত থাকে এবং এই দন্তের ক্রামাগত বৃদ্ধিকে কমিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখার জন্য বিভিন্ন দ্রব্যাদি কাটে। ইঁদুর কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র, ব্যাগ, বৈদ্যুতিক তার ইত্যাদি কেটে নষ্ট করে। এরা মাটিতে গর্ত খোঁড়ে এবং বহু বাঁধ, আইল, পুল ইত্যাদি অকালে ধ্বংস করে। মানুষের খাদ্যে ভাগ বসায় এবং তার অপচয় ঘটায়। এদের মলমূত্র দ্বারা খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয় এবং ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ইঁদুর মানুষের জন্য বহু মারাত্মক রোগ ঃ যেমন– প্লেগ রোগের জীবাণুর বাহক এবং এ রোগের সংক্রমণ ঘটায়। বিভিন্ন প্রজাতির ইঁদুর কৃষিক্ষেত্রে যে ক্ষতির ভূমিকা পালন করে তার বর্ণনা এখানে দেয়া হলো।

> ইঁদুর ধান ও গম ক্ষেতের মাঝে মাঝে শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট সুড়ঙ্গ তৈরি করে বসবাস করে এবং গর্তের মুখে মাটির ঢিবি হলো এদের উপস্থিতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

**কালো মেঠো ইঁদুর (Black field rat)** ঃ এরা কালো এবং বেশ হিংসুক প্রকৃতির এবং ঘরের নেংটি ইঁদুর বা গেছো ইঁদুর তাড়িয়ে দিয়ে সে স্থান দখল করে। এরা গর্ত খোড়া এবং সাঁতারে বেশ পটু। প্রয়োজনের চেয়ে এরা অনেক বেশি খাদ্য মজুদ রাখে। একটি গর্ত থেকে ১০ কেজি পর্যন্ত ধান পাওয়া যায়। এরা মাঠ ও গুদামজাত শস্যকে আক্রমণ করে। ধান ও গম ক্ষেতের মাঝে মাঝে শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট সুড়ঙ্গ তৈরি করে বসবাস করে এবং গর্তের মুখে মাটির ঢিবি হলো এদের উপস্থিতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

**বড় কালো মেঠো ইঁদুর (Large banincoot)** ঃ এটি সবচেয়ে বড় আকারের ইঁদুর। দেখতে অনেকটা কালো মেঠো ইঁদুরের মত এবং বেশ হিংস্র। জলি আমন ধান এদের দ্বারা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এরা সাধারণত বিল-ঝিল, নিচু এলাকায় বাস করে। বর্ষাকালে জলি আমন ধান ক্ষেতে অথবা বড় কচুরীপানায় এরা বসবাস করে। এরা ঘর-বাড়ীতে যায় না।

**গেছো ইঁদুর (House or roof rat)** ঃ দেখতে কিছুটা লম্বাটে। এরা গর্ত তৈরি করতে পারে না এবং বসতবাড়ীর আশেপাশে লুকিয়ে থাকে। এরা গাছেও উঠতে পারে। গুদামজাত শস্য, আসবাবপত্র এবং উঁচু মাঠে ও বসতবাড়ীর আশেপাশের শাক-সবজি ও ফল বাগানের ফলের প্রচুর ক্ষতি করে।

> দানাজাতীয় শস্যের ক্ষেতে ফসল পাকার পর নেংটি ইঁদুরের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়।

**মাঠের নেংটি ইঁদুর (Field mouse)** ঃ আকারে বেশ ছোট। লেজ ছাড়া ৫-৮ সে. মি. লম্বা এবং ধূসর বাদামী রঙের। মাঠে এরা ছোট ছোট শাখা-প্রশাখাহীন গর্ত তৈরি করে এবং এই গর্তে জোড়ায় জোড়ায় থেকে বংশ বৃদ্ধি করে। দানাজাতীয় শস্যের ক্ষেতে ফসল পাকার পর এদের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়।

**সোলই বা ঘরের নেংটি ইঁদুর (House mouse)** ঃ এরা খুবই ছোট। লেজসহ ১৫-২০ সে. মি.। সাধারণত মানুষের ঘরে বাস করে বইপত্র, শস্যদানা ইত্যাদি নষ্ট করে।

**নরওয়ে বা বাদামী ইঁদুর (Brown rat) ঃ** বাদামী রঙের, বুক ও পা সাদা রঙের। নাকের অগ্রভাগ কিছুটা ভোতা। এরা মাঠ ফসলের বেশি ক্ষতি করে না। শহর, বন্দর ও বিভিন্ন গুদামে এদের পাওয়া যায়।

নরম পশমযুক্ত ইঁদুর ধান ক্ষেত থেকে ধানের ছড়া কেটে এনে গর্তে জমা করে।

**নরম পশমযুক্ত ইঁদুর (Soft furred rat) ঃ** এদের গায়ের পশম কোমল ও ধূসর বাদামী বর্ণের। এরা সাধারণত রাতের বেলায় চলাফেরা করে এবং দলবদ্ধভাবে বাস করে। সাঁতারে বেশ পটু। ধান ক্ষেত থেকে ধানের ছড়া কেটে এনে গর্তে জমা করে। সাধারণত মাঠে বা বাঁধে গর্ত খোঁড়ে বাস করে। ধান ছাড়া গম ও বার্লি এদের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

## ইঁদুরের স্বভাব প্রকৃতি

ইঁদুর সারা বছরই গর্ভধারণ এবং বাচ্চা দিতে পারে। এদের জন্ম অতিরিক্ত গরমে ও ঠান্ডায় কমে যায়। বছরে গড়ে একজোড়া ইঁদুর হতে কয়েকটি প্রজন্মের মাধ্যমে মোটসংখ্যা ৮০০-১০০০ এ গিয়ে দাড়ায়।

ইঁদুর সাধারণত নোংরা জায়গায় থাকতে ভালবাসে। অধিকাংশ ইঁদুরই রাতে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠে। এরা সব সময় নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায় এবং লুকিয়ে চলাফেরা করে। বাদামী ইঁদুর দলবদ্ধভাবে, গেছো ইঁদুর অস্থায়ী দলে, কালো ইঁদুর প্রায় সব সময় একাকী চলাফেরা করে। মাঠের কালো ইঁদুর তৈরিকৃত গর্ত হতে প্রায় ২০ মিটারের মধ্যে চলাফেরা করে।

ইঁদুরের দর্শণ শক্তি দূর্বল প্রকৃতির। তবে এদের শ্রবণ, ঘ্রাণ ও স্বাদ ইন্দ্রিয় অত্যন্ত উন্নত। সদ্য জন্মপ্রাপ্ত একটি ইঁদুর স্পর্শে ও শব্দে সাড়া দিতে পারে।

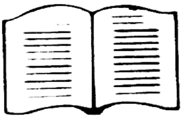
গর্ত করা, গাছে চড়া, লাফ দেয়া এবং সাঁতার কাটা অনেক ইঁদুরের অভ্যাস। কতকগুলো ইঁদুর মেঝে হতে প্রায় ১ মিটার উর্ধ্বে ও লম্বাভাবে লাফ দিতে পারে। এসব কারণে এরা সব সময় পরিবেশের উপর নির্ভর করে বসবাসের স্থান পরিবর্তন করে।

ইঁদুর খায় না এমন জিনিষ কম। ইঁদুর প্রতি রাতে এদের শরীরের ওজনের প্রায় ১০% খাদ্য খায়।

ইঁদুর খায় না এমন জিনিষ কম। এদের কর্তন দাঁতকে ঠিক রাখার জন্য সব সময় কিছু কাটতেই হয়। ইঁদুর প্রতি রাতে এদের শরীরের ওজনের প্রায় ১০% খাদ্য খায়। লুকিয়ে খেতে পছন্দ করে।

আশেপাশের নতুন বস্তুকে এড়িয়ে থাকে। নতুন বস্তুকে গ্রহণ করতে এক অথবা একাধিক দিন লেগে যায়। বিশেষ করে বিষটোপ বাক্স অথবা ফাঁদ। নেংটি ইঁদুরের নতুন বস্তুসমূহের প্রতি অধিক কৌতূহল পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ ইঁদুর মানুষের আবাসস্থলে ও শস্যের সংস্পর্শে থাকে বলে এরা সর্বভূক প্রকৃতির। কালো মাঠ ইঁদুর উদ্ভিদভোজকীও বটে।

ঘর, বাড়ী ও ক্ষেতে ইঁদুরের টাটকা গর্ত দেখে সহজেই এদের উপস্থিতি বুঝা যায়। কাদা বা বালিতে এদের পায়ের ছাপ দেখা যায়। নষ্ট ধান গাছ, ফল, বস্তা এবং কাঠামোসমূহ থেকেও বুঝা যায়। এরা এসব তেরছা করে কেটে ক্ষতি সাধন করে।



**সারমর্ম ঃ** মেরুদন্ডী প্রাণীদের মধ্যে ইঁদুর আদিকাল থেকেই মানুষের প্রধান আপদ হিসেবে পরিচিত। কৃষি ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ পোকার পরই ইঁদুরের স্থান। ইঁদুর মাঠ ও গুদাম শস্যের ক্ষতি করা ছাড়াও আরও অনেক সম্পদ নষ্ট করে থাকে। মারাত্মক রোগ ইঁদুর কর্তৃক বিস্তার লাভ করে। ইঁদুর তার উভয় দন্ত পাটির একজোড়া সদাবর্ধিষ্ণু ছেদনদন্ত কাটার কাজে লাগায়। বাংলাদেশে মাঠ ও ঘরবাড়ীতে সাত প্রজাতির ইঁদুরের মধ্যে চার প্রজাতি প্রধান অনিষ্টকারী। মাঠে বিশেষ করে ধান ও গম পাকার পূর্বে ও পরে এদের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। ঘর-বাড়ীতে গুদামজাত শস্যদানাসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি কেটে ও খেয়ে বিনষ্ট করে। ইঁদুরের প্রজনন ক্ষমতা খুব বেশি এবং সারা বছরই বাচ্চা দেয়। সীমাবদ্ধ স্থানে কেবলমাত্র রাতে চলাফেরা করে এবং লুকিয়ে খেতে পছন্দ করে। এদের ঘ্রান ও স্বাদ শক্তি অত্যন্ত প্রখর। নতুন বস্তু সহজে গ্রহণ করতে চায় না। ফসলের ক্ষেতে ও ঘর-বাড়ীতে এদের গর্ত, মল ও কাটা দ্রব্যাদি দেখে এদের উপস্থিতি অনুমান করা যায়।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৩

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

ক. ইঁদুর দ্বারা বাংলাদেশের সমগ্র ফসলের প্রতিবছর ক্ষতির পরিমাণ কত?

i) ৫-৮% ii) ১০-১৫%
iii) ১০-২০% iv) ২০-৩০%

খ. ইঁদুরের ধান গাছ, ফল, বস্তা ইত্যাদির কাটার লক্ষন কী?

i) লম্বাভাবে কাটা ii) পাশ দিয়ে কাটা
iii) তেরছা করে কাটা iv) গোল করে কাটা

**২। সত্য হলে ‘‘স’’ এবং মিথ্যা হলে ‘‘মি’’ লিখুন।**

ক. ইঁদুর সাধারণত দিনের বেলায় সক্রিয়।
খ. বড় কালো মেঠো ইঁদুর জলি আমন ধান নষ্ট করে।

**৩। শুন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. ইঁদুর মানুষের জন্য বহু ----- রোগ ছড়ায়।
খ. কালো মেঠো ইঁদুরের একটি গর্ত -------- পর্যন্ত ধান পাওয়া যায়।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. ইঁদুরের উভয় দন্ত পাটির সামনে কত জোড়া ছেদন দন্ত থাকে?
খ. মাঠে কোন্ ইঁদুর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে

## পাঠ ৬.৪ ইঁদুর দমন পদ্ধতি



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- ইঁদুর দমনের পূর্বের তথ্য জানতে পারবেন।
- ইঁদুর দমনের বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনা দিতে পারবেন।
- দমনকালে অন্যান্য কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।

### দমন পদ্ধতি



দমন ব্যবস্থার প্রথমেই আসে প্রতিনিয়ত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, সতর্ক দৃষ্টি এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা। ইঁদুরের গতি বিধির উপর নিয়মিত সতর্ক দৃষ্টি রাখা সাপেক্ষে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে পারলে ইঁদুর দমনের অর্ধেক, অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়। তাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ইঁদুরের উপস্থিতি ও গতিবিধি লক্ষ্য করে প্রয়োজনীয় দমন ব্যবস্থা নেয়া উচিত। ইঁদুর দমন পদ্ধতি প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে – অরাসায়নিক দমন পদ্ধতি ও রাসায়নিক দমন পদ্ধতি।

**অরাসায়নিক দমন পদ্ধতি (Non-chemical control)**

১। পাকা গুদাম ঘর ও ধাতব নির্মিত পাত্র শস্যদানা রাখার জন্য ব্যবহার করতে হবে। এতে ইঁদুর ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। গুদামের সমস্ত ফাঁক ফোকর সিমেন্ট বা টিনের পাত দ্বারা বন্ধ করতে হবে।

ক্ষেতের আইল যথাসম্ভব সরু এবং পরিস্কার রাখতে পারলে ইঁদুর গর্ত করার সুযোগ পায় না।

২। ঘর-বাড়ী নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এতে ইঁদুর নিরাপত্তার অভাবে জায়গা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবে। ক্ষেতের জমি ও আইল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ক্ষেতের আইল যথাসম্ভব সরু এবং পরিস্কার রাখতে পারলে ইঁদুর গর্ত করার সুযোগ পায় না।

৩। ঘরের সংগে লেগে থাকা গাছপালা ছাটাই করে দিতে হবে এবং মাটি হতে ২ মিটার উঁচুতে কান্ডের চারপাশে ৪৬-৬১ সে.মি. টিনের মসৃন পাত লাগিয়ে দিতে হবে।

৪। মাচায় তৈরি গোলাঘরের প্রতিটি খুঁটিতে একখন্ড করে মসৃন টিন লাগাতে হবে।

৫। ঘরের জানালা ও দরজা শক্তভাবে লাগাতে হবে যেন লাগানোর পর কোনো ফাঁক না থাকে ।

ইঁদুরের গর্ত খুঁড়ে বা গর্তে পানি অথবা ধোঁয়া দিয়ে ইঁদুর দমন করা যায়। গর্তের মুখে শুকনা মরিচ পুড়িয়ে ধোঁয়া দিলে তাড়াতাড়ি ইঁদুর বেরিয়ে আসে।

৬। ইঁদুরের গর্ত খুঁড়ে বা গর্তে পানি অথবা ধোঁয়া দিয়ে ইঁদুর দমন করা যায়। গর্তের মুখে শুকনা মরিচ পুড়িয়ে ধোঁয়া দিলে তাড়াতাড়ি ইঁদুর বেরিয়ে আসে।

৭। ঘরে বা মাঠে বিভিন্ন ধরনের ইঁদুর মারা ফাঁদ যেমন স্প্রিং টাইপ, কেস টাইপ ইত্যাদি ফাঁদ পেতে ইঁদুর দমন করা যায়। ফাঁদে টোপ যথা শুটকী মাছ, রুটি, চালভাজা ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়। ইঁদুরের রাস্তায় এ ফাঁদ রাখতে হয়।

৮। পরভোজী প্রাণী যেমন– বিড়াল বাড়ীতে পুষে ইঁদুর দমন করা যায়। এছাড়া কুকুর, চিল, পেঁচা, বেজী, গুঁই সাপ ইঁদুর খায় এবং এসব প্রাণী বিনা কারণে না মেরে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

**রাসায়নিক দমন পদ্ধতি (Chemical control)**

দুই প্রকারের রাসায়নিক বিষ (Rodenticide) বিষটোপ হিসেবে ইঁদুর দমনে ব্যবহৃত হয়। যেমন–তাৎক্ষনিক বা তীব্র বিষ এবং বহুমাত্রা বা দীর্ঘস্থায়ী বিষ।

**তীব্র বিষ (Acute poison)** ঃ জিংক ফসফাইড তীব্র বিষ হিসেবে বেশি ব্যবহার করা হয়। এ বিষ খাওয়ার সংগে সংগে ইঁদুর মারা যায়। তবে এ বিষের টোপে ইঁদুরের বিষটোপ লাজুকতা (Bait shyness) আছে। অর্থাৎ ইঁদুর কখনও সরাসরি পরিমিত বিষটোপ খায়না। প্রথমে একটু মুখে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখে এবং যদি খারাপ লাগে তবে আর খায় না। বিষটোপ লাজুকতা এড়াতে বিষ পরিবর্তন করা হয়। বিষ ছাড়া শুধু টোপ ২-৩ বার ব্যবহার করে হঠাৎ বিষ মিশিয়ে দেয়া, ৪-৫ সপ্তাহ

বিষটোপ লাজুকতা এড়াতে বিষ পরিবর্তন করা হয়। বিষ ছাড়া শুধু টোপ ২-৩ বার ব্যবহার করে হঠাৎ বিষ মিশিয়ে দেয়া, ৪-৫ সপ্তাহ পর পর বিষ ব্যবহার করা অথবা টোপের দ্রব্যাদি পরিবর্তন করা।

পর পর বিষ ব্যবহার করা অথবা টোপের দ্রব্যাদি পরিবর্তন করা। ঘরবাড়ীতে থাকে এমন ইঁদুরের মধ্যে এ প্রবনতা বেশি। মাঠের কালো ইঁদুরের জন্য এ সমস্যা হয় না।

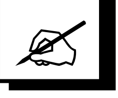
**দীর্ঘস্থায়ী বিষ (Chronic poison) ঃ** রেকুমিন নামে এরূপ বিষ ইঁদুর দমনে ব্যবহার হয়। এ প্রকারের বিষ ধীরে ধীরে ৬-৭ দিন পর ইঁদুরকে মেরে ফেলে। এ বিষ খেলে শরীরের ভিতরে রক্তক্ষরণ হতে থাকে এবং ইঁদুর দূর্বল হয়ে মারা যায়। বিষ টোপের মাধ্যমে ইহা প্রয়োগ করতে হয় এবং সবগুলো ইঁদুরই মারা সম্ভব হয়।

**প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ** তীব্র বিষ ও দীর্ঘস্থায়ী বিষ উভয়ই টোপ তৈরি করে ব্যবহার করতে হয়। এটিকে বিষটোপ বলে। জিংক ফসফাইড ও রেকুমিনের বিষটোপ প্রস্তুত প্রণালীর জন্য ব্যবহারিক পাঠ ৬.৬ দেখুন। বিষটোপ কলাপাতা বা কাগজের পোটলা কিংবা বিস্কুট তৈরি করে প্রয়োগ করা হয়। সাধারণত ঘর-বাড়ীতে সন্ধ্যার পর বিষটোপ প্রয়োগ করা হয়। পরের দিন সকালে আবার তুলে নেয়া হয়। ৪-৬ সপ্তাহ পর পর ৩/৪ রাত্রিতে বিষটোপ প্রয়োগ করতে হয়। কখনো অনবরতভাবে বিষটোপ ব্যবহার করা উচিত নয়। ক্ষেতে পানি থাকলে ক্ষেতের স্থানে স্থানে কচুরীপানা বা কলাগাছ দিয়ে তৈরি ছোট ভেলার উপর ১০/১২ টুকরা বিষটোপ রাখতে হয়। দীর্ঘস্থায়ী বিষ মাঠে অনেকদিন পর্যন্ত রাখতে হয়।

বিষটোপ সাবধানে ছেলেমেয়ে ও গবাদি পশুর নাগালের বাইরে পলিথিন ব্যাগে বেঁধে রাখতে হবে। মাঠে বিষ ব্যবহারের সময় সম্ভাব্য সবাইকে জানাতে হবে।



**সারাংশ ঃ** ইঁদুর দমনের প্রথম পর্যায়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও নিয়মিত সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ইঁদুরের গতিবিধি বুঝতে পারলে দমন ব্যবস্থা সহজ হয়। অরাসায়নিক ও রাসায়নিক দমন পদ্ধতি ইঁদুরের জন্য অনুমোদিত। অরাসায়নিক দমন পদ্ধতি মূলত প্রতিরোধক দমন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মধ্যে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা একটি গুরুত্বপূর্ণ দমন ব্যবস্থা। রাসায়নিক দমন পদ্ধতিতে তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী বিষ ব্যবহৃত হয়। তীব্রবিষ টোপের মাধ্যমে ব্যবহারের সময় বিষটোপ লাজুকতা বিবেচনা করতে হয়। দীর্ঘস্থায়ী বিষটোপে ইঁদুরের কোনো লাজুকতা নেই এবং তীব্রবিষ অপেক্ষা অধিক কার্যকরী। নির্ধারিত মাত্রায় রাতে বিষটোপ ব্যবহার করতে হয়। অনেক দিন ধরে ক্রমাগতভাবে বিষটোপ প্রয়োগ করা উচিত নয়।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৪

**১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

ক. অরাসায়নিক দমন পদ্ধতি কোন্‌টি?

i) তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ | ii) তীব্র বিষটোপ প্রয়োগ
iii) দীর্ঘস্থায়ী বিষটোপ প্রয়োগ | iv) গর্তে পানি দিয়ে দমন

খ. ইঁদুরের জন্য পরভোজী প্রাণী কোন্‌গুলো?

i) গরু, ছাগল ও মহিষ | ii) মাছ, মুরগী ও ব্যাঙ
iii) বিড়াল, পেঁচা ও গুঁই সাপ | iv) উপরের কোনোটিই নয়

**২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।**

ক. কেবলমাত্র বিষটোপ ব্যবহার করেই ইঁদুর দমন করা যায়।
খ. ইঁদুর তাড়াতাড়ি মেরে ফেলতে হলে রেকুমিন বিষ ব্যবহার করা হয়।

**৩। শুন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. ক্ষেতের আইল -------- ইঁদুর গর্ত করার সুযোগ পায়না।
খ. দীর্ঘস্থায়ী বিষটোপে ইঁদুরের কোনো --------- নেই।

**৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. ইঁদুর দমনের অর্ধেক বা সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় কীভাবে?
খ. ইঁদুর মারার ফাঁদে টোপ হিসেবে কী কী ব্যবহার করা হয়?

## ব্যবহারিক

### পাঠ ৬.৫ বিভিন্ন প্রজাতির ইঁদুর শনাক্তকরণ



**এ পাঠ শেষে আপনি–**

- আকার ও গঠন অনুসারে বিভিন্ন প্রজাতির ইঁদুর শনাক্ত করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রজাতি ইঁদুরের অঙ্গসংস্থানসমূহ লিখতে পারবেন।



বাংলাদেশে কালো মেঠো ইঁদুর মাঠ ফসলের প্রধান অনিষ্টকারী আপদ। ঘরের ইঁদুর ও নেংটি ইঁদুর বসতবাড়ী এবং আশেপাশের ফসলের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর। এছাড়া অন্যান্য ইঁদুর প্রজাতি (পাঠ ৬.৩ দেখুন) মাঠ ও ঘর-বাড়ীতে কিছু ক্ষতি করে থাকে। এসব প্রজাতির ইঁদুরের শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য চিত্রসহ উল্লেখ করা হলো।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ**

১। জীবিত ইঁদুর (খাঁচায় আবদ্ধ) অথবা মৃত ইঁদুর (গবেষণাগারে সংরক্ষিত)
২। দস্তানা (এক জোড়া)
৩। পরিমাপের জন্য স্কেল
৪। সাদা কাগজ, পেন্সিল ইত্যাদি।

**পদ্ধতি**

হাতে দস্তানা পরিধাণ করুন। জীবিত ইঁদুর অথবা মৃত ইঁদুর কাছে রাখুন। প্রথমে ইঁদুরের লোমের রং লক্ষ্য করুন। তারপর মাথা, দেহ, লেজ এবং অন্যান্য অঙ্গসংস্থানসমূহ ভালোকরে হাত লাগিয়ে পরীক্ষা করুন এবং এগুলো স্কেলের সাহায্যে মেপে নিন। নিম্নের বৈশিষ্টসমূহের সংগে মিলিয়ে ইঁদুর প্রজাতি শনাক্ত করে কাগজে লিপিবদ্ধ করুন।



**কালো মেঠো ইঁদুর (*Bandicota bengalensis*)**



চিত্র ৬.১ ঃ কালো মেঠো ইঁদুর

**শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য**

১। ইঁদুরের রং কালচে ধূসর
২। সারা দেহ খসখসে লোমে আবৃত
৩। দেহ বলিষ্ঠ এবং প্রায় ১৬-২৪ সে.মি. (লেজ বাদে) লম্বা এবং ওজন ৩২৬ গ্রাম (পুং) এবং ২৮৭ গ্রাম (স্ত্রী)।
৪। লেজ দেহ থেকে খাটো।

### বড় কালো মেঠো ইঁদুর (*Bandicota indica*)



চিত্র ৬.২ ঃ বড় কালো মেঠো ইঁদুর

**শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য**

১। সবচেয়ে বড় আকারের ইঁদুর এবং কালো রঙের।

২। পিছনের পা বেশ বড়, ৪৪ সে.মি. এবং কালো বলে সহজেই চেনা যায়।

৩। দেহের পশম বেশ মোটা।

৪। লম্বায় লেজ ছাড়া ৩০-৩৫ সে.মি. এবং ওজন ৩৫০-১০০০ গ্রাম।

৫। শরীরের তূলনায় লেজ ছোট।

৬। পায়ের পাতা বড়।

### ঘরের ইঁদুর বা গেছো ইঁদুর (*Rattus rattus*)



চিত্র ৬.৩ ঃ ঘরের ইঁদুর বা গেছো ইঁদুর

**শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য**

১। দেখতে কিছুটা লম্বাটে।

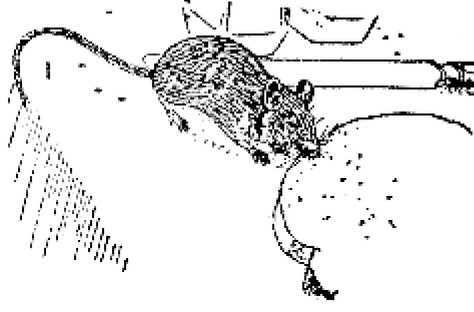
২। বুকের রং সাধারণত সাদা বা হালকা রঙের এবং পিঠ কালচে বাদামী।

৩। দেহ ও মাথার চেয়ে লেজ বড়।

৪। লেজসহ লম্বা ৩৫-৪১ সে.মি. এবং ওজন ১৫০-২৫০ গ্রাম।

৫। অন্যান্য ইঁদুরের তূলনায় মুখ সরু ও কান বেশ বড়।

### ঘরের নেংটি ইঁদুর (*Mus musculus*)



চিত্র ৬.৪ ঃ ঘরের নেংটি ইঁদুর

**শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য**

১। খুবই ছোট আকারের।

২। লেজসহ লম্বায় ১৫-২০ সে.মি. এবং ওজন ১৪-২৩ গ্রাম।

৩। দেহের উপরের দিক কালচে ধূসর বা বাদামী ধূসর এবং নিচের দিক সাদা বা হালকা ধূসর।

৪। লোম মসৃন ও খাটো।

### বাদামী ইঁদুর (*Rattus norvegicus*)



চিত্র ৬.৫ ঃ বাদামী ইঁদুর

**শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য**

১। বাদামী রঙের। বুকের দিক বা পা সাদা।

২। নাকের অগ্রভাগ কিছুটা ভোতা।

৩। লেজ মাথা ও দেহ অপেক্ষা খাটো।

৪। লেজসহ লম্বা ৩৫-৪১ সে.মি. এবং ওজন ২০০-৩০০ গ্রাম।

## নরম পশমযুক্ত ইঁদুর (*Millardia meltada*)



চিত্র ৬.৬ ঃ নরম পশমযুক্ত ইঁদুর

**শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য**

১। গায়ের পশম কোমল ও ধূসর বাদামী বর্ণের।

২। পেটের পশমগুলো হালকা ধূসর বর্ণের।

৩। লেজ বাদে লম্বায় ১৫-২০ সে.মি. এবং ওজন ২৫-৮০ গ্রাম।

৪। লেজ মাথাসহ দেহের চেয়ে খাটো।

## পাঠ ৬.৬ ইঁদুর দমন পদ্ধতি অনুশীলন



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- ইঁদুর দমন পদ্ধতি কীভাবে প্রয়োগ করতে হয় তা জানতে পারবেন।
- ইঁদুর দমনে যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক বিষের ব্যবহার শিখতে পারবেন।



ফাঁদে আটকে ইঁদুর ধরা (Rat trapping) এবং ইঁদুর নাশক (Rodenticide) প্রয়োগ, এ দু'পদ্ধতিই সচরাচর ইঁদুর দমনে ব্যবহৃত হয়। ফাঁদ ও ইঁদুর নাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু পদ্ধতিগত নিয়ম মেনে চলতে হয়। ঘর-বাড়ীতে ইঁদুর দমনে স্প্রিং ও খাঁচা (Cage) ফাঁদ ব্যবহৃত হয়। ইঁদুর নাশক মাঠ ও ঘর-বাড়ীতে সাধারণত টোপ তৈরি করে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

### ফাঁদে আটকানো (Trapping)

**প্রয়োজনীয় উপকরণ**

১। স্প্রিং অথবা খাঁচা ফাঁদ।

২। খাদ্যটোপ (শুটকিমাছ, বিস্কুট অথবা চালের কুঁড়া)

৩। সূতা অথবা চিকন শক্ত দড়ি।

**পদ্ধতি**

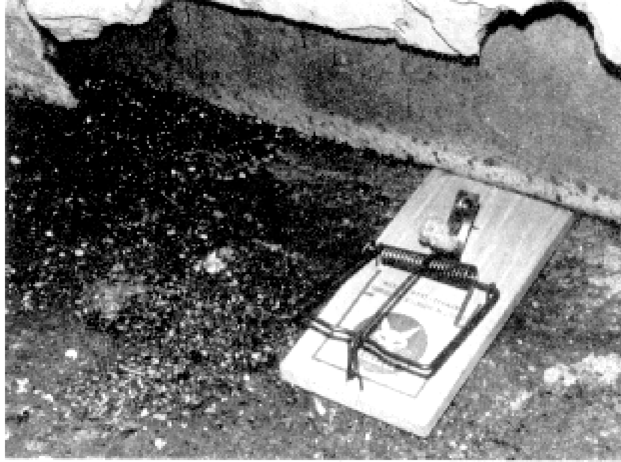
১। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ইঁদুরের গতিবিধি লক্ষ্য করুন।

২। স্প্রিং অথবা খাচা ফাঁদ ইঁদুরের যাতায়াত রাস্তায় স্থাপন করতে হবে।

৩। ফাঁদের ভিতরে খাদ্যটোপ সূতা অথবা দড়ির সংগে বেঁধে দিন।

৪। এখন ফাঁদটি (যদি ইঁদুরের যাতায়াত রাস্তা লক্ষ্য না করা যায়) ঘরের দেয়াল বরাবর স্থানে রাখুন (চিত্র ৬.৭ দেখুন)।





চিত্র ৬.৭ ঃ স্প্রিং ফাঁদ টোপসহ দেয়ালের বিপরীতে স্থাপন করা হয়েছে।

৫। ফাঁদ স্থাপনের কাজটি রাতে করতে হবে।

৬। সকালে দেখতে হবে ইঁদুর ধরা পড়েছে কিনা। দিনের বেলায় ফাঁদটি ঐ স্থান থেকে সরিয়ে নিতে হবে।

৭। ইঁদুর ধরা পড়লে পূনরায় এটি স্থাপন না করে কিছুদিন অপেক্ষা করুন। কেননা ইঁদুর অনবরত স্থাপন করা ফাঁদ উপেক্ষা করতে জানে।

## ইঁদুর নাশক ব্যবহার পদ্ধতি

**প্রয়োজনীয় উপকরণ**

১। ইঁদুর নাশক - জিংক ফসফাইড অথবা রেকুমিন

২। আটা

৩। সুজি

৪। সয়াবিন তৈল

৫। পানি

৬। কলাপাতা বা কাগজ

৭। চাকু

৮। পিড়ি ও বেলুন

৯। দস্তানা বা ছোট পলিথিন ব্যাগ

১০। বাঁশের চোঙ্গা, নারিকেলের খোল, টিনের পাতদ্বারা তৈরি শেড অথবা কাঠের বাক্স।

**পদ্ধতি**

১। বিষটোপ নিম্নের পদ্ধতিতে তৈরি করুন

৪৭৭.৫ গ্রাম আটা
৪৭৭.৫ গ্রাম সুজি
২০ গ্রাম সয়াবিন তৈল
২৫ গ্রাম জিংক ফসফাইড

প্রথমে হাতে দস্তানা পড়ুন এবং আটা, সুজি ও সয়াবিন তৈল ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। তারপর জিংক ফসফাইড অল্প অল্প করে ঢেলে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণ শেষে কলাপাতা বা কাগজে অল্প পরিমাণ মিশ্রণ বা বিষকে মুড়ে পোটলা তৈরি করুন অথবা প্রয়োজনমত পানি মিশিয়ে মন্ড তৈরি করে পিড়ি বেলুনে ০.৫ সে.মি. পুরু রুটি তৈরি করুন এবং রুটিকে চাকু দ্বারা দুই সে.মি. আকারের টুকরো টুকরো করে কেটে নিন। রেকুমিন বিষটোপও অনুরূপভাবে তৈরি করা যায়। এতে ৪৬৫ গ্রাম আটা, ৪৬৫ গ্রাম সুজি ও ২০ গ্রাম সয়াবিন তৈল মিশিয়ে তাতে ধীরে ধীরে ৫০ গ্রাম রেকুমিন (০.৭৫% ধ.র) যোগ করুন। টুকরোগুলো প্রথমে ছায়ায় ও পরে রোদে শুকিয়ে নিন। এভাবে তৈরিকৃত বিষটোপ ২-৩ বছর পর্যন্ত বাতাসবদ্ধ পাত্রে রেখে ব্যবহার করা যেতে পারে।

২। তীব্রবিষের (জিংক ফসফাইড) টোপ ঘর-বাড়ীতে সন্ধ্যার পর প্রয়োগ করুন।

৩। পরদিন সকালে আবার তুলে নিন।

৪। ৪-৬ সপ্তাহ পর পর ৩-৪ রাত্রিতে এ বিষটোপ প্রয়োগ করুন।

৫। কখনো অনবরত বিষটোপ ব্যবহার করবেন না।

৬। ক্ষেতে পানি থাকলে ক্ষেতের স্থানে স্থানে কচুরীপানা বা কলাগাছ দিয়ে তৈরি ছোট ভেলার উপর ১০-১২ টুকরো বিষটোপ রেখে দিন।

৭। দীর্ঘস্থায়ী বিষের (রেকুমিন) টোপ বাঁশের চোঙ্গা, নারিকেলের খোল, টিনের শেড অথবা কাঠের বাক্সে রেখে ব্যবহার করুন।

৮। প্রয়োগের স্থানভেদে ৬২-২৪৮ গ্রাম বিষটোপ বিষপাত্রে রাখতে হয় এবং ২-৩ দিন পর পর পর্যবেক্ষণ করুন।

**সতর্কতা**

১। ঘরের বাইরে ফাঁকা স্থানে বিষটোপ তৈরি করুন।
২। দস্তানা অথবা পলিথিন ব্যাগ দ্বারা হাত মুড়ে নিন।
৩। বিষটোপ তৈরির সময় নাকে কাপড় দিয়ে বেঁধে নিন।
৪। বিষটোপ সাবধানে ছেলেমেয়ে ও গবাদি পশুর নাগালের বাইরে সংরক্ষণ করুন।
৫। বিষটোপ ব্যবহারের পর হাত মুখ ভালো করে সাবান দিয়ে ধুঁয়ে নিন।
৬। মাঠে বিষ ব্যবহারের সময় সম্ভাব্য সবাইকে জানাতে হবে।
৭। দৈবাৎ কোনো দূর্ঘটনা ঘটলে রোগীকে বমি করাতে হবে এবং দ্রুত ডাক্তার ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।



## পাঠ ৬.৭ গুদামজাত শস্যের পোকা সংগ্রহ ও শনাক্তকরণ

**এ পাঠ শেষে আপনি–**

- গুদামজাত শস্যের পোকা সংগ্রহ করতে পারবেন।
- গুদামজাত শস্যের বিভিন্ন পোকা শনাক্ত করতে পারবেন।
- গুদামজাত শস্যের বিভিন্ন পোকার চিত্র অংকন করতে পারবেন।



তিন প্রকারের পোকা যেমন– বিটল, উইভিল ও মথ গুদামজাত শস্য আক্রমণ করে। বিটল ও উইভিলের শরীর শক্ত এবং মাঠ ফসলের এ জাতীয় পোকার চেয়ে আকারে খুব ছোট। এছাড়া মথও আকারে দেখতে খুব ছোট। কিন্তু মথের শরীরের গঠন অপর দুই প্রকারের পোকার মত নয়। এসব কারণে এদের সংগ্রহ পদ্ধতি ভিন্নতর।

### প্রয়োজনীয় উপকরণ

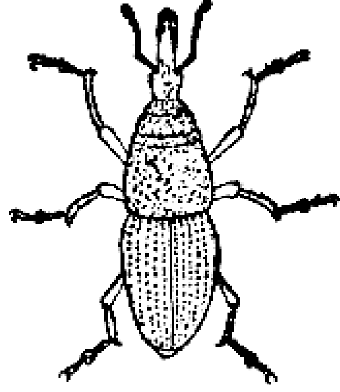
১। পোকা ধরার এসপিরেটর (Aspirator)
২। ইনসেক্ট কিলিং জার (Insect killing jar)
৩। এবসলিউট অ্যালকোহল (Absolute alcohol)
৪। কর্কযুক্ত ছোট শিশি
৫। পোকায় আক্রান্ত শস্যদানা
৬। টেষ্ট টিউব
৭। চিমটা (Forceps)
৮। আতশী কাঁচ অথবা সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র (Magnifying glass or simple microscope)
৯। কাগজ, পেন্সিল ইত্যাদি।

### পদ্ধতি

এসপিরেটর দিয়ে বিটল ও উইভিল ধরা যায়। এসব পোকায় আক্রান্ত শস্যদানা থেকে শোষণ করে পোকার পূর্ণাঙ্গ অবস্থা অর্থাৎ বিটল অথবা উইভিল এসপিরেটরের ভিতরে টেনে নিন। এসপিরেটরের মুখের কর্কটি খুলে পোকাগুলো একটি টেষ্টটিউবে এবসলিউট অ্যালকোহল ঢেলে দিন। কিছুক্ষণ পর পোকাগুলো মারা যাবে। এরপর পোকাগুলো বের করে একটি ছোট পাত্রে রাখুন। অ্যালকোহল মুক্ত পোকা এখন পাইডে নিন এবং সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র অথবা আতশী কাঁচের মাধ্যমে শনাক্ত করুন।মথ জাতীয় পোকার ক্ষেত্রে খোলা টেষ্টটিউবের মুখ বসা অবস্থায় মথের উপর রাখুন এবং দেখতে পারবেন যে, মথ টেষ্টটিউবের উপরের দিকে উঠবে। তখন টেষ্টটিউবের মুখ বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে ধরে কিলিং জারে ছেড়ে দিন। সংগে সংগে মথ মারা যাবে। মথগুলো চিমটার দ্বারা ধরে শনাক্ত করুন।নিম্নের বিভিন্ন প্রকারের গুদামজাত শস্যের পোকার চিত্র ও বৈশিষ্ট্যের সংগে মিলিয়ে পোকা শনাক্ত করুন এবং কাগজে চিত্র অংকন পূর্বক শনাক্তকারী প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখে নিন।



## ধানের শুঁড় পোকা (*Sitophilus oryzae*)



চিত্র ৬.৮ ঃ ধানের শুঁড় পোকা

**শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য**

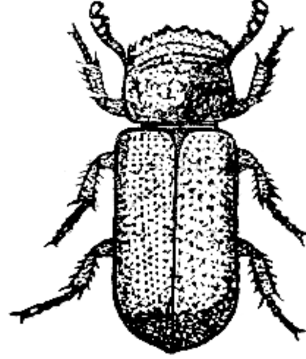
১। আকারে ছোট উইভিলের সমান এবং রং লাল বা কালচে বাদামী।

২। সামনের দিকে লম্বা শুঁড় আছে।

৩। প্রথম জোড়া ডানা শক্ত।



## কেড়ী পোকা (*Rhizopartha dominica* Fb.)



চিত্র ৬.৯ ঃ কেড়ী পোকা

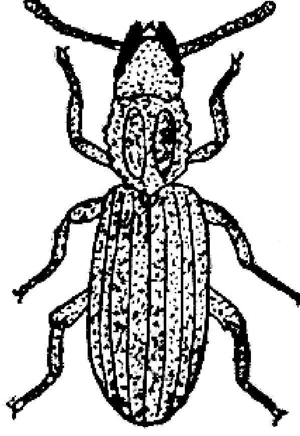
**শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য**

১। ছোট বিটল এবং রং কালচে বাদামী।

২। মাথা গোল, শক্ত ও নিচের দিকে নোয়ানো।

৩। মুখাংশের মধ্যে চোয়াল শক্তিশালী।

**শুস্‌রী পোকা (*Oryzaephilus surinamensis* L.)**



চিত্র ৬.১০ ঃ শুস্‌রী পোকা

**শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য**

১। আকৃতিতে সরু, কিছুটা চ্যাপ্টা এবং বাদামী রঙের বিটল।

২। গ্রীবার দুইপাশে তীক্ষ্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁতের মত সারি-সজ্জায় করাতের মত গঠন।

**খাপরা পোকা (*Trogoderma granarium* Ev.)**



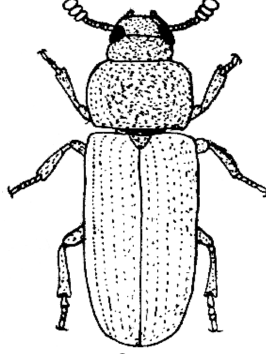
চিত্র ৬.১১ ঃ খাপরা পোকা

**শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য**

১। গোলাকার আকারের বিটল এবং রং বাদামী কালো।

২। পাখায় ধূসর ও হালকা বাদামী রঙের দাগ আছে।

**লাল শুসরী পোকা (*Tribolium castaneum* H.)**

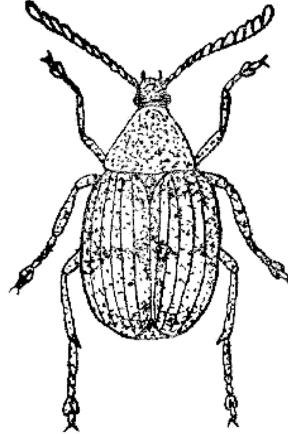


চিত্র ৬.১২ ঃ লাল শুসরী পোকা

**শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য**

১। ছোট আকারের বিটল এবং লাল বাদামী বর্ণের।
২। মাথা, বুক ও পেট বেশ স্পষ্ট।
৩। শুঙ্গ অনেকটা ক্লাবড বা গদাকৃতি (শেষের তিনটি খন্ড অপেক্ষাকৃত বড়)।

**ডালের বিটিল পোকা (*Callosobruchus chinensis*)**



চিত্র ৬.১৩ ঃ ডালের বিটিল পোকা

**শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য**

১। ধূসর- লাল বাদামী বর্ণের বিটল

২। সারা গা পশমে ঢাকা

৩। প্রথম জোড়া ডানার দ্বারা পেট সম্পূর্ণ আবৃত হয় না।

৪। শুঙ্গ সিরেট ধরনের।

**ধানের সুরুই পোকা (*Citotroga cerealella* Oliv.)**



চিত্র ৬.১৪ ঃ ধানের সুরুই পোকা

**শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য**

১। ছোট আকারের হালকা খয়েরী (খড়) বর্ণের মথ।

২। সামনের ডানায় কয়েকটি দাগ দেখা যায়।

৩। পিছনের ডানার শীর্ষপ্রান্ত বেশ চোখা।

৪। উভয় ডানার পিছনের কিনারা জুড়ে ঝালরের মত লোম আছে।

**চালের সুরুই পোকা (*Corcyra cephalonica* St.)**



চিত্র ৬.১৫ ঃ চালের সুরুই পোকা

**শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য**

১। হালকা ধূসর বাদামী বর্ণের মথ এবং ধানের সুরুই পোকা অপেক্ষা বড়।

২। কীড়া শস্যদানার মধ্যে জটা তৈরি করে।

## পাঠ ৬.৮ ফসলের ক্ষেতে জরিপ অনুশীলন



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- ফসলের ক্ষেতে নিরীক্ষণের মাধ্যমে পোকার আক্রমণ ও ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- জরিপ কার্যে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ শিখতে পারবেন।



শুধু জরিপ বলতে মাঠের ফসল পরিদর্শন ও পরীক্ষা করে পোকার সংখ্যা গণনা এবং পোকা কর্তৃক ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় বুঝায়। সাধারণত শোষক, পাতা খাওয়া ও মাজরা পোকা ফসল গাছে আক্রমণ করে। এদের জরিপ পদ্ধতিও পৃথক। উদাহরণস্বরূপ ধান ক্ষেতে শোষক ও মাজরা পোকার জরিপ অনুশীলন এখানে দেখানো হলো। শোষক পোকা যেমন পাতা ফড়িং ধানের পাতায় আক্রমণ করে এবং মাজরা পোকা ধানের কান্ডের ভিতরের অংশ খায়। জরিপের সময় পাতা ফড়িং পোকা ধরার জাল দ্বারা ধরে গণনা করতে হয় এবং মাজরা পোকার ক্ষেত্রে কেবল আক্রান্ত কান্ড গণনা করতে হয়। মনে রাখতে হবে যে একটি মাজরা পোকার কীড়া একটি কান্ডে থাকে। সুতরাং যতটি আক্রান্ত কান্ড পাওয়া যাবে ততটি মাজরা পোকা হবে।

### প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। এক বিঘা আমন ধানের ক্ষেত (শীষ বের হওয়ার পূর্বের অবস্থায়)।
২। পোকা ধরার জাল।
৩। পলিথিন ব্যাগ ১০ টি।
৪। কাগজ ও পেন্সিল ইত্যাদি।



চিত্র ৬.১৬ ঃ পোকা ধরার জাল (Insect collecting net)

### পদ্ধতি

১। পোকা ধরার জাল নিয়ে ধান ক্ষেতে নামুন।
২। ধান ক্ষেতের এক স্থান থেকে একবার জাল দ্বারা সুইপ করুন এবং জালে ধরা পোকাগুলো একটি পলিথিন ব্যাগে ঢেলে ব্যাগটি বন্ধ করুন।
৩। উপরের ন্যায় ক্ষেতের বিভিন্ন অংশ থেকে এলোমেলোভাবে (randomly) ১০ বার সুইপ করে পৃথক পৃথক ব্যাগে ভরে নিন। পাতাফড়িং গণনার সুবিধার্থে ব্যাগগুলো রেখে দিন এবং পরে গবেষণাগারে এনে প্রতি ব্যাগ থেকে পাতাফড়িং গুনে কাগেজে লিখুন।
৪। মাজরা পোকার জরিপের সময় নির্বাচিত ধান ক্ষেতের এক কোণায় দাঁড়ান।
৫। জমির ভিতর প্রবেশ করুন।
৬। কোণাকুণি বিপরীত দিকে (diagonally) আস্তে আস্তে অগ্রসর হন।

৭। কয়েক পা হাটার পর থেমে নিকটবর্তী ধানের গোছাকে পরীক্ষা করুন।

৮। উক্ত গোছায় কয়টি মরা কান্ড (dead heart) আছে তা কাগজে লিখুন। এছাড়া ভালো কান্ডের (tiller) সংখ্যাও লিখুন।

৯। উপরের ন্যায় ২০টি ধানের গোছায় জরিপ করে কাগজে লিপিবদ্ধ করুন।

১০। জরিপ শেষে পাতাফড়িং ও মাজরা পোকার উপাত্ত (data) হিসাব করুন।

১১। জরিপ করার পর পাতাফড়িং প্রতি পোকা ধরার জালে গড়ে কত হবে তা হিসাব করে বের করুন।এখানে মোট পাতাফড়িং এর সংখ্যাকে দশ দিয়ে ভাগ করলে প্রতি পোকা ধরার জালে পাতাফড়িং এর সংখ্যা পাওয়া যাবে।

১২। উক্ত ২০টি ধানের গোছায় গড়ে কয়টি মাজরা পোকা আছে অথবা শতকরা হিসাবে আক্রমণের হার কত আছে তা বের করুন।প্রতি গোছায় গড়ে কয়টি মাজরা পোকা আছে তা পেতে হলে মোট মরা কান্ডের সংখ্যাকে ২০ দিয়ে ভাগ করুন।মাজরা পোকার শতকরা আক্রমণের হার বের করার জন্য নিম্নের ফরমুলা ব্যবহার করুন ঃ–

মাজরা পোকার আক্রমণের হার (%) $= \frac{\text{†gvU giv Kv‡Ûi msL¨v} \times 100}{\text{giv KvÛmn †gvU Kv‡Ûi msL¨v}}$

## পাঠ ৬.৯ অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্ত নির্ণয়



### এ পাঠ শেষে আপনি–

- পোকা দমনে কীটনাশকের সঠিক ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।
- পোকার যে ঘনত্ব শস্যের ক্ষতি অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্তে পৌছে তা নির্ধারণ করতে পারবেন।



অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্ত (economic threshold) হলো পোকার সংখ্যা এমন এক অবস্থায় পৌছে যেখানে দমন কার্য চালানো প্রয়োজন। নতুবা আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থনৈতিক ক্ষতির ধাপে (economic injury level) পৌছাবে। পোকার ঘনত্ব অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্তের নিচে শস্যের সাধারণভাবে সহনশীল ক্ষমতার জন্য কোনো আর্থিক ক্ষতি করতে পারে না। এসময় পোকা দমনের ব্যবস্থা নেয়া, বিশেষ করে কীটনাশক ব্যবহার লাভজনক হবে না বরং শস্য উৎপাদনে অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত খরচ হবে। কীটনাশক ব্যবহারে পোকা দমন ব্যবস্থা লাভজনক হবে তখন, যখন আক্রমণ অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্তে পৌছে অথবা পোকা অর্থনৈতিক ক্ষতির ধাপের পূর্বে দমন করা যায়। কীটনাশকের মূল্য, স্প্রেয়ার ভাড়া, কীটনাশক প্রয়োগ খরচ ইত্যাদি খরচ অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্ত নির্ণয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। যদি এসব খরচ ক্ষতিগ্রস্থ শস্যের মূল্যের চেয়ে কম হয় তবে কীটনাশক প্রয়োগ যুক্তিসংগত হবে। অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্ত শস্য, পোকা, ঋতু ও স্থানভেদে পরিবর্তনশীল। অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্ত কার্যকর দ্বারপ্রান্ত (action threshold) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

### নির্ণয় পদ্ধতি

কার্য দ্বারপ্রান্ত (AT) নির্ণয়ে গাণিতিক ফরমুলাসমূহ অতি সহজে ব্যবহার করা যায়। এখানে চারটি নির্ণায়ক যথা– দমন খরচ, উৎপাদিত শস্যের বাজার মূল্য, পোকা কর্তৃক শস্যের ক্ষতির পরিমাণ এবং দমনের কার্যকারীতা ব্যবহৃত হয়।

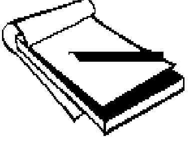
$$AT = \frac{C}{PDK}$$

এখানে

C = দমন খরচ (cost of implementing control measure)
P = উৎপাদিত শস্যের মূল্য প্রতি টন হিসাবে (price of crop per ton)
D = শস্যের ক্ষতির পরিমাণ (loss in yield, ton per hectar)
K = দমনের মাধ্যমে পোকার আক্রমণ হ্রাস (reduction in pest attack caused by control measure)

বাংলাদেশে ধানের কয়েকটি অনিষ্টকারী পোকার অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্ত এখানে উল্লেখ করা হলো।

| | |
|---|---|
| মাজরা পোকা | প্রতি বর্গমিটারে আউস, আমন ও বোরো ধানে ৩টি স্ত্রী মথ অথবা ডিমের গাদা। মাঝারী কুশি গজানোর পর ১০% মরা কান্ড বা ডিগ (রোপণের ৪০ দিন পর্যন্ত) অথবা ৫% মরা কান্ড বা ডিগ (রোপণের ৪০-৬০ দিন পর্যন্ত)। |
| পামরী পোকা | ৪টি পূর্ণাঙ্গ পামরী পোকা প্রতি গোছায় অথবা ১৫টি শুককীট প্রতি পাতায়। ক্ষেতে ৩৫% পাতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। |
| গলমাছি | ৫% গল অথবা পেঁয়াজের মত পাতা। |
| সবুজ পাতা ফড়িং | পোকা ধরা জালে প্রতি সুইপে ১টি ফড়িং এবং টুংরো রোগে আক্রান্ত গাছ। |
| বাদামী গাছ ফড়িং | মাঝারী কুঁশি গজানোর শুরুতে ক্ষেতের ৫০% গোছার প্রতি গোছায় ২-৪টি গর্ভবতী স্ত্রী পোকা অথবা ১০টি নিম্ফ। |
| পাতা মোড়ানো ও চুঙ্গি পোকা | ২৫% পাতা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। |
| গান্ধী পোকা | প্রতি গোছায় ৩-৫ টি পোকা। |
| শীষকাটা লেদা পোকা | প্রতি ১০ মিটারে ২-৫টি পোকা। |



# চূড়ান্ত মূল্যায়ন– ইউনিট ৬

## সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১। গোলাজাত শস্যের ক্ষতিকর পোকার ক্ষতির প্রকৃতি বর্ণনা করুন।

২। ধানের শুড় পোকা ও কেড়ী পোকার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৩। ডালের পোকার বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন। এই পোকা কীভাবে চেনা যায়?

৪। ধানের ও চালের সুরুই পোকার বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন। এদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ লিখুন।

৫। গোলাজাত শস্যদানার পোকা কীভাবে দমন করবেন তার উপর একটি রচনা লিখুন।

৬। ইঁদুর আমাদের কীভাবে ক্ষতি করে?

৭। ইঁদুরের দমনের জন্য বিষটোপ কীভাবে তৈরি করবেন?

৯। ইঁদুর দমনের অরাসায়নিক পদ্ধতি সমূহ লিখুন।

১০। সবচেয়ে বড় ইঁদুরের বৈজ্ঞানিক নাম কী? কীভাবে একে শনাক্ত করবেন।

১১। অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্ত ও অর্থনৈতিক ক্ষতির ধাপ বলতে কী বোঝায়?

১২। অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্ত নির্ণয়ে যেসব নির্ণীয়ক ব্যবহার করা হয় সেগুলো কী কী?

১৩। ধানের মাজরা পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং এবং পামরী পোকার অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্ত উল্লেখ করুন।



# উত্তরমালা

## পাঠ ৬.১

| | | |
|---|---|---|
| ১। | ক. ii | খ. ii |
| ২। | ক. মি | খ. স |
| ৩। | ক. ১০% | খ. খায়, বীজ |
| ৪। | ক. অন্য পোকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ দানা | খ. একলক্ষ টন |

## পাঠ ৬.২

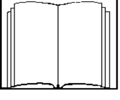
| | | |
|---|---|---|
| ১। | ক. i | খ. iii |
| ২। | ক. স | খ. স |
| ৩। | ক. সমানভাবে | খ. ১২% |
| ৪। | ক. গ্রীবার দু'পাশে করাতের মত সাজানো দাঁত থাকে | খ. লম্বা লালচে লোমে আবৃত |

## পাঠ ৬.৩

| | | |
|---|---|---|
| ১। | ক. iii | খ. iii |
| ২। | ক. মি | খ. স |
| ৩। | ক. মারাত্মক | খ. ১০ কেজি |
| ৪। | ক. দুই জোড়া | খ. কালো মেঠো ইঁদুর |

## পাঠ ৬.৪

| | | |
|---|---|---|
| ১। | ক. iv | খ. iii |
| ২। | ক. মি | ক. মি |
| ৩। | ক. সরু রাখলে | খ. লাজুকতা |
| ৪। | ক. নিয়মিত পস্কার পরিচ্ছন্ন রেখে | খ. সুটকী মাছ, রুটি, চালভাজা |



## তথ্যসূত্র

এ বইটি লিখতে যে সব বই থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে

১। আহম্মেদ, তৌঃ উঃ এবং জলিল এ, এফ,এম, ১৯৯৩। বাংলাদেশের কৃষির অনিষ্টকারী পোকামাকড় জীবন বৃত্তান্ত ও নিয়ন্ত্রণ (১ম খন্ড) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ৩৮১ পৃষ্ঠা।

২। আহাদ, মোঃ আঃ, রায় মৃত্যঞ্জয় এবং সরদার, মোঃ মঃ আঃ ১৯৮৭, কৃষি কীট বিজ্ঞান, ২০৫ পৃষ্ঠা।

3. Alam, M. Z (1961). Insect pests of rice in East Pakistan and their control. Agric. Inporm Serv. publ. Dhaka, 98p.

4. Alam, M.Z, 1962. Insect and mite pests of fruit trees in East Pakistan and their control. Agric. Infrom. Serv. Publ. Dhaka, 115p.

5. Alam, M.Z. 1965. Modern insecticides and their uses. Agric. Inform. Serv. Publ. Dhaka, 209 p.

6. Ayyar, T.V.R. 1964. Handbook of Economic Entomology for South India. N. Publishing House, Delhi, 528p.

7. Grist, D.H. and Lever, R.J. A.W. 1969. Pests of rice. Longman and Company Ltd. London.

8. Peterson, A.1964. Entomological Techniques How to Work with Insects. Edward's Brothers Inc. 435p.